শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কিশোর সাহিত্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কিশোর সাহিত্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
কিশোর সাহিত্য

সম্পাদনা
অশোককুমার মিত্র

শিশু সাহিত্য সংসদ

Shirshendu Mukhopadhyay : Kishor Sahitya
(Selected Works of Shirshendu Mukhopadhyay)
ed. Ashokekumar Mitra

ISBN : 978-81-7955-141-7

© পাঠ.বস্তু : লেখক
পুস্তকসজ্জা ও অলংকরণ : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১, নিরঞ্জন পল্লি, তেঁতুল তলা
কলকাতা-৭০০ ১৩৬

সূচি

প্রকাশকের কথা
সম্পাদকের কথা

গল্প
ভূতনাথের বাড়ি
গ. টা খুব সন্দেহজনক
হনুমান ও নিবারণ
ভুসুকু পণ্ডিত
শক্তিপরীক্ষা
রাজার মন ভালো নেই
উলট-পুরাণ
চোরে-ডাকাতে
মোল্লারহাটের নেমন্তন্ন
বিপিনবাবুর কাণ্ড
সংবর্ধনা
আকাশগঙ্গা
হরবাবুর অভিজ্ঞতা
পটকান যখন পটকাল
বলাইবাবু
জকপুরের হাটে
গ্রহান্তরে
কৃপণ
মাঝি

চকবেড়ের গোহাটায়

নয়নচাঁদ

ফুটো

রাতের অতিথি

ভগবানের আবির্ভাব

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া

প্রকাশকের কথা

শিশু সাহিত. সংসদের বয়স হল তিন কুড়ি। ছড়ায়-পড়ায়, গদ্যে-পদ্যে, জ্ঞানে-মনোরঞ্জনে এতখানি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুনির্মল বসু, সুখলতা রাও সেই থেকে আজও আছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যের সে ভাঁড়ারে আজও জোগান দিচ্ছেন। এ ছাড়া এখন যাঁরা দিয়ে চলেছেন : ছোটোদের জন্য গৌরী ধর্মপাল, শৈলেন ঘোষ ও বলরাম বসাক, ছড়া-কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ, কিশোর সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন এবং সদ্যপ্রয়াত মতি নন্দী। শিশু সাহিত্য সংসদের হীরকজয়ন্তী উদযাপন এঁদের নিয়েই, যাঁরা দিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই স্ব-নির্বাচিত লেখার সংকলন নিয়ে। জয়ন্তী উদযাপনের এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে!

এ প্রসঙ্গে শ্রীঅশোককুমার মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখা জোগাড় থেকে সম্মতি সংগ্রহ পর্যন্ত সব কাজ করে সংকলনগুলিকে সম্ভব করে তুলেছেন। তাঁর উৎসাহের তুলনা নেই। সর্বোপরি তাঁর যোগ্য সম্পাদনাতে সংকলনগুলি আশা করি পাঠকদের মনের মতো হয়ে উঠতে পেরেছে।

হারানো কাকাতুয়া লেখাটি প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ-এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কলকাতা — দেবজ্যোতি দত্ত

ডিসেম্বর ২০১০

স. াদকের কথা

ইংরেজিতে ছোটোদের জন্য রংচঙে কত বাহারি বই, বিদেশি ভাষাতেও। বাংলায় তো তেমন একখানি বই-ও নেই। কেন? বাংলায় কি তেমন লেখক নেই, তেমন ছবি-আঁকিয়ে নেই? এমনই ভাবনা জেগেছিল এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর মনে। এতদিন তো জীবন কেটেছে বিদেশি নাগপাশ ছেঁড়ার লড়াইয়ে। সদ্যস্বাধীন দেশে ছোটোদের জন্য আনন্দ আর শিক্ষাদানের বই প্রকাশে উদ্যোগী স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ করলেন ছড়ার ছবি-১। পুরোনো দিনের ছড়ায় ছবি আঁকলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৯ সালে বেরোল চার রঙে ছাপা ছোটোদের মন-কাড়া বড়ো মাপের সেই বই, যা এতকাল তিনি চেয়ে এসেছিলেন। পরের বছরে বেরোল ছড়ার ছবি-২ আর ছড়া-ছবিতে অ আ ক খ। আর তখনই ঠিক হল স্থায়ী প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা। ১৯৫১-র ১ আগস্ট জন্ম নিল নতুন ধারার প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান, ছোটোদের সাহিত্যের জন্য 'শিশু সাহিত্য সংসদ' আর বড়োদের বইয়ের জন্য 'সাহিত্য সংসদ'। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য শুধু মুদ্রণ সৌকর্যেই নয়, বিষয় নির্বাচনেও। প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের পিছনে থাকে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, নিখুঁত সম্পাদনা ও অনুপম প্রকাশনা। শুরু থেকে প্রকাশনা মানের যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ, তাকে আজ এই হীরকজয়ন্তী বর্ষেও ধরে রেখে উন্নত করার সাধনায় ব্রতী রয়েছেন তাঁর উত্তরসূরীগণ। এখন বিষয় নির্বাচনে তারা অতি সতর্ক, নিত্য উদ্ভাবক। প্রকাশন সৌষ্ঠবে দরদি ও নিপুণ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন গন্ধটা খুব সন্দেহজনক-সে গল্প পড়ে সন্দেহ থাকে না যে, বাংলা ছোটোদের সাহিত্যে এক শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। এটি একটি ভূতের গল্প যেখানে ভূতেরা মানুষের দলে দিব্যি মিশে থাকে, কাজ করে দেয়, জল বয়ে দেয়, খেলার মাঠে গোল করে দেয়। কেউ ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তবু মনে একটা খটকা লেগে থাকে। দাদামশাইয়ের বাবা ছিলেন খুব সাত্ত্বিক মানুষ। তিনি এসেই সন্দেহজনক গন্ধ পেলেন। ভূতেরা তাঁর সামনে আসে না; একদিন বাজার থেকে মাছের খালুই করে শিঙি মাছ কিনে আসছেন-পথে একটা মাছ বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। মাছটি ধরতে তিনি যখন হিমশিম খাচ্ছেন তখন একটা লোক এসে মাছ ধরে খালুইয়ে ভরে চলে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ধরে শুঁকে নিয়ে বললেন, 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক'। লোকটাও তাঁকে শুঁকে বলল, 'এ তো ভালো নয়, গন্ধটা খুব সন্দেহজনক,' ভূতের হাতে নাকাল হয়ে দাদামশাইয়ের বাবা আর কথা বলতেন না।

শীর্ষেন্দুর গল্পে এক অদ্ভুত রসের স্বাদ পাওয়া যায়। অদ্ভুতুড়ে সিরিজে দেড় ডজনেরও বেশি কাহিনি লেখা হয়ে গেল। তা ছাড়া, তাঁর গল্পের ভাষাটিও খাসা, বলার ভঙ্গিটি ফুরফুরে, নাটকীয়তার মিশেল দেওয়া। গল্প-উপন্যাসে এই ধরনটি আকছার দেখতে পাওয়া যায়। এমন আনন্দময় স্ফূর্তির দেখা পাওয়া যায় কল্পবিজ্ঞানের গল্পে বা ভূতের গল্পে। হাসির গল্প, মজার গল্প, রূপকথার গল্প, গোয়েন্দা বরদাচরণের গল্প, কি সামাজিক সুখ-দুঃখের গল্পেও সহজ চালটা ফুরিয়েও যেন ফুরোয় না। শীর্ষেন্দুর গল্প মানেই মন খারাপের ওষুধ, মন ভালো করার টোটকা।

হারানো কাকাতুয়া তাঁর এক গোয়েন্দা-উপন্যাস। উকিল উদ্ধববাবু ভালো জাতের এক কাকাতুয়া কিনেছিলেন, যেটি হয়তো কারও পোষা ছিল। উদ্ধববাবুর ইচ্ছে ছিল তাঁর বখে-যাওয়া ছোটো ছেলে রামুকে ধাতে আনবেন, কাকাতুয়ার বুলিতে তার মতি ফেরাবেন। তিনি কাকাতুয়াকে তার পছন্দের বুলি শেখাতে গেলেন কিন্তু সে তার পুরোনো শেখা বুলি আউড়ে যায়। তাতে যেন রহস্যের গন্ধ থাকে। আর কাকাতুয়াকে নিয়ে রহস্য জমজমাট হয়ে ওঠে। গবা পাগলা, দারোগা কুন্দকুসুম, কাজের লোক নয়নকাজল, জেল-পালানো সার্কাসের খেলোয়াড় গোবিন্দ, নতুন মাস্টারমশাই-কত চরিত্র, ঘটনার ঘনঘটা, টানটান উত্তেজনা শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠককে আটকে রাখে। পাকা গোয়েন্দা-কাহিনির লেখকের মতো রহস্যের ফাঁস কোথাও আলগা হতে দেননি, কিন্তু আপন বৈশিষ্ট্য রয়েছে কাহিনির উপস্থাপনায়, বিন্যাসের অনায়াস হালকা চালে। একটু আড়ালে পড়ে থাকা এ উপন্যাসেও রয়েছে হিরের দ্যুতি।

শিশু সাহিত্য সংসদের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত কিশোর সাহিত্য সংগ্রহে এ সংকলনটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

কলকাতা — অশোককুমার মিত্র

ডিসেম্বর ২০১০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

২৪/১০/১০

ভূতনাথের বাড়ি

'আ. া মশাই, এদিকটাতেই কি ভূতনাথবাবুর বাড়ি?'

'না না, এ পাড়ায় ভূতনাথ বলে কেউ থাকে না।'

'কী আশ্চর্য! কিন্তু আমার কাছে যে ঠিকানাটা দেওয়া আছে তাতে স্পষ্ট লেখা অশ্বিনী মিত্র রোড, হাকিমপাড়া, তা এটা কি হাকিমপাড়া নয়?'

'তা হবে না কেন? এটা হাকিমপাড়া হতে বাধাটা কীসের? আটকাচ্ছে কে?'

'তাহলে অশ্বিনী মিত্র রোডটা?'

'এটা অশ্বিনী মিত্র রোডও বটে।'

'কিন্তু তাহলে ভূতনাথবাবুর বাড়িও তো এখানেই হওয়া উচিত।'

'না মশাই, কক্ষনো এখানে ভূতনাথবাবুর বাড়ি হওয়া উচিত নয়।'

'বলছেন! কিন্তু তা হয় কী করে? ভূতনাথবাবু নিজেই এই ঠিকানা দিলেন যে!'

'আর আপনিও অমনি ফস করে বিশ্বাস করে ফেললেন তো?'

'যে আজ্ঞে। ভূতনাথবাবুকে বিশ্বাস করা কি উচিত হয়নি মশাই?'

'বিশ্বাস করা না করা আপনার দায়। আমার তো নয়। তবে একথাও বলতে ইচ্ছে করে, কেউটে সাপ বা সোঁদরবনের বাঘকেও কি বিশ্বাস করা উচিত?'

'আজ্ঞে না। তাদের কথা আলাদা। বন্যপ্রাণী আর মানুষে তফাত আছে।'

'তফাতটা কী? তফাতটা কোথায়? ভূতনাথ বিশ্বাসকে যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে কেউটে সাপ বা সোঁদরবনের বাঘের দোষ কী বলুন!'

'আপনি বলতে চান ভূতনাথ বিশ্বাস সাপ বা বাঘের মতোই বিশ্বাসের অযোগ্য।'

'অতটা বলতে চাই না। তা ছাড়া আমি তো বলেই দিয়েছি, ভূতনাথ বিশ্বাস নামে কেউ এ পাড়ায় থাকে না।'

'তবে তিনি থাকেন কোথায়? সম্প্রতি কি বাসা বদল করেছেন?'

'করাই উচিত। বাসা বদলালে বহু মানুষের উপকারই হত। তবে ওসব আমি বলতে চাইছি না। তা আপনি আসছেন কোথা থেকে?'

'আমি আসছি নিশিগঞ্জ থানা থেকে।'

'অ্যাঁ! বলেন কী? থানা থেকে? আরে, তা আগে বলতে হয়। তা সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছেন তো!'

'তা আর আনিনি! সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে, আদালতের সমন আছে। আমার কাছে সবকিছু পাবেন।'

'বাঃ, বাঃ! এ তো খুব ভালো কথা মশাই! তা আসুন না, এই গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন। কাছেই আমার বাড়ি। ওই যে সামনের লাল বাড়িটা!'

'তা মন্দ কী? পথ তো আর কম নয়। দুপুরের এই রোদে এতটা পথ আসতে বড়ো হাঁপসে পড়েছি মশাই।'

'আহা, আমারই দোষ। মান্যগণ্য লোক আপনি, এভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখাটা আমার ঠিক হয়নি। আসুন আসুন।'

'বাঃ, আপনার বাড়িটি তো বেশ।'

'সবাই তা বলে বটে। তবে এ আর এমন কী বলুন। হারু ঘোষের বাড়ি আরও পেল্লায়।'

'তা আপনার বাড়িই বা কম কীসে? ক-বিঘে জমি নিয়ে বাগানখানা করেছেন বলুন তো!'

'না না, জমি কোথায়! বাড়িখানাই তো অর্ধেক জমি গিলে খেল। এখন মোটে বিঘে দশেক পড়ে আছে।'

'বাপ রে! দশ বিঘে জমি কি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো জিনিস! তা মার্বেল বসিয়েছেন বুঝি মেঝেতে?'

'মার্বেলই বটে। তবে এক নম্বর সরেস জিনিসটা তো আর পেলাম না। তাই বাধ্য হয়ে ইটালিয়ান মার্বেলই বসাতে হল।'

'ইটালিয়ান মার্বেল! সে তো অনেক দাম মশাই। তার চেয়ে সরেস মার্বেল পাবেন কোথায়?'

'লোকে তাই বলে বটে। তবে এই অখাদ্য জায়গায় ভালো জিনিসের সমঝদারই বা কোথায় বলুন। বসুন তো, এই সোফায় বসুন। আমি বরং ঠান্ডা মেশিনটা চালিয়ে দিই। আপনার তো বেশ ঘাম হচ্ছে দেখছি।'

'ঠান্ডা মেশিনও লাগিয়েছেন? বাঃ, আপনার নজর তো খুব উঁচু।'

'কী যে বলেন! ওসব আজকাল হ্যাতাপ্যাতাদের ঘরেও থাকে। তা এই গরমে কি একটু লেবুর শরবত খাবেন?'

'না না, এসব ঝামেলা করতে হবে না। অন ডিউটি আমাদের এসব খেতে-টেতে নেই।'

'আহা ডিউটি করতে করতেই খাবেন। এক গেলাস শরবত বই তো নয়। দাঁড়ান, ভিতরে বলে আসছি। . . . হ্যাঁ, তারপর বলুন তো, ভূতনাথের কেসটা কী?'

'খুব খারাপ কেস মশাই, খুব খারাপ কেস।'

'কত ধারায় মামলাটা ঠুকছেন?'

'ধারা-টারা উকিলের ব্যাপার, তারা বুঝবে। আমরা চার্জশিট দাখিল করব, তারপর কেস কোর্টে যাবে।'

'বাঃ বাঃ, এ তো খুব ভালো খবর মশাই। মা কালীকে জোড়া পাঁঠা মানত করা ছিল।'

'আচ্ছা, জোড়া পাঁঠা কেন মানত করেছিলেন বলুন তো!'

'অতি দুঃখেই মানত করতে হয়েছিল মশাই।'

'কিন্তু দুঃখটা কীসের?'

'সে আর বলবেন না। দুঃখ কি একটা? ভূতনাথের জ্বালায় এ পাড়ার সবাই অতিষ্ঠ। ধরুন কেউ হয়তো শীতলা পুজোয় একটু মাইক-টাইক লাগিয়েছে। তা পুজো টুজোয় ও তো লোকে লাগিয়েই থাকে। ভূতনাথ তার দলবল নিয়ে এসে সব চোঙা-টোঙা খুলে নিয়ে যায়। তারপর ধরুন কেউ হয়তো রাস্তার ধারে একটু তরকারির খোসা বা মাছের আঁশ ফেলেছে, অমনি ভূতনাথ এসে কী হম্বিতম্বি! তারপর অধরবাবুর খিটখিটে বুড়ো বাপটা সারাদিন খাই খাই করে পেট নামিয়ে ফেলে, তাই অধরবাবুর বউ শ্বশুরকে বলেছিল, অত খাওয়া কি ভালো? হয়তো একটু ঝাঁঝের গলাতেই বলেছিল, তাইতে ভূতনাথ এসে চড়াও হয়ে মানবাধিকার কমিশনের ভয় আর সামাজিক বয়কটের জুজু দেখিয়ে কী অত্যাচারটাই না করে গেল। ওই যে নবকুমার, তার দোষ হয়েছিল, বাগানের পাঁচিলটা তোলার সময়

মাপজোকের ভুলে রাস্তার খানিকটা সীমানায় ঢুকে যায়। ভূতনাথ সেই দেয়াল ভাঙিয়ে তবে ছাড়ল।'

'এ তো ভূতনাথের খুব অন্যায়!'

'অন্যায় নয়? আমাকেই কি কম জ্বালাতন হতে হচ্ছে মশাই? শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে কোনোমতে বাড়িটা খাড়া করেছি, ভূতনাথ এসে রোজ দলিল দেখতে চায়, ভয় দেখায়। আমি নাকি সরলাবালা নামে এক বিধবার জমি চালাকি করে লিখিয়ে নিয়েছি।'

'লিখিয়ে নেননি তো!'

'তা লিখিয়ে নেব না কেন? নিয়েছি বই কী। কিন্তু তার জন্য তিন কিস্তিতে ন্যায্য দামও সরলাবালাকে মিটিয়ে দিয়েছি। রসিদও আমার কাছে আছে। কিন্তু কলিকাল তো, ভালো মানুষদের বড়ো দুর্দিন। ভূতনাথ আমার বিরুদ্ধে লোককে খেপিয়ে তুলছে।'

'না, না এসব তো ভালো কথা নয়!'

'আপনারা পাঁচজন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এসে দেখুন কত বড়ো অবিচার এবং অনাচার চলছে এখানে। ওই যে, মিষ্টিটুকু মুখে দিয়ে ঠান্ডা ঘোলটা এক চুমুকে মেরে দিন তো, শরীর ঠান্ডা হবে।'

'ও বাবা। এত আয়োজন! না মশাই, আমার পক্ষে দশ-বারোটা মিষ্টি খাওয়া সম্ভব নয়। আমি পেটরোগা মানুষ।'

'আহা, আপনি তো ইয়ংম্যান। কতটা হেঁটে আসতে হয়েছে। লজ্জা করবেন না, খেয়ে নিন।'

'তাহলে ভূতনাথবাবুর জন্যই আপনারা শান্তিতে নেই?'

'না মশাই, সে বিদেয় হলে বাঁচি। তা তার বিরুদ্ধে কীসের মামলা বলুন তো! খুন-জখম-রাহাজানি, নাকি চারশো বিশ ধারা, নাকি ট্যাক্স ফাঁকি?'

'কেসটা আমি খুব ভালো জানি না। তবে তার নামে সরকারি চিঠি আছে।'

'সেই চিঠিতে কী আছে মশাই? যাবজ্জীবন হলে খুব ভালো হয়, ফাঁসি হলে তো চমৎকার, নিদেন আট-দশ বছরের কয়েদ তো বোধ হয় হচ্ছেই। কী বলেন?'

'তাও হতে পারে। সবই সম্ভব। আচ্ছা, আপনার কি একটা দশ লাখ টাকার ব্যাঙ্ক লোন আছে?'

'অ্যাঁ! ব্যাঙ্ক লোন! দাঁড়ান, মনে করে দেখি! আচ্ছা আচ্ছা মনে পড়ছে, একটা লোন যেন ছিল! তা তো এতদিনে শোধ হয়ে যাওয়ার কথা! গেছেই বোধ হয়। তা এ-খবর কে দিল

আপনাকে? ভূতনাথ নাকি?'

'জয়কৃষ্ণ সরখেল তাঁর বাড়িঘর আপনার কাছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বাঁধা রেখেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর কি আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকার দাবিতে তাঁর নাবালক পুত্র-কন্যাকে বের করে দিয়ে জমি-বাড়ি দখল করেছেন?'

'এই দেখো কাণ্ড! তাই বলেছে বুঝি ভূতনাথ? একদম বিশ্বাস করবেন না মশাই, আমার বড্ড নরম মন। পাঁচ হাজার নয়, অনেক বেশিই নিয়েছিল জয়কৃষ্ণ। কাগজপত্র সব পরিষ্কার।'

'না, আপনি যে ভালো লোক তা যেন বুঝতে পারছি। তবে কিনা সেটা প্রমাণ করা বেশ শক্ত হবে। কলিকাল তো। এই কলিকালে ভালোমানুষদের যে কষ্ট পেতেই হয়। চলুন মশাই কষ্ট করে একটু থানায় চলুন। বড়োবাবু আপনার জন্য বসে আছেন।'

'সে কী? আর ভূতনাথ?'

'তাকে তো সরকার কী খেতাব-টেতাব দেবে বলে শুনছি। সেই চিঠিও আমার সঙ্গেই আছে।'

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারি বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকি। তখন এত সব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি, জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেইরকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানিতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায়সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো একনাগাড়ে তিন-চার কিংবা সাত দিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন-জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই তখন ছোটো ছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই। এমনিতে দোমোহানি জায়গাটা ভারি সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচু গাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজনও বেশি নয়। এক ধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনস্টিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু-তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড়ো সাহেবরা সে-খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানি।

দোমোহানিতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকিপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, 'এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভালো নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে-তাকে ঘরেদোরে ঢুকতে দেবেন না।' কিংবা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নি এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, 'নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলেপুলেদেরও সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভালো নয়।'

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, 'কাদের কথা বলছেন দিদি?'

পালিত-গিন্নি শুধু বললেন, 'সে আছে, বুঝবেনখন।'

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখিয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাশুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। এক মাসের ছুটি নিয়ে সুখিয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা অল্পবয়সি বউ এসে বলল, 'ঝি রাখবেন?'

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নি একদিন সকালে এসে বললেন, 'নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে।'

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলাতে এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নি মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'ওদের ওরকমই ধারা। ঝিটার নাম কী বলুন তো?'

দিদিমা বললেন, 'কমলা।'

পালিত-গিন্নি মাথা নেড়ে বললেন, 'চিনি, হালদার বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।'

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো।'

পালিত-গিন্নি শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, 'সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় তা চেনা ভারি মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।'

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নি, আর দিদিমা আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

সে মাথা নীচু করে বলল, 'মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড়ো লজ্জা পাই।'

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাস্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে-আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইসল দিল, গাড়িও ক্যাঁচকোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানিতে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা,

তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানির মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, 'ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন, তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না' . . . ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনও শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই এই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা-ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখ-বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচি আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন, 'চলে আসুন, সংকোচের কিছু নেই, আমি বাঘভাল্লুক নই' . . . ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, 'প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড'। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো-কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, 'কী হয়েছে! অ্যাঁ, কী হয়েছে!' এবং তারপর তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তার মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনও দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে চার-পাঁচ-সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোচ্ছে।

তখনকার মফসসল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলা-টেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসার ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, 'আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভালো। অতি আশ্চর্য খেলা।'

ভট্টাচার্যও বললেন, 'হ্যাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি।'

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, 'সে কী! এ তো আপনিই দেখালেন!'

ভট্টাচার্য আমতা-আমতা করে বললেন, 'তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য!'

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানিতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, 'তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?'

সবাই বলল, 'আঁশটে গন্ধ। কই, আমরা তো পাচ্ছি না।'

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, 'আলবাত আঁশটে গন্ধ। সে শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে আঁশটে গন্ধ একটা।'

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারি মুশকিল। একা হাতে সব করতেকম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখেশুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক সে ভালো। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ-বাড়িতে থাকে কী করে?'

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, 'এসব কী কথা বলছেন মাসিমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?'

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, 'ও হরি, তুমি বুঝি জান না? তাই বলি! তা বলি বাছা, দোমোহানির সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ওই দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।'

'কারা?' দিদিমা তবু অবাক।

'বুঝবে বাপু, রোসো।' বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানিতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের বড়ো অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনো লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারও বাসায় ঝি-চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন।

সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, 'ওরে, কে আছিস।' বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, 'যা, এটা ডাকে দিয়ে আয়।' দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?' সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, 'না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কি। খুব ভালো ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।'

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলি পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদ্দৌলা নাটকে তিনি লুতফা। গিরিশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপচাপা হয়ে কোঁ কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময় লুতফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, 'দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি।'

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, 'মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?'

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, 'সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়ো, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়োমাসি তখন কিছু বড়ো হয়েছে। অন্য মামা-মাসিরা নাবালক নাবালিকা। মার বড়ো লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসি রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, 'আয় রে!' অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সিই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড়ো হয়েছে, সেই বড়ো আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুটো পাড়িতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, 'কে খেলবি আয়।' অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সিই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হল একবার। দোমোহানির ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানির বাঙালি টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানির টিম খুব ভালো খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরও একখানা

দিয়েছে। এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারিকে বলল, 'ওরা বারো জন খেলছে।' রেফারি গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারিই খেলা থামিয়ে দোমোহানির ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের টিমে চার-পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।'

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারি, সবাই ভয় পায়। দোমোহানির ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, 'গুনে দেখুন।' রেফারি গুনে দেখে আহাম্মক। এগারো জনই।

দোমোহানির টিম আরও তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারি আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, 'দেয়ার আর অ্যাট লিস্ট টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।'

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় এগারো জন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিলপিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারি দোমোহানির টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে বললেন, 'শেষ তিনটে গোল যারা করছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?'

দোমোহানির ক্যাপ্টেন মিনমিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারি আরও রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফশে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, 'আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?'

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, 'ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

'কে? কাদের কথা বলছ?'

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ করতেন, আর বলতেন, 'এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বউমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?'

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, 'এ ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তাঘাটে লোকজন কারও সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, 'রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর কথাবার্তা।' এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানিতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটেবাজারে যেসব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারি অদ্ভুত। যেমন বড়োমামার কথা বলি। দোমোহানিতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারি ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ওই বয়সে ভূতের ভয় কারই-বা না থাকে। তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানিতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যেস যায়নি। একদিন সন্ধে বেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না-আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতরবাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই শুনছিস?'

অমনি একটা সমবয়সি ছেলে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছ?'

'আমি একটু বাথরুমে যাব, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।'

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি বলল, 'দাঁড়াব কেন? তোমার কীসের ভয়?'

বড়োমামা ধমক দিয়ে বলেন, 'ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।'

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়োমামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, 'কীসের ভয় বললে না?'

বড়োমামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভূতের।'

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়োমামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'খুব ফাজিল হয়েছ তোমরা।'

তা এইরকম সব হত দোমোহানিতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকেরা গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতের মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে শিঙ্গি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমশিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয় ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, 'এ তো ভালো কথা নয়! গন্ধটা খুব সন্দেহজনক! তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা?'

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, 'এ তো ভালো কথা নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?'

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ওই কথা বলে গেছে, ভাবা যায়?

হনুমান ও নিবারণ

নিবারণবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। উটকো উৎপাত তিনি পছন্দ করেন না। তবু তাঁর কপালেই হালে এক ঝামেলা এসে জুটেছে। বাড়ির সামনেই একখানা পেল্লায় জাম গাছ। সেই গাছে দু-তিন দিন আগে হঠাৎ কোথা থেকে এক বিশাল জাম্বুবান কেঁদো হনুমান এসে থানা গেড়েছে। এ তল্লাটে হনুমান বাঁদর ইত্যাদি কোনো কালেই ছিল না। হনুমানটা যে কোথা থেকে উটকো এসে জুটল তা কে জানে।

তা হনুমান আছে থাক, নিবারণবাবুর তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। হনুমান হনুমানের মতো থাক, তিনি থাকবেন তাঁর মতো। কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে হনুমান কী করে যেন টের পেয়েছে যে, এ পাড়ায় সবচেয়ে নিরীহ ভালোমানুষ হল এই নিবারণ ঘোষাল। হতচ্ছাড়া আর কাউকে কিছু বলে না, কারও দিকে দৃকপাত অবধি নেই। কিন্তু নিবারণবাবু বাড়ি থেকে বেরোলেই জাম গাছে তুমুল আলোড়ন তুলে হুপহাপ দুপদাপ করে দাপাদাপি করতে থাকে।

প্রথম দিনের ঘটনা। শান্ত শরৎকালের মনোরম সকাল। সোনার থালার মতো সূর্য উঠেছে। চারদিকে একেবারে আহ্লাদি রোদ। একখানা কোকিলও কুহুস্বরে ডাকছিল। নিবারণবাবু থলি হাতে প্রশান্ত মনে বাজার করতে বেরিয়েছেন। দুর্গা নাম স্মরণ করে চৌকাঠের বাইরে সবে পা রেখেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জাম গাছটায় ওই তুমুল কাণ্ড। নিবারণবাবু সভয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি ভারি ভীতু লোক।

গিন্নি বললেন, 'কী হল ফিরে এলে কেন?'

নিবারণবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'জামগাছে কী যেন একটা কাণ্ড হচ্ছে।'

গিন্নি হেসে বললেন, 'ও তো একটা হনুমান। কাল আমিও দেখেছি। পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল মারছিল।'

নিবারণবাবু একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই বলো! হনুমান!'

জাম গাছতলা দিয়েই রাস্তা আর রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাতায়াত করছে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা, বাজারমুখো এবং বাজারফেরত মানুষ, ঝাড়ুদার। হনুমান কাউকে দেখেই উত্তেজিত নয়, কিন্তু যেই নিবারণবাবু ফের দরজার বাইরে পা দিয়েছেন অমনি লম্ফঝম্ফ শুরু হয়ে গেল।

নিবারণবাবু তখন সাহসে ভর করে একটু দৌড় পায়েই জাম গাছটা পেরিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি রয়ে গেল মনের মধ্যে।

তবে সেদিন বাজারে গিয়ে মনটা ভারি ভালো হয়ে গেল। সস্তায় বেশ বড়ো বড়ো পাবদা মাছ পেয়ে গেলেন। মরশুমের প্রথম ফুলকপি একটু দর করতেই দাম নেমে গেল আর এক আঁটি ধনেপাতা কিনে ফেললেন মাত্র চার আনায়। বাজার সেরে যখন ফিরছেন তখন আর হনুমানটার কথা তাঁর খেয়াল নেই।

যেই আনমনে জাম গাছটার কাছাকাছি এসেছেন অমনি ডালপালায় তুমুল শব্দ করে হনুমানটা নেমে এল একেবারে নীচে। একখানা ডাল ধরে এমন ঝুল খেতে লাগল যে তার লেজখানা নিবারণবাবুর নাকের ডগা ছোঁয় ছোঁয়। নিবারণবাবু জীবনে দৌড়ঝাঁপ বিশেষ করেননি, তবু হনুমানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য সেদিন এমন দৌড় দিলেন যে তাঁর ছোটো ছেলে বিশু অবধি পরে প্রশংসা করে বলেছিল, 'বাবা, তুমি যদি সিরিয়াসলি দৌড়োতে তাহলে অলিম্পিক থেকে প্রাইজ আনতে পারতে। চটি-পরা পা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে কেউ যে অমন দৌড়োতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না।'

দৌড়টা যে ভালোই হয়েছিল তা নিবারণবাবুও জানেন, তবে শেষ অবধি চটিজোড়া পায়ে ছিল না, ছিটকে পড়েছিল। আর বাজারের ব্যাগ হাতছাড়া হয়ে সাধের পাবদা মাছ চারটে কাকে নিয়ে গেল, ছ-খানা ডিম ভাঙল আর রাস্তার একটা গোরু দু-খানা ফুলকপি চিবিয়ে খেয়ে নিল।

দ্বিতীয়বার ঘটনাটা ঘটল অফিসে বেরোনোর সময়। নিস্তব্ধ জাম গাছতলা দিয়ে বিস্তর লোক বিষয়কর্মে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু টিফিনকৌটো নিয়ে ছাতা বাগিয়ে গালে পানটি পুরে দুর্গানাম স্মরণ করে যেই নিবারণবাবু বেরোলেন অমনি জাম গাছে যেন ঝড় উঠল। হনুমানটা এ ডালে ও ডালে ভীষণ লাফালাফি করতে করতে হুপহাপ করে বকাঝকাই করতে লাগল বোধ হয়।

কিন্তু অফিস তো আর কামাই করা যায় না, নিবারণবাবু ছাতাখানা ফট করে খুলে তার নীচে আত্মগোপন করে প্রাণপণে দৌড় লাগালেন। কিন্তু স্পষ্ট টের পেলেন, জাম গাছটা পেরোনোর সময় হনুমানটা তাঁর ছাতায় একটা খাবলা মারল।

গত তিন দিন ধরে নিবারণবাবুর জীবনে আর শান্তি নেই। আসতে হনুমান, যেতে হনুমান। হনুমানটা কেন যে শুধু তাঁর পিছনেই লাগছে তা চিন্তা করে করে তিনি হয়রান। খেতে পারছেন না, ঘুমোতে পারছেন না, তিন দিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর দুই ছেলে কানু আর বিশু হনুমানটাকে তাড়ানোর জন্য বিস্তর ঢিল আর গুলতি ছুড়েছে, তাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরাও। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। হনুমানটি গাছের মগডালে উঠে ঘন ডালপালার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে। ইট-পাটকেল তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেনি।

গিন্নি বললেন, 'পূর্বজন্মে ও তোমার ভাই ছিল, তাই এত টান।'

নিবারণবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'আমি হনুমানের ভাই হতে যাব কেন?'

দুশ্চিন্তা নিয়েই নিবারণবাবু রাতে শুয়েছেন। তবে ঘুম আসছে না। মাথাটা বেশ গরম। কাল সকালেই আবার বাজার আছে, অফিস আছে। জাম গাছতলা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছেন। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে পুরী বা ওয়াল্টেয়ার ঘুরে আসবেন কি না তাও ভাবছেন।

হঠাৎ একটা বিকট হুপ শব্দে নিস্তব্ধ রাতটা যেন কেঁপে উঠল। নিবারণবাবু চমকে উঠে বসলেন আতঙ্কে। অন্ধকার ঘর, তবু জানলার দিকে চেয়ে তাঁর বুক হিম হয়ে গেল। জানালাটা অর্ধেক ভেজানো ছিল। এখন জানলাটা পুরো খোলা। আর গ্রিল ধরে সেই অতিকায় হনুমানটা দাঁড়িয়ে। দু-খানা চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।

ভয়ে এমন সিঁটিয়ে গেলেন নিবারণবাবু যে, কাউকে ডাকতে পারলেন না, গলা দিয়ে স্বরই বেরোল না তাঁর। কিছুক্ষণের জন্য যেন পাথর হয়ে গেলেন।

হঠাৎ একটা বেশ ভরাট গমগমে গলা বলে উঠল, 'ভয় পাবেন না . . . ভয়ের কিছু নেই . . .'

বিস্ময়ে হতবাক নিবারণবাবু। কে কথা বলল তা চারদিকে চেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কারও থাকার কথা নয়।

কণ্ঠস্বরটি ফের বলে উঠল, 'রামচন্দ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁর দূত মাত্র।'

নিবারণবাবু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্বপ্ন দেখছেন কি না তা বুঝবার জন্য হাতে একখানা রামচিমটি কেটে নিজেই ঃঃউ করে উঠলেন।

গলাটা বলল, 'স্বপ্ন নয়। যা দেখছেন, যা শুনছেন সব সত্যি।'

নিবারণবাবু হনুমানের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'কথাগুলো কি আপনিই বলছেন? মানুষের ভাষায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের হাতে সময় বিশেষ নেই। রামচন্দ্র অপেক্ষা করতে ভালোবাসেন না।'

'রামচন্দ্র কে?'

'আমার প্রভু।'

'কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে?'

'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।'

'ও বাবাঃ। আমি পারব না, আমার বড়ো ভয় করছে।'

'ভয় কীসের?'

'আমার ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।'

'গোলমালের কিছু নেই। চলে আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

নিবারণবাবু বুঝলেন, এসব ভূতুড়ে কাণ্ড। এবং বেশ জবরদস্ত ভূতের পাল্লায় তিনি পড়েছেন। তবে এখনও উদ্ধারের উপায় আছে। তিনি ঘুমন্ত গিন্নিকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে কানু আর বিশুকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। সে এমন রামধাক্কা আর বিকট চ্যাঁচানি যে মরা মানুষেরও উঠে বসবার কথা। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দই পেলেন না।

হনুমান বলল, 'ওদের ঘুম এখন ভাঙবে না। বৃথা চ্যাঁচামেচি করছেন।'

ভয়ে নিবারণবাবুর শরীর প্রথমে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তার ভয়ে আবার কলকল করে ঘাম হতে লাগল। বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করছে যে, হার্ট ফেল হওয়ার জোগাড়।

ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, এসব আমার ভালো লাগছে না।'

নিবারণবাবু শুয়ে পড়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলেন।

হনুমান বলল, 'নিবারণবাবু, প্রভুর হুকুম তামিল না করে আমার উপায় নেই। আপনি সহজে না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।'

এই বলে হনুমান চুপ করল। নিবারণবাবু চোখ মিটমিট করে দেখতে পেলেন হনুমান দু-হাতে গ্রিল টানাটানি করছে। শক্ত লোহার গ্রিল, ভাঙতে পারবে বলে মনে হল না

নিবারণবাবুর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হনুমান মাত্র একটা হ্যাঁচকা টানেই পুরো গ্রিলটা জানলার ফ্রেম থেকে উপড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলল।

নিবারণবাবু এত ভয় পেয়েছেন যে, আরও বেশি পাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মজা হল ভয় যখন সাংঘাতিক বেশি হয় তখন মানুষের একটা মরিয়া সাহসও আসে। চোর তাড়ানোর জন্য খাটের মাথার কাছে একখানা মোটা বেতের লাঠি রাখা থাকে। আজ অবধি সেটা কোনো কাজে লাগেনি। আজ লাগল। নিবারণবাবু ভাবলেন, এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি, সুতরাং আর ভয়ের কী? যা থাকে কপালে-

ভেবে লাফিয়ে উঠে তিনি লাঠিটা নিয়ে প্রবল বিক্রমে হনুমানের মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বসালেও লাঠিটা ঠিক মতো বসল না। হনুমান খুব আলগা হাতে লাঠিটা কেড়ে নিল হাত থেকে, তারপর সেটাকে প্যাঁকাটির মতো ভেঙে ফেলে বলল, 'কেন ঝামেলা করছেন? প্রভু রামচন্দ্র ডাকছেন, এ আপনার মহা সৌভাগ্য।'

নিবারণবাবু যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হনুমানটা লম্বায় প্রায় তাঁর সমান। আর চওড়ায় কুস্তিগিরদের মতো। এত বড়ো হনুমান তিনি এর আগে আর দেখেননি। বিপদে পড়ে মাথাটা একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি হনুমানের কথাগুলো শুনেও বুঝবার চেষ্টা করেননি। এবার তাঁর হঠাৎ মনে হল এ কি সেই রামচন্দ্রের হনুমান নাকি? হনুমান তো অমর, তার এখনও পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকবার কথা। আর প্রভু রামচন্দ্র তিনি তো স্বয়ং ভগবান। তাহলে এসব হচ্ছেটা কী? রামচন্দ্র তাঁর ভক্ত হনুমানকে পাঠিয়েছেন তাঁকে ডাকবার জন্য? কিন্তু কেন? তিনি তো তেমন উঁচুদরের ভক্ত বা ধার্মিক নন।

হনুমান জলদগম্ভীর গলায় বলল, 'আমার লেজটা ধরুন।'

ভয়ে ভয়ে নিবারণবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে লেজটা ধরলেন। আর ধরতেই যেন চৌম্বক আকর্ষণে হাত দুটো লেজের সঙ্গে আটকে গেল। আর দাঁড়ানোর উপায় রইল না।

তার পর যে কী হল তা নিবারণবাবু ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন না। হনুমান তাঁকে জানলা গলিয়ে বাইরে এনে ফেলল এবং তারপর ইঞ্জিনের মতো ছুটতে শুরু করল। এত ছুট জীবনে কখনো ছোটেননি নিবারণবাবু। তবে কেন যেন তার হাঁফ ধরছিল না। চোখের পলকে নিজেদের তল্লাট এবং শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠঘাটে এসে গেলেন তাঁরা। হনুমান মস্ত মস্ত লাফ মেরে ঢেউয়ের মতো চলছে। সঙ্গে সঙ্গে নিবারণবাবুও ঢেউ হয়ে বয়ে যাচ্ছেন। প্রায় দশ-বারো হাত দূরে দূরে এক-একবার পা মাটিতে ঠেকছে।

অনেকটা চলে আসার পর একটা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তাঁরা। তারপর একটা ফাঁকা চত্বর। জঙ্গলঘেরা জায়গাটায় একটা লোক পিছনে হাত রেখে মৃদুমন্দ পায়চারি করছে। লোকটা বেঁটে এবং দেখতে একটা কিম্ভূত। পরনে একটা পাশবালিশের ওয়াড়ের মতো পোশাক, মাথায় একটা সরু টুপি। লোকটার গোল মুখখানায় চোখ নাক কান কোনোটাই ঠিক জায়গায় নেই বলে মনে হল দূর থেকে।

কাছে গিয়ে হনুমান লোকটাকে প্রণাম করে বলল, 'প্রভু এনেছি।'

লোকটা নিবারণের দিকে ফিরে তাকাল, মুখটা ভালো করে দেখে আঁতকে উঠলেন নিবারণবাবু। এর চোখ দুটো দুই গালে। ঠোঁট দুটো নাকের ওপরে। আর গলা বলে কিছু নেই। কান দুটো গোরুর কানের মতো।

এই কি রামচন্দ্র? এত বিচ্ছিরি দেখতে?

রামচন্দ্র লোকটা ডান গালের চোখটা দিয়ে নিবারণবাবুকে দেখে নিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'পেন্নাম করলে না?'

'যে আজ্ঞে।' বলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র খক খক শব্দ করে হেসে বললেন, 'শোনো হে বাপু, আমি সত্যিই কিন্তু তোমাদের সেই রামায়ণের রামচন্দ্র নই। তার গল্পটা বেশ লাগে, তাই ভাবলুম রামচন্দ্র নামটা নিলে মন্দ হয় না।'

'আপনি আসলে কে তাহলে?'

লোকটা মাথাটা একটু নেড়ে বলে, 'সে বাপু অনেক কথা। তবে সোজা কথায় আমি এ তল্লাটের লোক নই, এই দেশের নই, এমনকী এই হতচ্ছাড়া নোংরা গ্রহেরও নই। অনেক দূরের পাল্লা রে বাপু। আর আমার এই হনুমানটিও আসল হনুমান নয়। কলের হনুমান। তবে কল হলেও ও বড়ো খুঁতখুঁতে, সবাইকে পছন্দ করে না। দুনিয়া ঘুরে ঘুরে মাত্র একটা লোককেই ও বেছে বের করেছে। সে হল তুমি।'

নিবারণবাবু ঘন ঘন চোখ কচলাচ্ছিলেন। প্রত্যয় হচ্ছে না। যা শুনছেন সব সত্যি নাকি? এসব তো কল্পবিজ্ঞানে থাকে।

রামচন্দ্র বলল, 'তোমাদের গ্রহটা নোংরা হলেও মহাকাশে আমার কাজের পক্ষে সুবিধেজনক। আমার হনুমানকে তাই তোমাদের গ্রহে পাকাপাকি ভাবে রেখে যেতে চাই। সমস্যা হল, ওকে ঠিকমতো দেখাশুনা করার লোক চাই। ও তোমাকে খুঁজে বের করেছে, কাজেই ওর ভার তোমাকেই নিতে হবে।'

নিবারণবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'যে আজ্ঞে, তবে কেমন যত্নআত্তি করতে হবে?'

'খুব সোজা, ওর মাথায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, চাঁদির একেবারে মাঝখানে। এই তেলের কৌটোটা নাও, মাসে একবার ওই ফুটোর মধ্যে দু-ফোঁটা তেল ঢেলে দিলেই হবে। আর তোমার বাড়ির জাম গাছটাতেই ও থাকবে। ওকে যেন কেউ বিরক্ত না করে দেখো। বেশি বিরক্ত করলে কিন্তু ও গা থেকে এমন রশ্মি বের করতে পারে যা তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।'

নিবারণবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'যে আজ্ঞে।'

'আর তুমি ইচ্ছে করলে ওকে ফাইফরমাশ করতে পার, ওর সঙ্গে হিল্লি-দিল্লি বেড়িয়ে আসতে পার।'

নিবারণবাবু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, 'যে আজ্ঞে।'

'তাহলে এসো গিয়ে। কোনোরকম গোলমাল কোরো না কিন্তু।'

'আজ্ঞে না।'

লোকটা অর্থাৎ রামচন্দ্র গটগট করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শিস দিল। অমনি মাটির তলা থেকে একটা কিম্ভূত পটলাকৃতি মহাকাশযান বেরিয়ে এল। লোকটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই জিনিসটা সাঁ করে আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

নিবারণবাবু এখন বেশ আছেন। হনুমানটা জাম গাছেই থাকে। তবে তাকে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং মাঝরাতে হনুমানটা এসে তাঁর সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিয়ে যায়। ঘরের কাজকর্মও অনেক করে দেয়। গিন্নি তো পছন্দ করেনই, বিশু আর কানুরও সে বেশ বন্ধু হয়ে গেছে।

হনুমানকে তেল দিতে নিবারণবাবুর একবারও ভুল হয় না।

ভুসুকু পণ্ডিত

ভুসুকু পণ্ডিত ভারি অলস। পাঠশালায় পড়াতে পড়াতে ছেলেদের টাস্ক করতে দিয়ে প্রায় সময়েই ঘুমিয়ে পড়েন। আর ছেলেরা সেই সুযোগে দেদার ফাঁকি দেয়।

সময়টা ২০৯৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের সকাল। ভুসুকু পণ্ডিত ছেলেদের একটা রচনা লিখতে দিলেন, বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ? তারপর ঘুমোতে লাগলেন।

পাঠশালা বসে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের তলায়। নিয়ম হয়েছে সেই আগেকার দিনের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। তাই এই ব্যবস্থা। ভুসুকু পণ্ডিত বসেন গাছতলায় উঁচু একটা বেদিতে। ছেলেরা বসে ঘাসের ওপর মাদুর পেতে।

ভুসুকু পণ্ডিত ঘুমিয়ে পড়েছেন টের পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ছেলেরা নিজেদের কাজ শুরু করে দিল। একটি ছেলে পকেট থেকে ছোট্ট একটা লেসার রশ্মির পিস্তল বের করে টুকটাক ফল পাড়তে লাগল। একজন পকেট কমপিউটারের সঙ্গে খেলতে বসল দাবা। জনা তিনেক একটা হাতঘড়ি সাইজের টেলিভিশনে চুপিচুপি অ্যাডভেঞ্চারের ফিল্ম দেখতে লাগল। একজন অ্যান্টিগ্র্যাভিটি সাইকেলে উঠে আকাশে চক্কর দিতে থাকল। একজন দুষ্টু ছেলে আর একজনকে ডেকে বলল, 'অ্যাই, আজ চল পণ্ডিতমশাইয়ের টিকি কেটে দিই।'

দ্বিতীয় ছেলেটা চোখ গোল করে বলে ওঠে, 'ওরে বাবা! টের পেলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'

কথাটা ঠিক। ভুসুকু পণ্ডিতের চেহারাটা এমনিতে নাদুসনুদুস। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা, কাঁধের ওপর একটা ভাঁজ করা উড়ুনি। পৈতেটা ধপধপ করছে সাদা। নিষ্ঠাবান মানুষ।

চেহারাটা নিরীহ হলে কী হয়, ভুসুকু পণ্ডিত সাংঘাতিক রাগী লোক।

দুষ্টু ছেলেটা বলল, 'টের পেলে তো।'

দ্বিতীয় জন ভয়ে ভয়ে বলে, 'পারবি?'

'খুব পারব।' এই বলে ছেলেটা পকেট থেকে একটা খুদে ওয়াকি-টকি বের করে অন্য সব ছেলেদের উদ্দেশে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ, আজ ভুসুকু পণ্ডিতমশাইয়ের শিখা কর্তন করা হইবে। তোমরা কেহ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিবে না যে, অপকর্মটি কে করিয়াছে। কেহ যদি প্রকাশ কর, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে।'

অন্য সব ছেলেরা তাদের গলার কাছে বাঁধা ট্রান্সরিসিভার যন্ত্রে ঘোষণাটা শুনতে পেয়ে ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করল না।

দুষ্টু ছেলেটা তার ব্যাগ থেকে একটা সোনার রেঞ্জ বের করল। যন্ত্রটা দিয়ে ইচ্ছামতো নানারকম শব্দ বের করা যায়, মাইক্রোফিল্মের মতো এর ভিতরে আছে একটি প্রি-রেকর্ডেড মাইক্রো-ক্যাসেট রেকর্ডার। ছেলেটা একটা বোতাম টিপে যন্ত্রটা চালু করল। তারপর একটা পিস্তলের নলের মতো ব্যারেল লাগিয়ে সেটা তাক করল ভুসুকু পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে।

ব্যাপারটা হল, এই শব্দটা আসলে ঘুমপাড়ানি শব্দ। যার দিকে তাক করে শব্দটা নিক্ষেপ করা হবে সে ছাড়া আর কেউ তা শুনতে পাবে না। অবশ্য কানে শোনার শব্দও এটা নয়। এটা হল এক ধরনের কাঁপন বা ভাইব্রেশন, যা আধ মিনিটের মধ্যে যেকোনো লোককে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে।

দুষ্টু ছেলেটা পুরো এক মিনিট শব্দটা চালাল। তারপর আস্তে আস্তে উঠল। প্রত্যেকে দুরুদুরু বুকে চেয়ে আছে দুঃসাহসী ছেলেটার দিকে। যন্ত্রের প্রভাবে পণ্ডিতমশাই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেছেন বটে, কিন্তু এক সময়ে তো জাগবেন! তখন যে কী কুরুক্ষেত্রটাই হবে!

ছেলেটা পকেট থেকে একটা ধারালো কাঁচি বের করে পণ্ডিতমশাইয়ের পেছনে গিয়ে কুচ করে টিকিটা কেটে এক দৌড়ে পালিয়ে এল নিজের জায়গায়। পাঠশালায় এক চাপা হাসির হররা বয়ে গেল।

সেই শব্দেই কি না কে জানে, আচমকা পণ্ডিতমশাই চোখ মেলে চাইলেন।

ছেলেরা তো ভয়ে কাঠ। শ্বাস বন্ধ করে বসে আছে সব। একটু অবাকও হয়েছে তারা। ভাইব্রেটার দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে পণ্ডিতমশাইকে, এত সহজে তো তাঁর জাগবার কথা নয়।

ভুসুকু পণ্ডিতমশাই চোখ চেয়েই বিশাল একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন হঠাৎ। ছেলেরা স্তম্ভিত। তারা কখনো পণ্ডিতমশাইকে হাসতে দেখেনি।

কিন্তু তাদের আরও স্তম্ভিত করে দিল, পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আজ তোমাদের ছুটি! ছুটি!'

ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠল, 'ছুটি পণ্ডিতমশাই?'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, 'কীসের লেখাপড়া হ্যা! অ্যাঁ! লেখাপড়া অত কীসের? বাচ্চা ছেলেরা নাচবে, গাইবে, দুষ্টুমি করবে, তবে না! ওঠো সব, উঠে পড়ো! আজ আমাদের গান হবে। নাচ হবে। হুল্লোড় হবে।'

বলেন কী পণ্ডিতমশাই? ছেলেদের চোখের ভাব ক্রমশ আরও গোল হয়ে উঠছে।

ভুসুকু পণ্ডিত হঠাৎ নিজেই তড়াক করে বেদি থেকে নেমে পড়লেন। তারপর দু-হাত তুলে গান ধরলেন, 'আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি . . . গাও! গাও!'

ছেলেরাও গাইতে লাগল।

ভুসুকু পণ্ডিত নাচতে নাচতে বললেন, 'শুধু গাইলেই হবে না, নাচো!' সবাই নাচতে শুরু করো।

তা ছেলেদের তো পোয়া বারো। রচনা ছেড়ে নাচ-গান? এ কী ভাবা যায়! তারা সবাই পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে নাচতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ নাচ-গান হওয়ার পর ভুসুকু পণ্ডিতমশাই বললেন, 'শুধু নাচ-গান নয়। চলো সবাই মিলে একটু দুষ্টুমি করা যাক। চলো সনাতন মুতসুদ্দির বাগান থেকে পেয়ারা চুরি করি।'

ছেলেরা নিজের কানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'বলেন কী পণ্ডিতমশাই?'

কিন্তু ভুসুকুর যেই কথা সেই কাজ। তিনি সবার আগে গিয়ে সনাতনের বাগানের বৈদ্যুতিক কাঁটাতারের বেড়াটিকে এক জায়গায় কেটে ফাঁক করে ঢোকার রাস্তা বানালেন। তারপর বাগানে ঢুকে নিজেই ঢিল মেরে এবং একটি ছেলের কাছ থেকে লেসার গান চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে মেলা পেয়ারা পেড়ে ফেললেন। সনাতনের রোবট চাকরগুলো তেড়ে আসায় পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নিয়ে পালিয়ে এলেন। তারপর বললেন, 'চলো একটু ফুটবল খেলা যাক।'

ছেলেদের আনন্দ আর ধরে না। পড়াশোনা ছেড়ে এরকম মজার সময় কাটানো মহাভাগ্যের ব্যাপার। পণ্ডিতমশাই নিজে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে নেমে পড়লেন। বিস্তর আছাড় খেলেন বটে, কিন্তু খেললেনও চমৎকার। দুটো দারুণ গোল করলেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের এত বিদ্যের কথা কেউ জানত না।

খেলার শেষে পণ্ডিতমশাই বললেন, 'ওহে, চলো পুকুরে স্নান করতে নামি।'

ছেলেরা এই প্রস্তাবে হইহই করে উঠল। কাছেই চমৎকার বাঁধানো পুকুর। পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। তুমুল আনন্দে সবাই স্নান করতে লাগল।

কিন্তু আচমকাই তাদের আনন্দের মধ্যে একটা বজ্র এসে পড়ল যেন। আকাশ থেকে একটা ছোট্ট নৌকোর সাইজের রকেট নেমে এল। তা থেকে গম্ভীর চেহারার একজন লোক নেমে এসে ভুসুকু পণ্ডিতমশাইকে একটা ধমক দিয়ে বলল, 'শিগগির উঠে আসুন।'

ভুসুকু পণ্ডিত যেন একটু ভয় পেয়েই জল থেকে উঠলেন। সঙ্গে ছেলেরা।

লোকটা ভুসুকু পণ্ডিতমশাইকে ভালো করে লক্ষ করল, ঘুরে ফিরে দেখল, তারপর ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, 'এর অ্যানটেনাটা কে কেটেছে?'

ছেলেরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে।

লোকটা বলল, 'দুষ্টু ছেলে! ছিঃ।'

এই বলে সকলের চোখের সামনে লোকটা একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের মাথার খুলিটা ফাঁক করে ফেলল, তারপর একটা নতুন টিকি বসিয়ে দিয়ে মাথাটা আবার জুড়ে বলল, 'ঃএ, এই কম্পিউটারটার একটা পার্টস খারাপ ছিল? কেউ লক্ষই করিনি, টিকিটা কাটায় ভালোই হয়েছে। যাও, এবার আর পণ্ডিতমশাই ঘুমোবেন না।'

টিকিটা লাগানোর সঙ্গেসঙ্গে ভুসুকু পণ্ডিতমশাই আবার গম্ভীর ও রাগী হয়ে গেলেন। গাছতলায় পাঠশালার ছেলেদের জড়ো করে গমগমে গলায় বললেন, 'এবার আঁকের খাতা খোলো সব। করো তো, একসারসাইজ ষোলোর এক থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত আঁকগুলো।'

ছেলেরা প্রাণভয়ে আঁক কষতে লাগল। কারণ ভুসুকু পণ্ডিতের চোখে ঘুমের লেশমাত্র আর নেই। দুই চোখ ভাঁটার মতো চারদিকে ঘুরছে।

শক্তিপরীক্ষা

রামরিখ পালোয়ান রাজবাড়ি চলেছে। সেখানে আজ বিরাট শক্তিপরীক্ষা। নানা দেশ থেকে বহু পালোয়ান জড়ো হবে। তারপর কার কত শক্তি তার পরীক্ষা দিতে হবে। কুস্তি-টুস্তি নয়, শুধু যে যতটা পারে নিজের শক্তি দেখাবে, তা যে যেভাবে পারে। রামরিখ ভেবেচিন্তে একটা পাঁচ মন ওজনের লোহার গদা নিয়েছে। এইটে সে বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। গদাটা একটা গোরুর গাড়িতে করে পেছনে আসছে।

রামরিখ আজ ধুতি পরেছে। গায়ে রঙিন জামা, মাথায় পাগড়ি। মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিতে দিতে নাগরা জুতোর শব্দ তুলে হাঁটছে। মনে একটু স্ফূর্তি। তার ধারণা, আজকের পরীক্ষায় সে-ই আসর মাত করে আসবে। ওস্তাদকে একশো মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজবাড়ি আর বেশি দূর নয়। দু-খানা গ্রাম পেরোলেই শহর। শহরের মাঝখানে মস্ত রাজবাড়ি। চারদিকে বিশাল অঙ্গন। আজ হাজার হাজার মানুষ পালোয়ানদের দেখতে আসবে।

সামনেই একটা গোরুর গাড়ি যাচ্ছে। গোরুর গাড়িতে একটা বড়োসড়ো চেহারার লোক বসে বসে ঢুলছে। রামরিখ দেখতে পেল গোরুর গাড়িটা রাস্তায় একটা খাদে পড়ে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আটকে গেছে। বলদ দুটো টেনে তুলতে পারছে না। যে লোকটা ঢুলছিল সে একটু বিরক্ত হয়ে নেমে পড়ল। মালকোঁচা মারছে। রামরিখ কাঁধ দিয়ে একটা চাড় মেরে গোরুর গাড়িটা খাদ থেকে তুলে দিয়ে বলল, 'সামান্য কাজ।' মোটাসোটা লোকটা তার দিকে চেয়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'পালোয়ান নাকি তুমি?'

'ওই সামান্য কিছু চর্চা করি আর কি।'

'বেশ, বেশ।' বলে লোকটা একটু হাসল, 'তা তোমার জিনিসপত্র কই?'

'ওই যে, গোরুর গাড়িতে। পাঁচ মন ওজনের গদা।'

লোকটা অবাক হয়ে বলে, 'পাঁচ মন? যাঃ।'

কথা কইতে কইতে পিছনের গোরুর গাড়িটা কাছে চলে এল। রামরিখ গদাটা দেখিয়ে বলল, 'ওই যে।'

লোকটা গদাটা দেখে বলল, 'এটা ফাঁপা জিনিস নয় তো!'

রামরিখ হেসে বলল, 'আরে না, নিরেট লোহার গদা।'

'হতেই পারে না।' বলে লোকটা গদাটা তুলে নিয়ে হাতে নাচিয়ে একটু দেখে নিয়ে হঠাৎ নিজের হাঁটুটা তুলে তার ওপর রেখে দু-হাতের চাড় দিয়ে মচাৎ করে সেটা দু-আধখানা করে ভেঙে ফেলল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, নিরেট জিনিসই বটে হে।'

রামরিখ হাঁ করে চেয়ে রইল। লোহার গদা কেউ ভাঙতে পারে এ তার জানা ছিল না।

লোকটা মুখে একটু দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'সামনের গাঁয়েই কামারশালা আছে, জুড়ে নিয়ো ভাই। অসাবধানে তোমার খেলনাটা ভেঙে ফেলেছি।' বলে লোকটা চলে গেল।

রামরিখ গদাটা কামারশালায় জুড়ে নিতে গাঁয়ে ঢুকল। একটু চিন্তিত। মনে আর তত স্ফূর্তি নেই। কামার ভীষণ ব্যস্ত। বলল, 'আমার যে গদা জোড়া দেওয়ার সময় নেই।'

রামরিখ করুণ গলায় বলল, 'ভাই, আমি যে রাজবাড়ির শক্তিপরীক্ষায় যাচ্ছি। সময় নেই, একটু করে দাও ভাই।'

কামার খুবই বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোথায় তোমার গদা?'

'এই যে!'

কামার গদার টুকরো দুটো দু-হাতে তুলে বলল, 'এইটুকু গদা!' বলে কামারশালার আর এক কোণে অন্তত একশো হাত দূরে যেখানে তার ছোটো ছেলেটি কাজ করছিল সেদিকে ছুড়ে দিতে দিতে বলল, 'ওরে বিশে, এ দুটো টুকরো জুড়ে দে তো!'

বিশে একটা টুকরো বাঁ হাতে, অন্যটা ডান হাতে লুফে নিয়ে বলল, 'দিই বাবা।'

রামরিখ অধোবদন হয়ে বসে রইল। গদা জুড়ে নিয়ে রামরিখ ফের যখন রওনা হল তখন তার পা চলছে না। মনটা বড়োই খারাপ।

আর একটা গাঁ পেরোলেই শহর। রাস্তার পাশে কতগুলো ছেলে ডাংগুলি খেলছিল। কী কারণে তাদের মধ্যে একটু বিবাদ হয়েছে। হঠাৎ একটা ছেলে ছুটে এসে বলল, 'মশাই,

আপনার ডান্ডাটা একটু ধার দেবেন? আমরা এই পার্টিটা খেলেই দিয়ে দেব। আমাদের ডান্ডাটা ভেঙে গেল কিনা এইমাত্র।'

বলেই ছেলেটা গদাটা গোরুর গাড়ির ওপর থেকে তুলে নিয়েই ছুট। রামরিখ দাঁড়িয়ে দেখল, ছেলেটা তার গদা দিয়ে গুটি তুলল, তারপর সেই গুটি সত্তর হাত দূরে পাঠাল। গদা দিয়ে এক হাতে দূরত্বটা মাপল। তারপর দৌড়ে এসে ফের গোরুর গাড়িতে গদাটা রেখে ছুটে চলে গেল।

রামরিখ আর এগোল না। গোরুর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফেরত যেতে লাগল।

রাজার মন ভালো নেই

রাজার মন আর কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। মন ভালো করতে লোকেরা কম মেহনত করেনি। রাজাকে গান শোনানো হয়েছে, নাচ দেখানো হয়েছে, বিদূষক এসে হাজার রকমের ভাঁড়ামি করেছে, যাত্রা, নাটক, মেলা-মচ্ছব, যাগ-যজ্ঞ পুজো-পাঠ সব হল। পুবের রাজ্য থেকে আনারস, উত্তরের হিমরাজ্য থেকে আপেল, পশ্চিম থেকে আখরোট, আঙুর, পেস্তা বাদাম, দেশ-বিদেশ থেকে ক্ষীর আর ছানার মিষ্টি এনে খাওয়ানো হয়েছে। এখন সাহেব আর চীনে রসুইকররা দু-বেলা হরেক খাবার বানাচ্ছে। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুক কাঁপিয়ে হুহুংকারে এক-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। 'না হে, মনটা ভালো নেই।'

রাজবৈদ্য এসে সারাদিন বসে নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকেন। নাড়ি কখনো তেজি, কখনো মরা, কখনো মোটা, কখনো সরু। রাজবৈদ্য আপনমনে হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করেন, তারপর শতেকরকম শেকড়-বাকড় পাতা বেটে ওষুধ তৈরি করে শতেক অনুপান দিয়ে রাজাকে খাওয়ান। রাজা খেয়ে যান। তারপর হড়াস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। 'না হে, মনটা ভালো নেই।'

রাজার মন ভালো করতে রাজপুত্তুর আর সেনাপতিরা আশপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে হেরো রাজাগুলোকে বন্দি করে নিয়ে এল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। 'মনটা বড়ো খারাপ রে।'

তখন মন্ত্রীমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলশকর পাইক-পেয়াদা নিয়ে রাজা শ-দেড়েক তীর্থ আর দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, 'হায় হায়। মনটা একদম ভালো নেই।'

ওদিকে ভাঁড়ামি করে করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রাজনর্তকীর পায়ে বাত। সভাগায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকরদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে। রাজবৈদ্যকে ধরেছে ভীমরতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রীমশাইয়ের মাথায় একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন। রাজ-পুরোহিত হোম-যজ্ঞে এত ঘি পুড়িয়েছেন যে, এখন ঘিয়ের গন্ধ নাকে গেলে তাঁর মূর্ছা হয়। প্রজাদের মধ্যে কিছু অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। সভাপণ্ডিতরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন। রাজজ্যোতিষী রাজার জন্মকুণ্ডলী বিচার করতে করতে, আঁক কষে কষে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরিয়ে ফেলেছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুল-বাগিচায় বসে আছেন। চারদিকে হাজারো রকমের ফুলের বন্যা, রঙে গন্ধে ছয়লাপ। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা মধুর স্বরে ডাকছে। সামনের বিশাল সুন্দর দিঘিতে মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

রাজা চুপচাপ বসে থেকে থেকে হঠাৎ সিংহগর্জনে বলে উঠলেন, 'গর্দান চাই।'

মন্ত্রী পাশেই ছিলেন, আপনমনে বিড়বিড় করছিলেন, মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, 'কার গর্দান মহারাজ?'

রাজা লজ্জা পেয়ে বলেন, 'দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হল কার যেন গর্দান নেওয়া দরকার।'

মন্ত্রী বললেন, 'ভাবুন মহারাজ, আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।'

বহুকালের মধ্যেও রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ায় মন্ত্রীর আশা হল, এবার রাজার মনোমতো একটা গর্দান দিলে বোধ হয় মন ভালো হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভার কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'না হে, গর্দান নয়। গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।'

বিকেল বেলা রাজা প্রাসাদের বিশাল ছাদে পায়চারি করছিলেন। সঙ্গে রাজকীয় কুকুর, তাম্বুলদার, হুক্কাদার, মন্ত্রী। পায়চারি করতে করতে রাজা হঠাৎ নদীর ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বুড়ির ঘরে আগুন দে! দে আগুন বুড়ির ঘরে।'

মন্ত্রীর বিড়বিড় করা থেমে গেল। রাজার সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'জো হুকুম মহারাজ। শুধু বুড়ির নামটা বলুন।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'কী বললাম বলো তো!'

'আজ্ঞে, এই যে বুড়ির ঘরে আগুন দিতে বললেন।'

রাজা ঘাড় চুলকে বললেন, 'বলেছি নাকি? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।'

সেইদিনই শেষ রাতে রাজা ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন, 'বিছুটি লাগা। শিগগির বিছুটি লাগা।'

পরদিনই খবর রটে গেল, রাজা বিছুটি লাগাতে বলেছেন। আতঙ্কে সবাই অস্থির।

মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ! কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন, বিছুটি আনতে পশ্চিমের পাহাড়ে লোক পাঠিয়েছি।'

'বিছুটি!' বলে রাজা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গোরুর গাড়ি বোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনের অঙ্গনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেদিকে মন নেই।

রাজা রঙ্গঘরে বসে বয়স্যদের সঙ্গে ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। মুখ গম্ভীর, চোখে অন্যমনস্ক একটা ভাব। বয়স্যরা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে জিতবার সুবিধে করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল।

খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, 'পুঁতে ফেললে কেমন হয়?'

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'খুব ভালো হয় মহারাজ। শুধু একবার হুকুম করুন।'

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'কীসের ভালো হয়? কিছুতেই ভালো হবে না মন্ত্রী। মনটা একদম খারাপ।'

মন্ত্রী বিমর্ষ হয়ে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন।

পরদিন রাজা শিকারে গেলেন। সঙ্গে বিস্তর লোকলশকর, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রথ। বনের মধ্যে রাজার শিকারের সুবিধের জন্যই হরিণ, খরগোশ, পাখি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। একটা বাঘও আছে। রাজা ঘোড়ার পিঠে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কিন্তু একটাও তির ছুড়লেন না। দুপুরে বনভোজনে বসে পোলাও দিয়ে মাংসের ঝোল মেখে খেতে খেতে বলে উঠলেন, 'বাপ রে! ভীষণ ভূত!'

মন্ত্রীমশাই সঙ্গেসঙ্গে মাংসের হাত মাথায় মুছে উঠে পড়লেন। রাজামশাইয়ের সামনে এসে বললেন, 'তাই বলুন মহারাজ! ভূত! তা তারই-বা ভাবনা কী? ভূতের রোজাকে ধরে

আনাচ্ছি, রাজ্যে যত ভূত আছে ধরে ধরে সব শূলে দেওয়া হবে।'

রাজা হাঁ করে রইলেন। বললেন, 'ভূত। না না ভূত নয়। ভূত হবে কী করে? ভূতের কি কখনো মাথা ধরে?'

মন্ত্রীমশাই আশার আলো দেখতে পেয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'মাথা ধরলেও বদ্যি-ভূত আছে। তারা ভূতের ওষুধ জানে।'

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি ভূতের কথা ভাবছি না। মনটা বড়ো খারাপ।'

কয়েকদিন পর রাজা এক জ্যোৎস্না রাতে অন্দরমহলের অলিন্দে রানির পাশাপাশি বসে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'চলো রানি, চাঁদের আলোয় বসে পান্তাভাত খাই।'

রানি তো প্রথমে অবাক। তারপর তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এসে হাতজোড় করে বললেন, 'তা এ আর বেশি কথা কী? ওরে, তোরা সব পান্তাভাতের জোগাড় কর।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'পান্তাভাত? পান্তাভাতটা কী জিনিস বলো তো?'

'জলে ভেজানো ভাত মহারাজ, গরিবরা খায়। কিন্তু আপনি নিজেই তো পান্তাভাতের কথা বললেন।'

'বলেছি! তা হবে। কখন যে কী বলি, মনটা ভালো নেই তো, তাই।'

মন্ত্রীমশাই ফিরে গেলেন। তবে সেই রাত্রেই তিনি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চার জন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, 'ওরে তোরা আজ থেকে পালা করে রাজামশাইয়ের ওপর নজর রাখবি। চব্বিশ ঘণ্টা।'

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, 'রাজামশাই ভোর রাত্রে বিছানা থেকে নেমে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।'

আর একজন বলল, 'রাজামশাই একা-একাই লাল জামা নেব, লাল জামা নেব, বলে খুঁতখুঁত করে কাঁদছেন।'

আর একজন এসে খবর দিল, 'রাজামশাই এক দাসীর বাচ্চা ছেলের হাত থেকে একটা মণ্ডা কেড়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন, এইমাত্র।'

চতুর্থ জন বলল, 'আমি অতশত জানি না, শুধু শুনলাম রাজামশাই খুব ঘন ঘন ঢেঁকুর তুলছেন আর বলছেন সবই তো হল, আর কেন?'

মন্ত্রীর মাথা আরও গরম হল। তবু বললেন, 'ঠিক আছে, নজর রেখে যা।'

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, 'আজ্ঞে, রাজামশাই আমাকে ধরে ফেলেছেন। রাত্রে শোয়ার ঘরের জানলা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, 'নজর রাখছিস? রাখ বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।'

দ্বিতীয় জন এসে বলে, 'আজ্ঞে আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাকে বললেন, কানে কেন্নো ঢুকবে, বেরিয়ে আয়।'

তৃতীয় জন কান চুলকে লাজুক লাজুক ভাব করে বলল, 'আজ্ঞে আমি বিকেলে রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভুঁইমালী সেজে গাছ ছাঁটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, ওরে, ভালো গুপ্তচর হতে গেলে সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই। বলে রাজা নিজেই গাছ ছেঁটে দেখিয়ে দিলেন।'

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর সেই রাখহরি তখনও এসে পৌঁছোয়নি। মন্ত্রী একটু চিন্তায় পড়লেন।

ওদিকে রাখহরি কিন্তু বেশি কলাকৌশল করতে যায়নি। সকাল বেলা রাজার শোয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি। আপনার ওপর নজর রাখছি।'

রাজা অবাক হলেও স্মিত হাসলেন। হাই তুলে বললেন, 'বেশ বেশ, মন দিয়ে কাজ করো।'

তারপর রাজা যেখানে যান পেছনে রাখহরি ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, 'চিমটি দে। রাম চিমটি দে।'

সঙ্গেসঙ্গে রাখহরি রাজার পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁক করে উঠে বললেন, 'করিস কী, করিস কী? ওরে বাবা।'

রাখহরি বলল, 'বললেন যে।'

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন।

আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ল্যাং মেরে ফেলে দে।' বলতে না বলতেই রাখহরি ল্যাং মারল। রাজা চিতপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। রাখহরি রাজার গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিল। রাজা শ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ।'

রাত পর্যন্ত রাজা আর কোনো ঝামেলা করলেন না। রাখহরি রাজার পিছু পিছু শোয়ার ঘরে ঢুকল এবং রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা আড়চোখে

দেখে একটু হাসলেন। আপত্তি করলেন না। তবে শোয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ খুঁতখুঁত করে বলে উঠলেন, 'ঠান্ডা জলে চান করব, ঠান্ডা জলে . . .' রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের সোনার কলসের কেওড়া আর গোলাপের সুগন্ধ মেশানো জলটা সবটুকু রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে কেশে উঠে বসলেন। কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। রাখহরির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা শুগে যা।'

রাখহরি অবশ্য শুতে গেল না। পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দে বুকে ছোরা বসিয়ে দে . . .' চকিতে রাখহরি কোমরের ছোরাখানা তুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাজা বললেন, 'থাক থাক, ওতেই হবে। তোর কথা আমার মনে ছিল না।'

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হো-হো করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোকজন ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দু-হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, 'ওরে আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! ভীষণ হাসি পাচ্ছে।'

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাক বাবা! মন খারাপটা গেছে তাহলে।'

হাসতে হাসতে রাজা বিষম খেয়ে বললেন, 'ঃও হোঃ হোঃ। কী আনন্দ। কী আনন্দ!'

তারপর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল আবার। কারণ নেই, কিছু নেই, রাজা সব সময়ে কেবল ফিক ফিক করে হেসে ফেলছেন। খুব দুঃসংবাদ দিলেও হাসতে থাকেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিক ফিক। অমুক মারা গেছে? ফিক ফিক। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিক ফিক। দক্ষিণের রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে? ফিক ফিক।

রাজার হাসি বন্ধ করার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে।

উলট-পুরাণ

বাইরের জরুরি কাজ সেরে ফিরতে এবার একটু দেরিই হল বজ্রবাহুর। কাজটাও ছিল ঝামেলার আর দূরত্বটাও বড়ো কম নয়। তবে দেরি হলেও বাড়ির খবর নিয়মিতই পেয়েছেন। তাঁর মা, বাবা, স্ত্রী এবং খোকা-খুকিরা ভালোই আছে। আড়াই হাজার বছরে আর এমন কী-ই বা বিশেষ পরিবর্তন হবে।

এই আড়াই হাজার বছর শুনতে যতটা, কার্যত তো ততটা নয়। কারণ মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে যেতে যেতে আপেক্ষিক নিয়মে যতটা সময় লাগে, তার ঢের বেশি সময় পৃথিবীতে অতিক্রান্ত হয়। আর কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে সময় তো টেরও পাওয়া যায় না। বজ্রবাহু যে-নক্ষত্রের মণ্ডলে গিয়েছিলেন সে-নক্ষত্রটি সূর্যের চেয়ে দশগুণ বড়ো। আর তার মণ্ডলে রয়েছে অন্তত আড়াইশো সবুজ সজীব গ্রহ, যার প্রত্যেকটিই মানুষের পক্ষে বাসযোগ্য। তাদের মধ্যে অন্তত কুড়িটিতে অতি সুসভ্য সব জীবের বাস, যারা অনেকটাই মানুষের মতো। তবে বিজ্ঞানে তেমন উন্নতি করেনি। এইসব গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে ঘুরে বিস্তর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে বজ্রবাহু ও তাঁর দলকে। তাঁদের সফর খুবই সফল হয়েছে, পৃথিবীতে তাঁদের খুবই প্রশংসা হচ্ছে। আলোর চেয়েও বহু-বহুগুণ গতিবেগসম্পন্ন কণিকা তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের নিত্যই কথাবার্তা হত। নতুন এই মণ্ডলের সুসভ্য প্রাণীদের কয়েকজনকে নিয়ে আসতে পারলে ভালো হত। কিন্তু জীবগুলি খুবই আদুরে। তাদের গ্রহগুলিতে এত খাদ্যশস্য, এত ভালো আবহাওয়া এবং এমনই আরামে তারা আছে যে, মাথা ঘামিয়ে বা খেটেখুটে কিছুই করতে হয় না। ফলে তারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এসব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না। খায়দায়, দিনরাত ফুর্তি করে। তবে মোটরগাড়ি বা এরোপ্লেনের মতো সেকেলে যানবাহন তাদের আছে। রাস্তাঘাট,

বাড়িঘর, বিজলি বাতি আছে। তার চেয়ে বেশিদূর আর এগোয়নি। এগোতে বিশেষ আগ্রহও নেই। বজ্রবাহু প্রায় এক হাজার বছর ধরে এইসব গ্রহ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বুদ্ধিমান জীবকে উন্নত প্রযুক্তিতে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তারা একটু শেখে, তারপর আর গা করে না। এমনকী যে-বিজ্ঞানের বলে পৃথিবীর মানুষ অমরত্ব অর্জন করেছে তাও তারা একরকম প্রত্যাখ্যানই করেছে। তাদের ভাবখানা হল, প্রকৃতির নিয়মে যা হওয়ার হবে, আমাদের বেশি আকাঙ্খা নেই। ফলে তারা কেউই বজ্রবাহুর সঙ্গে পৃথিবীতে আসতে চায়নি। এই একটা ব্যর্থতা ছাড়া বজ্রবাহুর সফর খুবই সফল। তিনি নানা অদ্ভুত উদ্ভিদ ও মাটি, ধাতু ও শিলাখণ্ড এনেছেন। এনেছেন ওইসব গ্রহের নানা শিল্পের নমুনা। আরও অনেক কিছু।

পৃথিবীর মহাজাগতিক অবতরণ-কেন্দ্রে তাঁদের খুব জাঁকালো রকমের স্বাগত জানানো হয়েছে। বিশ্বরাষ্ট্রপতি স্বয়ং এসে তাঁদের অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানিয়েছেন। বজ্রবাহু ও তাঁর দলের পাঁচ-শো জন সদস্য পৃথিবীতে নেমে দেখলেন সবই সেই আড়াই হাজার বছর আগেকার মতোই আছে। তেমন সাংঘাতিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিছু নতুন বাড়িঘর, রাস্তাঘাট হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর বিজ্ঞান এমন চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছে যে, নতুন কিছু আবিষ্কারও আর তেমন ঘটে না। মানুষ অমরত্ব অর্জন করায় আর নতুন মানুষ জন্মায় না। তবে কিছু মানুষ যখন অন্য গ্রহে স্থায়ীভাবে বাস করতে চলে যায় তখন কিছু মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয়।

অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে বজ্রবাহুর বাবা, মা, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরাও ছিল। সকলেই একই রকম আছে। কারও বয়সই তিন-চার হাজারের কম নয়। শুধু ছোটোরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, এ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন নেই। বজ্রবাহুকে দেখে তাঁরা সকলেই যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করলেন। বাড়িতে ফিরে বজ্রবাহু বহুদিন পরে পোস্তচচ্চড়ি আর চালতার অম্বল দিয়ে ভাত খেলেন। যেসব গ্রহে গিয়েছিলেন সেখানকার খাদ্যদ্রব্য অন্যরকম। পুরোনো অভ্যস্ত খাবার খেয়ে বহুকাল পর ভারি খুশি হলেন বজ্রবাহু। সকলের সঙ্গে বসে গল্প-টল্প করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বিভিন্ন মিটিং ও সংবর্ধনা সভায় যেতে হল।

এরকমই একটা মিটিঙে তাঁর সফরসঙ্গীদের অন্যতম পুণ্ডরীক বজ্রবাহুকে কানে কানে বলল, 'ওহে বজ্রবাহু, মানুষের হাসিখুশির ভাবটা বেশ খানিকটা কমে গেছে, লক্ষ করেছ?'

বজ্রবাহুর হঠাৎ মনে হল, পুণ্ডরীক মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যিই, ওপর ওপর সবাই একটা খুশিয়াল ভাব দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন। নিজের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ের মধ্যেও যেন এটাই আজ লক্ষ করেছেন তিনি, কিন্তু ধরতে পারেননি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলো তো পুণ্ডরীক! আড়াই হাজার বছরে এমন কী হল?'

পুণ্ডরীক মাথা চুলকে বলে, 'কিছুই তো হওয়ার কথা নয়। পৃথিবীর কোনো পরিবর্তন দেখছি না। বিবর্তনও বহুকাল হল থেমে গেছে। মানুষের কোনো দুঃখ বা অভাব নেই। সুতরাং কী ঘটতে পারে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তবে একটা জিনিস লক্ষ করছি, পৃথিবীতে আগের তুলনায় গাছপালা কিছু বেড়ে গেছে।'

বজ্রবাহু ভ্রূ কুঁচকে বলেন, 'গাছপালা বেড়ে গেছে? কিন্তু সেরকম তো কথা নয়! আবহমণ্ডলের জন্যে যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই গাছপালা পৃথিবীতে থাকার কথা।'

পুণ্ডরীক মাথা সামান্য নেড়ে বলে, 'উদ্ভিদ-উপদেষ্টার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি এ-ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে চাইছেন না। শুধু বললেন, গাছ বাড়লে শেষ অবধি মানুষের উপকারই হবে। কথাটা হেঁয়ালির মতো ঠেকল। কিন্তু উনি আর ভাঙলেন না।'

বজ্রবাহু নিজে আবহাওয়া ও উদ্ভিদের একজন বিশেষজ্ঞ। কথাটা তাঁরও হেঁয়ালির মতো ঠেকল। মানুষজন, জন্তুজানোয়ার এবং আবহাওয়ার একটা অনুপাত হিসেব করেই গাছপালার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গাছ বাড়লে মানুষের কী উপকার হবে তা বজ্রবাহুর মাথায় এল না।

পৃথিবীতে আড়াই হাজার বছরের মেলা বকেয়া কাজ জমে আছে। ফলে বজ্রবাহু ও তাঁর দলবল এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তাঁরা বকেয়া কাজ সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তবে আজকাল কাজকর্ম বেশিরভাগই যন্ত্রের মাধ্যমে সমাধা হয়ে যায় বলে তেমন গা ঘামাতে হয় না। বজ্রবাহুদের খাটতে হচ্ছিল অন্যান্য গ্রহ থেকে আনা তথ্যাবলি রেকর্ড করে রাখতে এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে।

বজ্রবাহুর বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাড়ির সবাই তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছেন। বজ্রবাহু সকলের মুখই খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। বাস্তবিকই, কারও মুখেই খুব একটা স্বঃতস্ফূর্ত আনন্দের ভাব নেই। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবী থেকে রোগভোগ, মৃত্যু বিদায় নিয়েছে। অভাব, কষ্ট নেই, পরিশ্রম নেই। তাহলে চাপা বিষণ্ণতা দেখা যাচ্ছে কেন?

খাওয়ার টেবিলে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মস্ত টেবিল ঘিরে সবাই খেতে বসেছেন। বজ্রবাহুর দু-ধারে তাঁর স্ত্রী এবং বোন। হঠাৎ পিঠে একটু সুড়সুড়ি লাগায় বজ্রবাহু চমকে উঠে পিছনে হাত বাড়িয়ে খপ করে একটা সাপকে ধরে ফেললেন। তারপর সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাপ! সাপ! বাবা রে!'

তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত গলায় বললেন, 'সাপ নয়। ছেড়ে দাও।'

'সাপ নয় মানে!' বলে লাফিয়ে উঠলেন বজ্রবাহু। টেবিলে সবাই নিঃশব্দে নতমুখে বসে আছেন। বজ্রবাহু সবিস্ময়ে দেখলেন, তিনি যা ধরেছেন তা সত্যিই সাপ নয়।

'কী এটা!' বলে ফের বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন বজ্রবাহু।

তাঁর নতমুখী স্ত্রী বললেন, 'ছেড়ে দাও। ওটা আমার লেজ।'

'লেজ!' বলে হাঁ করে রইলেন বজ্রবাহু। তাঁর শিথিল হাত থেকে সর্পিল জিনিসটা খসে পড়ল।

বজ্রবাহুর বাবা মৈনাক গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'তুমি পৃথিবীতে ছিলে না, এর মধ্যেই এই একটা অঘটন ঘটতে শুরু করেছে। দু-হাজার বছর আগে হঠাৎ ক্রমে ক্রমে মানুষের লেজ হতে শুরু করেছে। প্রথমে একটা গ্যাঁজের মতো বেরোয়। তারপর ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। লেজ খসানোর অনেক প্রক্রিয়া করেও লাভ হয়নি। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই এক হাত, দেড় হাত দু-হাত লম্বা লেজ হয়েছে। কাপড়চোপড়ে ঢাকা থাকে বটে, কিন্তু সত্যটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।'

বজ্রবাহু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'লেজ! লেজ হচ্ছে কেন? একটা কারণ তো থাকবে!'

মৈনাক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'লেজ গজানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবও একটু একটু পালটাচ্ছে। ঘরে থাকার চেয়ে আজকাল কেন যেন আমাদের গাছের ডালে উঠে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। তুমি জান না, আমরা সবাই এখন খুব ভালো গাছ বাইতে পারি, এ-ডাল থেকে ও-ডাল লাফিয়ে লাফিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াই। আমাদের স্বভাবে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে।'

বজ্রবাহু খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'কই, আমার তো হয়নি!'

মৈনাক বললেন, 'তুমি এই বিবর্তনের সময়টায় পৃথিবীতে ছিলে না, তাই বেঁচে গেছ।'

বজ্রবাহু খাওয়া ফেলে উঠে রাষ্ট্রপতিকে ফোন করলেন, 'আপনার কি লেজ আছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি?'

'আছে বজ্রবাহু।'

উপরাষ্ট্রপতি বললেন, 'আছে হে, আছে।'

অন্তত পঞ্চাশ জনকে ফোন করে নিঃসংশয় হলেন বজ্রবাহু। মাথা গরম হয়ে গেল। ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন, 'এর মানে কী? কারণই-বা কী?'

মৈনাক ছেলের অস্থিরতা দেখে তাঁর কাছে এসে নরম গলায় সান্ত্বনা দিলেন, 'অত অস্থির হোয়ো না। মানুষের কোনো কাজ নেই, সব কাজ যন্ত্র করে দিচ্ছে। মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করছে না, যন্ত্রই তার হয়ে ভাবছে। মানুষের মৃত্যুও নেই, হাজার হাজার বছর সে খামোখা বেঁচে থাকছে। তাই বিবর্তন থেমে গেছে। কিন্তু প্রকৃতি তো থেমে নেই। সে তাই

মানুষের বিবর্তনের প্রগতি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকে উলটো বিবর্তনের পাল্লায় ফেলে দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে।'

বজ্রবাহু রেগে যেতে গিয়েও রাগলেন না। রেগে লাভ নেই। কারণ, কথাটা মিথ্যে নয়।

এতক্ষণ যেটা লক্ষ করেননি, তা পরদিন সকালেই লক্ষ করলেন বজ্রবাহু। গাছে গাছে প্রচুর মানুষ দোল খাচ্ছে, লাফালাফি করছে, আনন্দে চ্যাঁচাচ্ছেও কেউ কেউ। লক্ষ করলেন, অনেকেই আবার নিজেদের লেজ নির্লজ্জভাবেই প্রদর্শনও করছে। এও লক্ষ করলেন, মানুষের গায়ে বেশ ঘন ও বড়ো বড়ো লোম গজাচ্ছে আজকাল।

উত্তেজিত বজ্রবাহু গিয়ে পুণ্ডরীককে ধরলেন, 'এসব কী হচ্ছে, বলবে?'

পুণ্ডরীক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আবার গোড়া থেকে আমাদের সব শুরু করতে হবে মনে হচ্ছে। মানুষ বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেলে ফের উলটো পথে বিবর্তন যদি আবর্তিত হয় তাহলে দূর ভবিষ্যতে আবার মানুষ দেখা দেবে পৃথিবীতে। আপাতত আমাদের কিছু করার নেই বজ্রবাহু।'

'আর আমাদের কী হবে?'

'আমরা অন্য গ্রহে পালিয়ে যেতে পারি বটে, কিন্তু তাতে লাভ কী? আমাদের আপনজনেরা তো বানর হয়ে যাবেই।'

'তা হলে?'

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুণ্ডরীক বলল, 'আমরা অপেক্ষা করব। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদেরও . . .'

বাস্তবিক, মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যেই বজ্রবাহু, মৈনাক এবং তাঁদের দলবলের লেজ গজাতে লাগল। আর অন্যদিকে, পৃথিবীতে গাছে গাছে বানরের ভিড়। হুপহাপ, দুপদাপ শব্দ। গাছপালায় সভ্যতা ঢেকে যেতে লাগল।

চোরে-ডাকাতে

সে-আমলে আমাদের পরগনায় বিখ্যাত চোর ছিল সিধু। তার হাত খুব সাফ ছিল, মাথা ছিল ঠান্ডা, আর তুখোড় বুদ্ধি। দিনের বেলা সিধু গৃহস্থের মতো চালচলন বজায় রাখত, আমাদের বাড়িতেও বেড়াতে-টেড়াতে আসত সে। আর পাঁচজনের মতোই ঠাকুমা তাকেও ফল-টল খাওয়াতেন, মুড়ি মেখে দিতেন। কেবল সে চলে যাওয়ার পর ঠাকুমা গেলাশ-বাটি গুনে দেখতেন সব ঠিকঠাক আছে কি না। সিধু সব বাড়িতে যেত খবর করতে, কার বাড়িতে নতুন লোক এল, কী নতুন কাপড়চোপড় এল দোল-দুর্গোৎসবে, কোন বাড়িতে টাকাপয়সার আমদানি হচ্ছে ইত্যাদি। খবর বুঝে রাতবিরেতে হানা দিত সেই বাড়িতে। এমন সব মন্ত্র জানা ছিল তার যে, সেই মন্ত্রের জোরে বাড়ির সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোত, সিধু হাসতে হাসতে চুরি করে নিয়ে যেত সব। এমনকী যাওয়ার আগে গেরস্তের ঘরে বসে দু-দণ্ড জিরিয়ে তামাক-টামাক খেয়ে যেত।

আমরা ছেলেবেলায় যখন দেখেছি তখন সে বেশ বুড়ো। পরনে ফরাসডাঙার ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, পায়ে নিউকাট, মুখে পান, আর গলায় গান। বুড়ো বয়সেও বেশ শৌখিন ছিল সে। চার আঙুলে চারটে করে আংটি পরত, বাজার করতে গিয়ে দরাদরি করত না। চুরি করে প্রচুর পয়সা করেছিল সে। বাড়িতে দশ-বারোটা গোরু, সাত-আটজন ঝি-চাকর, জুড়িগাড়ি সবই ছিল তার। বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছিল খানিকটা। তখন তার চোখে ছানি আসছে; বাত ব্যাধিতেও কষ্ট পায়। খুব দরকার না পড়লে চুরি করতে যেত না। এদিকে তার ছোটো মেয়ে বিবাহযোগ্য হয়েছে। একটা ভালো সম্বন্ধও পেয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে, তার খরচ কম নয়। তার বউ তখন তাকে প্রায়ই খোঁচাত, মেয়ের বিয়ে আষাঢ়ে, তোমার তো গরজই নেই দেখছি, অত বড়ো ব্যাপার, তার খরচাপাতি আসবে কোত্থেকে?

রাতের দিকে একটু বেরোলে তো হয়। সিধু তখন তার কাঁকালের ব্যথার কথা বলত, চোখের ছানির কথা বলত, কিন্তু তার বউ সে সব শুনত না। শোনা যায়, বুড়ো বয়সে সিধুর কিছু ভূতের ভয়ও হয়েছিল। নিশুত রাতে বেরোতে সাহস পেত না।

আমাদের পরগনায় আর একজন বিখ্যাত লোক ছিল। তার নাম হালিম। লোকে বলত হালুম মিয়া। তা হালিম ছিল সাংঘাতিক ডাকাত। যেমন তার বিরাট চেহারা, তেমনি তার সাহস। যে বাড়িতে ডাকাতি করবে, সে বাড়িতে সাত দিন আগে গিয়ে তার সাগরেদ চিঠি দিয়ে আসত যে, অমুক দিনে হালিম সে বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে।

সে-আমলে পূর্ববঙ্গের গ্রামগঞ্জে দারোগা-পুলিশ খুব বেশি ছিল না। তা ছাড়া খাল-বিল-জঙ্গলের দেশ বলে অধিকাংশ জায়গাই ছিল দুর্গম। সে সব জায়গায় চোর-ডাকাতদের ভারি সুবিধে। হালিম বা হালুম মিয়াকে তাই কেউ কখনো জব্দ করতে পারেনি। সে ছিল দারুণ লাঠিয়াল, অসম্ভব সাহসী। দরকার না পড়লে খুন-টুন করত না। জমিদার বা ধনীরা সাধারণত হালিম মিয়া ডাকাতি করতে এলে খাতির-টাতির করত শোনা যায়, হালিম যে বাড়িতে ডাকাতি করতে যেত সে বাড়িতে আগে থেকেই বিয়ে বাড়ির মতো সাজানো হত, রোশনাই দেওয়া হত-ভালো খাবারদাবারের বন্দোবস্ত থাকত। হালিম উপস্থিত হলে বাড়ির মালিক হাত জোড় করে আসুন বসুন করত। হালিম বিনা বাধায় ডাকাতি করে চলে আসত, কিংবা ডাকাতি তাকে করতে হত না, বাড়ির লোকেরা তাকে সিন্দুকের চাবি-টাবি খুলে সব গুনেগেঁথে দিয়ে দিত।

কিন্তু সকলের তো দিন সমান যায় না। আমাদের ছেলেবয়সের সেই কিংবদন্তীর ডাকাত হালিমও বুড়ো হয়েছে। গোরস্থানের কাছে তার বেশ বড়ো বাড়ি। তারও দাসী-চাকর, ধানের মরাই, জোতজমি, গোরু সবই আছে। আমরা হালিমকে দেখতাম কানে আতরের তুলো গুঁজে চোখে সুর্মা দিয়ে, চমৎকার চেককাটা সিল্কের লুঙ্গি আর মখমলের পাঞ্জাবি পরে জমিদারের পুকুরে ছিপে মাছ ধরছে। খুব গম্ভীর ছিল সে, চোখ দু-খানা সবসময়ে লাল টকটকে। ডাকাতি করা তখন ছেড়েই দিয়েছে, তবে শিক্ষানবিশ ডাকাতরা তার কাছে তালিম নিতে আসত।

সিধুর কথা যা বলছিলাম। বউয়ের তাড়নায় অবশেষে একদিন রাতে চুরি করতে বেরোল। চোখের ছানির জন্যে রাস্তাঘাট ভালো করে ঠাহর হয় না, তাই সঙ্গে হ্যারিকেন নিল। একা যেতে ভূতের ভয়, তাই একজন চাকরকেও ডেকে নিল সঙ্গে। রাস্তায় সাপখোপের গায়ে পা পড়তে পারে ভেবে হাততালি দিয়ে হাঁটতে লাগল। আর ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্যে তারস্বরে 'রামনাম' করতে লাগল। সেই হাততালি রামনামের চোটে এত বিকট শব্দ হচ্ছিল যে রাস্তার দু-পাশের বাড়িঘরে লোকজনের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। তারা সব উঁকি মেরে দেখছে, ব্যাপারখানা কী?

অনেকেরই ধারণা হল, সিধু-চোর ধার্মিক হয়ে গেছে, তাই রাত থাকতে উঠে ঠাকুরের নাম নিতে নিতে প্রাঃতস্নান করতে যাচ্ছে নদীতে। এদিকে সিধুর হল বিপদ, যে বাড়িতেই ঢুকতে যায় সে-বাড়িতেই দেখে গৃহস্থ সজাগ রয়েছে। ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেল সে। কত ঘুমপাড়ানি মন্ত্রপাঠ করল, কিন্তু বুড়ো বয়সে মন্ত্রের জোরও কমে এসেছে, তেমন কাজ হয় না।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গোরস্থানের কাজ বরাবর এসে এক গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল সিধু। খুব ঠাহর করে সমুখপানে দেখে বলল, 'ওই মস্ত বাড়ি, ওটা কার রে?'

চাকর উত্তর দিল, 'ও হালুম মিয়ার বাড়ি।'

'বটে বটে।' বলে খুব খুশির ভাব দেখাল সিধু, 'তা হালিম দু-পয়সা করেছে বটে। এতকাল তো খেয়াল হয়নি।'

এই বলে সিধু সিঁদকাঠি বার করল।

পরদিন গঞ্জে হইচই পড়ে গেল। হালুম মিয়ার বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে। সকালে হালিমের বউ পা ছড়িয়ে পাড়া জানান দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'ওগো, আমার কী হল গো? আমার সব চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছে গো। বলি ও বুড়ো হালিম, তোর শরম নেই? যার দাপে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত, তার বাড়িতে চুরি? বলি ও মুখপোড়া হালিম বুড়ো সাত সকালে গাঁজা টানতে বসেছিস! কচু গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ফাঁসি যা, থুতু ফেলে তাতে ডুবে মর . . .'

দাওয়ায় বসে গাঁজা খেতে খেতে হালিম কেবল রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে তার বিবিকে ধমক দিয়ে বলে, 'চুপ র চুপ র, বাঁদি। যে ব্যাটা চুরি করেছে তার গর্দানের জিম্মা আমার দেখিস।'

তা শুনে বিবি আরও ডুকরে কেঁদে ওঠে।

হালিম দুটো কাজ করল। সিধুর নামে তিন ক্রোশ দূরের থানায় গিয়ে একটা নালিশ ঠুকে দিয়ে এল, আর সিধুর মেয়ের বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে একটা চিঠি পাঠাল তার কাছে, তোমার কন্যার বিবাহের রাত্রে আমি সদলবলে উপস্থিত হইতেছি। আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়ো . . . ইত্যাদি।

চিঠি পেয়ে সিধু বলল, 'ফুঃ।'

তারপর সেও তিন ক্রোশ দূরের থানায় দারোগাবাবুকে মুরগি আর মাছ ভেট দিয়ে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করে এসে দাওয়ায় বসে ফিক ফিক করে হাসতে আর তামাক খেতে লাগল।

সিধুর মেয়ের বিয়েতে আমাদেরও নেমন্তন্ন ছিল, ছোটো কাকা সমেত আমরা সব ঝেঁটিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, হালুম মিয়া ডাকাতি করতে আসবে শুনে যাদের নেমন্তন্ন হয়নি তারাও সব এসেছে গঞ্জ সাফ করে। বিয়ে বাড়ি গিসগিস করছে লোকে। দারোগাবাবুও এসে গেছেন। সিধু তাঁকে বিবাহ বাসরের মাঝখানে বরাসনে বসিয়ে দিয়েছে। আর বর তার পাশে একটা মোড়ায় বসে নিজের হাত-পাখার বাতাস খেতে খেতে ঘামছে।

তখনকার নেমন্তন্নে চার-পাঁচ রকমের ডাল খাওয়ানো হত, তারপর মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি বা পায়েস দেওয়া হত। আমরা সবে তিন নম্বর ডাল খেয়ে চার নম্বর ডালের জন্য তৈরি হচ্ছি এমন সময়ে উত্তরের মাঠ থেকে 'রে রে' চিৎকার উঠল আর মশাল দেখা গেল। পাত ছেড়ে আমরা সব ডাকাতি দেখতে দৌড়ে গেলাম।

কী করুণ দৃশ্য! ষাট-সত্তরজন সাকরেদ নিয়ে হালিম এসে গেছে। সকলের হাতেই বিশাল লাঠি, বল্লম, দা, টাঙ্গি। কপালে সিঁদুরের টিপ। খালি গা, মালকোঁচা করে ধুতি পরা। কিন্তু সব ক-জনই বুড়োসুড়ো মানুষ। এতদূর জোর পায়ে এসে আর হাল্লাচিল্লা করে সকলেরই দম ফুরিয়ে গেছে। হালিমের হাঁপের টান উঠেছে। তাই সিধু তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসাল। কয়েকজন ডাকাত উবু হয়ে বসে কাশতে কাশতে বুকের শ্লেষ্মা তুলছে! একজনকে দেখলাম, হাতের ভারী কুড়ুলটা আর বইতে না পেরে একজন

বরযাত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের ভেরেযাওয়া হাতটাকে ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।

সিধু অনেকক্ষণ হালিমের বুক মালিশ করে দেওয়ার পর হালিমের হাঁপের টানটা কমল। তখন হাতের খাঁড়াটা তুলে নিয়ে বলল, 'এবার কাজের কথা হোক।'

সিধু হাতজোড় করে বলল, 'তোমার মানমর্যাদা ভুলে যাইনি হে। এই নাও সিন্দুকের চাবি, দরজা-টরজা সব খোলা আছে। চলে যাও ভিতরে।'

তো তাই হল। হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হালিম, সঙ্গে সঙ্গে তার দলবলও হুংকার দিল। অবশ্য হুংকারের সঙ্গে সঙ্গেই খক খক করে কাশিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বেশ দাপটের সঙ্গেই হালিম ভিতরে ঢুকে সব লুটপাট করতে লাগল। নিজের বাড়ির যেসব জিনিস চুরি গিয়েছিল সে সবই উদ্ধার করল হালিম। সিধু আগাগোড়া সঙ্গে রইল হাতজোড় করে। হালিম কোনো জিনিস নিতে ভুল করলে সিধু আবার সেটা দেখিয়ে দেয়, 'ওই কাঁসার বাটিটা নিলে না! বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে নাকি, ওই দেয়াল ঘড়িটা যে তোমার, চিনতে পারছ না?'

এইভাবে ডাকাতি নির্বিঘ্নে এবং সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল। সারাক্ষণ দারোগাবাবু পা ছড়িয়ে বসে তামাক টানলেন। সবাই তাঁর হাফপ্যান্টের নীচে বিশাল মোটা পা, মোটা বেল্ট আর ক্রসবেল্টে বেঁধে রাখা প্রকাণ্ড ভুঁড়ি এবং চোমড়ানো গোঁফের খুব তারিফ করতে লাগল। তিনি কাউকে গ্রাহ্য করলেন না। বর বেচারা নিজেকে বাতাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বসে ঢুলছে। বরযাত্রী সমেত সবাই ডাকাতি দেখছে ঘুরে ঘুরে।

ব্যাপারটা শেষ হলে হালিম আর সিধু এসে দারোগাবাবুর সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। দারোগাবাবু হুংকার দিলেন, 'ঘটনাটা কী হল বুঝিয়ে বলো। এই বুড়ো বয়সে চুরি-ডাকাতি করতে যাস, একদিন মরবি।'

সিধু কাঁচুমাঁচু হয়ে বলে, 'বড়োবাবু, চুরি কি আর নিজের ইচ্ছায় করতে গেলাম! বউয়ের কাছে ইজ্জত থাকে না, সেই ঠেলে-ঠুলে পাঠায়।'

হালিম বলল, 'আমারও ওই কথা!'

দারোগাবাবু হাতের নল ফেলে খুব হাসলেন। তাঁর হাসিরও সবাই প্রশংসা করল।

তারপর বারান্দায় ঠাঁই করে হালিমের দলকে খেতে বসানো হল। হালিমের অবস্থা ভালো, কিন্তু তার সাকরেদরা সব হাঘরে। ডাল আর বেগুন ভাজা দিয়েই তারা পাত লোপাট করতে লাগল।

সেই দেখে আমাদেরও মনে পড়ল, আমাদের পাতে এবার চার নম্বর ডাল পড়বার কথা। আমরা সব দৌড়াদৌড়ি করে ফিরে এলাম খাওয়ার জায়গায়। এবং তারপরই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। অর্ধেক খেয়ে উঠে গেছি; ফিরে এসে হুটপাট করে বসে পড়বার কিছুক্ষণ পরেই সবাই টের পেতে লাগলাম পাতের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কে কার পাতে বসেছি তার ঠিক পাচ্ছি না। যেমন আমার ডান পাশে ছোটো কাকা বসে ছিল, বাঁয়ে সুবল। পাতে দেড়খানা বেগুন ভাজা ছিল, মুড়িঘণ্টের একটা কানকো। এখন দেখছি ছোটো কাকা উলটো দিকের সারিতে বসে আছে, বাঁ পাশে বিপিন পণ্ডিত, পাতে আধখানা মোটে বেগুন ভাজা, মুড়িঘণ্টের কানকোটা নেই, একটা পোটকা পড়ে আছে। সবাই চ্যাঁচামেচি করতে লাগল, 'এই তুই আমার পাতে বসেছিস চোর কোথাকার' ... 'ঃও মশাই, আপনি তো আমার বাঁ ধারে ছিলেন' . . . 'এ কী, আমার ভাজা কোথায় গেল . . .' ইত্যাদি। তবু খাওয়াটা সেদিন খুব জমেছিল।

মোল্লারহাটের নেমন্তন্ন

ট্রেন থেকে নেমে মাইল দুই হেঁটেছেন আশুবাবু। আশ্বিনের শেষ, রোদ তেমন তেজালো নয়, আর মাথায় ছাতা ছিল বলে গরমে তেমন হাপশে পড়েননি ঠিকই, কিন্তু বিষ্টুপুরের বটতলা অবধি এসে মনে হল, নাঃ, একটু না জিরোলেই নয়। আরও মাইল দুই পথ বাকি আছে বলে আন্দাজ। সেই বাকি রাস্তাটায় তেমন জনবসতি নেই বলেই যেন হরেকেষ্ট বলেছিল।

এই হল বিষ্টুপুরের বিখ্যাত বটতলা। বেশ জমাটি জায়গা। দোকানপাট আছে। লোকজনের যাতায়াত আছে। আশুবাবু টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে বটতলার বাঁধানো জায়গায় বসে হাঁফ ছাড়লেন। দিব্যি বাতাস লাগছে ফুরফুর করে। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। লোকজন বিষয়কর্মে ব্যস্ত। দুটো লজঝড়ে বাস ধুলো উড়িয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

এ হল চৌপথী। এখান থেকে কোনো একটা রাস্তা মোল্লারহাট হয়ে মুনসিগঞ্জ পর্যন্ত গেছে। আগে নাকি বাস চলত। তবে গত বর্ষায় রাস্তা ভেঙে পোল ভেসে গিয়ে গাড়িঘোড়া বন্ধ, এখন শ্রীচরণ ভরসা।

পাশে বসা একটা লোক ঝিমোচ্ছিল। আশুবাবু তাকেই বেশ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'অ মশাই, বলি শুনছেন!'

'বলে ফেলুন।'

'এখান থেকে মোল্লারহাট কোন রাস্তাটা গেছে বলুন তো।'

লোকটা চোখ চেয়ে আশুবাবুকে বড়ো বড়ো চোখে একবার ভালো করে দেখল। তারপর বলল, 'কেন, মোল্লারহাটে কী দরকার?'

'আমি সেখানে যাব যে!'

লোকটা নির্বিকারভাবে বলে, 'মোল্লারহাট কেউ যায় না মশাই!'

'সে কী? সেখানে যে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি।'

'অ। তা আত্মীয়টি কে?'

'আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগনে।'

'জানেন তো যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা।'

আশুবাবু লোকটার ওপর ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'বলতে না চাইলে বলবেন না। তা বলে ভাগনের নিন্দে করছেন কেন?'

লোকটা একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে বলে, 'মোল্লারহাটে কারও ভাগনে থাকে বলে কখনো শুনিনি মশাই।'

'কেন, মোল্লারহাটে ভাগনে থাকলে দোষটা কী?'

'গুণের কথাও নয় কিনা।'

'তার মানে?'

'যার ভাগনে মোল্লারহাট থাকে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

'কেন মশাই?'

'সত্যি কথা শুনতে চান?'

'কেন চাইব না?'

'শুনলে সহ্য করতে পারবেন তো?'

আশুবাবু ধুতির খুঁটে কপালের ঘাম মুছে দুর্বল গলায় বললেন, 'এমন কী কথা মশাই? আমার যে একটু ভয় ভয় করছে।'

'না শুনেই ভয় করছে? আসল কথা শুনলে তো দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবেন। এখন ভালো করে ভেবে বলুন আসল কথা শুনতে চান কি না। নইলে ধুলোপায়েই বিদেয় নিয়ে যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান।'

আশুবাবু খুব দমে গেলেন। তিনি অতিশয় ভীতু মানুষ। খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, 'অনেক দূর থেকে এসেছি, ধকল বড়ো কম হয়নি। এসপার-ওসপার যাই হোক বলে ফেলুন।'

'শুনবেন তাহলে?'

'শুনব।'

'না, আপনাকে দেখলে নিতান্তই গোবেচারা মনে হয় বটে, কিন্তু আপনার বুকের পাটা আছে।'

আশুবাবু একথায় ভারি খুশি হয়ে একটু হাসলেন। বললেন, 'এই তো গত চোত মাসে হরিহরপুরের গাজনের মেলায় আমি একজন মুরগিচোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলাম।'

লোকটা অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বলল, 'ও বাবা, মুরগিচোর ধরা তো চাট্টিখানি কথা নয় মশাই; যে মুরগিচোর ধরতে পারে সে তো বাঘ-সিংহীও মারতে পারে। তা একাই ধরলেন নাকি?'

আশুবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'একরকম একাই বলতে পারেন। তবে আরও পাঁচজন একটু হাত লাগিয়েছিল আর কি।'

'তাতে আপনার গৌরব কিছুমাত্র কমেনি। শাস্ত্রেই তো বলেছে, দশে মিলি করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ। তা আপনিই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বুঝি মুরগিচোরটার ওপর।'

আশুবাবু ভারি বিনয়ের সঙ্গে মাথা চুলকে বললেন, 'একরকম তাই। তবে ঝাঁপ দিতে একটু দেরি করে ফেলায়, ওই পাঁচজনই আগে ঝাঁপ দিয়ে ফেলে।'

'তাতে কী? ওতেও প্রমাণ হয় যে আপনি একজন নির্ভীক মানুষ। অকুতোভয়। নাঃ, আপনাকে দেখে আমার ভারি শ্রদ্ধা হচ্ছে। দেশে আজকাল ডাকাবুকো লোকের বড়োই অভাব।'

আশুবাবু বললেন, 'তা ইয়ে, মোল্লারহাটের কথা কী যেন বলছিলেন, এদিকে আবার বেলাও হয়ে যাচ্ছে কিনা।'

'বলব মশাই বলব। দু-দণ্ড একটু বসুন। আপনার মতো প্রাঃতস্মরণীয় মানুষের সঙ্গ যতটা পারি করে নিই। এমন সুযোগ আর কি পাওয়া যাবে!'

একথা বলার পর লোকটার আবার একটু ঢুলুনির মতো এল। তারপর হাই তুলে বলল, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন!'

'আজ্ঞে, মোল্লারহাটের রাস্তাটা।'

'তাহলে মোল্লারহাটে আপনি যাবেনই? নাকি আরও একটু ভেবে দেখবেন।'

আশুবাবু দোনোমোনো করে বললেন, 'সেটা কি খুবই বিপদের জায়গা মশাই?'

লোকটা ফস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বিপদ বললে তো কিছুই বলা হল না, সে হল প্রাণঘাতী জায়গা। পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সেখানে গিয়ে কেউ প্রাণ নিয়ে

ফিরে এসেছে কি না।'

'ও বাবাঃ, তাহলে লোকে সেখানে বসবাস করে কী করে?'

'কে বলল বসবাস করে? খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন সেখানে যারা বসবাস করে তারা কেউ মানুষ নয়!'

'অ্যাঁ, বলেন কী?'

'তাদের অ্যাই বড়ো বড়ো নখ, অ্যাই বড়ো বড়ো দাঁত, ভাঁটার মতো চোখ। তারা মানুষের রক্ত শুষে খায়।'

আশুবাবু কাহিল গলায় বললেন, 'এরকম কথা তো কই হরেকেষ্ট আমাকে বলেনি!'

'হরেকেষ্ট কে?'

'আমার ভাগনে।'

'মোল্লারহাটের একটা গাছকেও বিশ্বাস করবেন না মশাই। পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সবাই জানে, মোল্লারহাটের গাছ, গোরু, ছাগল সবাই মিথ্যে কথা বলে।'

'অ্যাঁ!' বলে খুবই ভাবিত হয়ে পড়লেন আশুবাবু। তার যেন কেমন একটা শীত শীত করতে লাগল।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠ্যাঙাড়ে, ডাকাত, খুনে, গুন্ডা, বজ্জাত, ফেরেববাজ মোল্লারহাটে গিজগিজ করছে। দেখবেন সেখানে গাছে গাছে নরমুণ্ড ঝুলে আছে, পথে পথে পড়ে আছে করোটি আর হাড়গোড়। সেখানকার কামারশালায় দিনরাত তৈরি হচ্ছে, রাম দা, ছোরাছুরি, হেঁসো, মোল্লারহাটের মুদির দোকানে চাল-ডালের সঙ্গে বন্দুক, পিস্তল বিক্রি হয়। সেখানকার লোক বাইরের মানুষ দেখলেই পিছন থেকে মাথায় মুগুর বসিয়ে দেয়।'

আশুবাবুর গলা বসে গিয়েছিল। বারবার গলা খাঁকারি দিয়ে তবে স্বর বেরোল। খুবই ক্ষীণ স্বর। বললেন, 'অথচ সেখানে আজ আমার এক ভাগনির বিয়ে। হরেকেষ্ট নেমন্তন্ন করে গেছে। এখন করি কী বলুন তো। যাওয়ার জন্য বহু ঝোলাঝুলি করে গেছে যে?'

লোকটা উদাস গলায় বলল, 'তা যাবেন যান। কিন্তু বিয়েবাড়ি পৌঁছোতে পারবেন কি না দেখুন!'

শীত শীত ভাবটা উবে গিয়ে আশুবাবুর এখন ঘাম হতে লেগেছে। কপালটা ধুতির খুঁটে মুছে নিয়ে বললেন, 'আপনি দেখছি মোল্লারহাটের সব খবরই রাখেন।'

'তা আর রাখব না! ওই মোল্লারহাটেই তো আমার বউ আর ছেলে-মেয়ে কয়েদ হয়ে আছে কিনা।'

'কয়েদ? কে কয়েদ করে রেখেছে তাদের?'

'ছয় ফুট লম্বা, দৈত্যের মতো চেহারার একটা লোক। তার আশি ইঞ্চি বুকের ছাতি, মুগুরের মতো হাত, কথা কইলে মনে হয় বাজ ডাকছে।'

'এ তো ভারি অন্যায় কথা! তা থানা-পুলিশ করলেন না কেন?'

ফের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটা বলল, 'তার উপায় নেই যে!'

'কেন উপায় নেই কেন?'

'লোকটা যে আমার শ্বশুর।'

'শ্বশুর! বলেন কী? মোল্লারহাটে আপনার শ্বশুরবাড়ি নাকি?'

'তবে আর বলছি কী? বারো বছর ধরে ঘরজামাই আছি মশাই, কোনোদিন জামাই আদর পেয়েছি বলে কেউ বলতে পারবে না। উপরন্তু শ্বশুরমশাইয়ের ফাইফরমাশ খাটা, খেতের কাজকর্ম দেখা, মুনিষ খাটানো, হিসেবপত্তর রাখা, মামলা-মোকদ্দমার তদবির করা, কী করতে হয় না বলুন তো! তাও কি শ্বশুরের মন ওঠে? দোষের মধ্যে একদিন একটু পয়সায় টান পড়েছিল বলে শাশুড়ির রুপোর পানের ডিবেটা বিষ্টুপুরের চরণ দাসের দোকানে বেচে দিয়েছিলাম বলে শ্বশুরমশাই জুতোপেটা করে তাড়ালেন। গতকাল থেকে এই বটতলায় বসে আছি মশাই, দানাপানিটুকু পর্যন্ত জোটেনি। কেউ খোঁজটুকু অবধি করেনি এখন অবধি।'

আশুবাবু একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'অ তাই বলুন। সেই জন্যই এতক্ষণ মোল্লারহাটের নিন্দেমন্দ করছিলেন?'

লোকটা একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'তা ইয়ে হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'ফস করে একটা কথা মনে পড়ে গেল।'

'আবার কী কথা?'

'মনে পড়ে গেল যে, হরেকেষ্ট হল আমার শালা। আর আজ আমার শালি আন্নাকালীর বিয়ে।'

'অ্যাঁ। তাহলে আপনি হরেকেষ্টর ভগ্নীপতি হন! কী আশ্চর্য!'

লোকটা বিরস মুখে বলল, 'হরেকেষ্টর ভগ্নীপতি হওয়া এমন কিছু গৌরবের ব্যাপার নয় যে, অবাক হতে হবে। তা বলছিলাম কী, মোল্লারহাটের রাস্তা আপনাকে এক শর্তে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'শর্তটা কী?'

'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে আমার শ্বশুরমশাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করে যদি . . .'

আশুবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি! এ আর শক্ত কাজ কী? চলুন মশাই, চলুন। হরেকেষ্টর বাবা সুধাংশুবাবু আমার ভগ্নীপতি। অতি সজ্জন মানুষ। আমার সঙ্গে তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল একসময়। অনেকদিন যোগাযোগ নেই, এই যা। কিন্তু তাঁর কোনো ঘরজামাই আছে বলে তো শুনিনি।'

'সব কি আর আপনাকে জানিয়েছে?'

'তা আপনি ঘরজামাই হয়ে আছেন কেন? নিজে কিছু করেন না?'

বিরস মুখে লোকটা বলে, 'করি না কে বলল?'

'কী করেন?'

'সাতপুরার নাম শুনেছেন? আমি সেখানকার দারোগা।'

'অ্যাঁ! তবে যে বললেন ঘরজামাই।'

'তাও একরকম বলতে পারেন। ঘন ঘন যাতায়াত তো করতে হয়। শ্বশুরবাড়িতে বেশি যাতায়াত করা মানে একরকম ঘরজামাইয়ের মতোই ব্যাপার।'

'আর পানের বাটা চুরি! সেটা কে করল?'

লোকটা ফের একটা হাই তুলে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'সেই সকাল থেকে বিষ্টুপুরের বটতলায় আপনার জন্যে বসে আছি মশাই। শ্বশুরমশাই বললেন, বাবা, তোমার হল দারোগার চোখ, আশুকে দেখলেই তুমি চিনতে পারবে। তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসো তো। তাই বসে থেকে থেকে ঝিমুনি এসে গেল। তখনই গল্পটা ফেঁদে ফেললাম আর কি! ভালো হয়নি গল্পটা?'

'খুব ভালো, খুব ভালো।'

বিপিনবাবুর কাণ্ড

নন্দবাবু বাজারে চলেছেন। বাঁ-হাতে ছাতা, ডান হাতে বাজারের থলি, পকেটে টাকা আর ব্রহ্মতালুতে রাগ। তা রাগ হওয়ারই কথা। গতকাল বিকেল থেকে তার প্রিয় দুধেল ছাগল রাইকিশোরীর খোঁজ নেই। ছোটো ছেলে মদন গতকাল সিংহিদের ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে ঠ্যাং ভেঙেছে। গিন্নির সোনার বালা চুরি হওয়ায় গিন্নি আজ সন্দেহবশে পুরোনো ঝি হিরামোতিকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, পরে যদিও বালাটা বালিশের নীচে পাওয়া যায়। তাঁর বড়ো শালা ভুল করে তার পুরোনো চটি ছেড়ে রেখে নন্দবাবুর নতুন চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে চলে গেছে। বাইরের ঘরের ঘড়িটা দশ মিনিট লেট চলছে বলে আজও তাঁর বাজারে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে। আরও আছে। কিন্তু অত সব বলতে গেলে মহাভারত। রাগের চোটে নন্দবাবু একটু জোরেই হাঁটছেন।

হঠাৎ সামনে পথ আটকে একজন বিগলিত মুখের লোক দাঁত বের করে বলল, 'নন্দবাবু না? কী সৌভাগ্য!'

লোকটা বেজায় বেঁটে, একটু রোগা, কালো এবং মুখে ধূর্তামির ছাপ আছে। নন্দবাবু লোকটাকে কস্মিনকালেও দেখেননি।

নন্দবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি কে? কী চাই?'

'আজ্ঞে আমি হরিপদ, হরিপদ পাল।'

'ও, তা হরিপদবাবু, আমার খেজুরে আলাপ করার সময় নেই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যা বলার চটপট বলুন।'

'ছি ছি, দেরি করিয়ে দিলাম নাকি? তা চলুন, বাজারের দিকে যেতে যেতেই দুটো কথা বলি।'

'কী কথা?'

'বলছিলাম কী বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'বিপিনবাবু কে?'

'আহা, বিপিনবাবু হলেন যোগেনবাবুর শালা।'

'যোগেনবাবু কে?'

'চিনলেন না! যোগেনবাবু হলেন নরেনবাবুর ভাইপো।'

'নরেনবাবু কে?'

'কী মুশকিল! নরেনবাবু যে সুধাংশুবাবুর নাতজামাই।'

'সুধাংশুবাবু কে?'

'ওই তো বললাম, উনি হলেন নরেনবাবুর দাদাশ্বশুর। আর নরেনবাবু হলেন যোগেনবাবুর জ্যাঠা। আর যোগেনবাবু হলেন বিপিনবাবুর ভগ্নীপতি। এবার বুঝলেন?'

'জলের মতো পরিষ্কার। এদের কাউকেই আমি চিনি না।'

'আহা চেনার দরকারটাই বা কী? কথাটা হল বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'ঃউ, সে সাংঘাতিক কাণ্ড। কাউকে না বলে-কয়ে বিপিনবাবু যে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গেছেন!'

'তাই নাকি? তাহলে তো চিন্তার কথা। কিন্তু আমার যে বিপিনবাবুকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।'

'মাথা ঘামাবেনই-বা কেন? শুধু বলছি ভদ্রলোকের কাণ্ডটা দেখলেন? বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ি থেকে জলজ্যান্ত মানুষটা গায়েব!'

'তাহলে পুলিশে খবর দিন।'

'আহা, পুলিশ তো তাঁকে আগে থেকেই খুঁজছিল।'

'তাই নাকি?'

'তা খুঁজবে না? তিনি যে ঢিল ছুড়ে নিত্যানন্দবাবুর অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছেন।'

'ও, তা হলে তো ভীষণ ব্যাপার! কিন্তু এই নিত্যানন্দবাবুটি আবার কে?'

'তিনি হলেন নবকৃষ্ণ দারোগার পিসেমশাই। আর নবকৃষ্ণ দারোগা হল শ্যামাপদর খুড়তুতো ভাই। আর শ্যামাপদ হল তো চারুবাবুর ভাগনে। আর চারুবাবু হলেন . . .'

'থাক থাক, ওতেই হবে।'

'তাহলে থাক। কথাটা হচ্ছে বিপিনবাবুকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিপিনবাবুর কথাটাই বরং হোক।'

'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'হ্যাঁ, বললেন তো, উনি নিরুদ্দেশ।'

'নিরুদ্দেশ বলতে নিরুদ্দেশ! একেবারে গায়েব। কোথাও তাঁর টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। দিগন্তের চিলের মতো উড়তে উড়তে বিলীন হয়ে গেছেন।'

'বাঃ, এ তো কাব্য হয়ে গেল দেখছি।'

লোকটা খুব লজ্জা-টজ্জা পেয়ে হাতটাও কচলে বলল, 'একটু-আধটু আসে আর কি। কবি তমাল রায়ের কাছে তালিম নিয়েছিলাম কিছুদিন।'

'বাঃ বাঃ। কবি তমাল রায়ের নামটা অবশ্য শুনিনি।'

'তিনি হলেন কবি সব্যসাচী কাব্যবিশারদের সাক্ষাৎ ভাইঝি জামাই। সব্যসাচী কাব্যবিশারদ হলেন গিয়ে নটবর বিদ্যাবিনোদের ভায়রাভাই। আর নটবর বিদ্যাবিনোদ হলেন গিয়ে . . .'

'থাক, থাক, কথাটা হচ্ছিল বিপিনবাবুকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ, কথাটা বিপিনবাবুকে নিয়েই।'

'সেটাই হোক।'

'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'হ্যাঁ, উনি দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছেন।'

'বিলীন বলতে বিলীন! একেবারে কর্পূরের মতো উবে গেছেন। অথচ বাড়িতে ছেলে কাঁদছে, বউ কাঁদছে, মা কাঁদছে, পাওনাদাররা কাঁদছে।'

'তাহলে তো খুবই খারাপ ব্যাপার।'

'খারাপ বলতে খারাপ! শিবু গয়লার দুধ বাবদ একশো বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাওনা, পঞ্চানন মুদির পাওনা দু-শো একান্ন টাকা পঁচিশ পয়সা, রহমত দর্জি পাবে একান্ন টাকা পঁচাত্তর পয়সা, পাড়ার মুচি পায় তেরো টাকা কুড়ি পয়সা, খবরের কাগজওয়ালার কাছে বাকি পড়ে আছে একাশি টাকা একান্ন পয়সা, বাড়িওয়ালার দু-মাসের ভাড়া তিনশো

চল্লিশ টাকা, বনবিহারীর কাছে মাসকাবারে ধার নিয়েছিলেন আড়াইশো টাকা, গজপতির কাছে দেড়শো, সরখেল বাবুর কাছে ত্রিশ টাকা . . .'

'বিপিনবাবু বেশ ধারালো লোক ছিলেন দেখছি।'

'শুধু কি এই? ফুচকাওয়ালা, বাদামওয়ালা, অফিসের পিয়োন-তাদের হিসেব তো এখনও ধরিনি।'

'তাহলে আর ধরবেন না।'

'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'একটু একটু দেখতে পাচ্ছি।'

'সংসারটা ভেসে যাচ্ছে একেবারে। চাল নেই, ডাল নেই, নুন নেই, তেল নেই।'

'সত্যিই খুব দুঃখের কথা, কিন্তু বিপিনবাবু গেলেন কোথায়? ভালো করে খুঁজে দেখেছেন?'

'গোরু খোঁজা মশাই, গোরু খোঁজা। এই তো সামতাবেড়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ি, পিসির বাড়ি গাইঘাটা, ভাই থাকে কার্মাটারে, দাদা বিষ্ণুপুর, বড়ো শালা নবদ্বীপ, ছোটো শালা দুর্গাচক, বড়ো শালি গয়েশপুর, মেজোজন হিঙ্গলগঞ্জ, ছোটো শিমুলতলা, বড়ো কাকা রানাঘাট, ছোটো কাকা পাঁশকুড়া, খুড়তুতো ভাই একজন কিশোরপুর, অন্য জন কেওনঝড়, বড়ো মামা জলপাইগুড়ি . . .'

'থাক থাক। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তো!'

'এক্কেবারে না। রবি ঠাকুরের ভাষায় উনি একদম ভোঁ হয়ে গেছেন, না হয়ে গেছেন।'

'আহা খুব দুঃখের কথা।'

'খুব, চোখের জল রাখা যায় না মশাই। তাই আমরা সবাই মিলে নিখিল ভারত বিপিন বাঁচাও কমিটি তৈরি করেছি। বিপিনবাবু ভোঁ ভোঁ হলেও সংসারটা তো আছে। সেটাকে তো আর ভেসে যেতে দেওয়া যায় না।'

'সে তো ঠিকই।'

'কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সতীশ ঘোষ। চিনলেন তো। এই যে সুরেনবাবুর বড়ো মেসো, সুরেনবাবু কে নিশ্চয়ই জানেন, হারান বোসের . . .'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কথাটা হচ্ছিল বিপিনবাবুকে নিয়ে।'

'তা তো বটেই। তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'দেখছি মশাই, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, সবাই দেখছে। তা সেই বিপিন বাঁচাও কমিটির সেক্রেটারি হলেন গিয়ে গিরিধারী হালদার, যার শালা মাধব রায় গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সাঁতার কেটে বিখ্যাত, সেই মাধব রায় যার তালুইমশাই হল গিয়ে গোবিন্দ বিশ্বাস . . .'

'থাক থাক, বিপিনবাবুর কথাটাই হোক।'

'তাই হোক। নিখিল ভারত বিপিন বাঁচাও কমিটির আজীবন সদস্যপদ চাঁদা মাত্র দু-হাজার টাকা, দশ বছরের হল দেড় হাজার, পাঁচ বছর হলে হাজার, এক বছরের জন্য মাত্র দু-শো, ছ-মাসের সদস্যপদ . . .'

'থাক, থাক। তা আমাকে কত দিতে হবে?'

লোকটা জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, আপনার কাছে সেই উদ্দেশ্যে আসা নয়। তবে কিনা সবাই শুনে দুঃখ পায়। দুঃখ পেলে লোকে ভাবতে বসে। ভাবতে বসলে লোকের চোখে জল আসে। চোখে জল এলে লোকের মন গলতে থাকে। আর মন গলতে শুরু করলে হাত গিয়ে পকেটে ঢোকে . . .'

'থাক, থাক। কত?'

'কী যে বলেন? তা গোটা পাঁচেক যদি হয়, কোনো চাপাচাপি নেই কিন্তু।'

নন্দবাবু টাকাটা দিয়ে বললেন, 'চাপাচাপি নেই বলছেন? ওরে বাবা!'

লোকটা একটু লাজুক হেসে বলল, 'লোকে অবশ্য বিপিন বাঁচাও কমিটিকে খুবই গালমন্দ করছে, মামলামোকদ্দমা করবে বলে শাসাচ্ছে, ঝগড়াঝাঁটিও লেগে যাচ্ছে। তাই বলছিলাম বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

সংবর্ধনা

'এই যে বিশুবাবু, নমস্কার। শুনলাম আপনার মামাশ্বশুর নাকি লটারি পেয়েছেন?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'তা কত টাকা পেলেন তিনি?'

'ভালোই পেয়ে থাকবেন। পাঁচ-দশ লাখ পেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'তাহলে বিশুবাবু এ তো বেশ গৌরবের কথাই, কী বলেন? লটারি ক-জন পায় বলুন। লটারি পাওয়া মানে তো দশজনের একজন হয়ে ওঠা। এই গৌরবজনক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে কি আপনার কিছু করা উচিত নয়? মামাশ্বশুর তো আর পর নয়। আমাদের সকলেরই তো মামাশ্বশুর আছে, কেউ তো এমন বিরল কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। আমার মামাশ্বশুর তো হাড়হাভাতে। আপনার কি মনে হয় না যে লটারি জেতার জন্য ওঁকে প্রথমে একটা গণ ও পরে একটা নাগরিক ও তারও পরে একটা পুর সংবর্ধনা দেওয়া উচিত!'

'তা তো বটেই।'

'এ-বিষয়ে একটা কমিটিও কি অবিলম্বে গঠন করা উচিত নয়? লটারিতে জয় তো চাট্টিখানি কথা নয়। লাখ লাখ লোক প্রতিদিন লটারি খেলছে, কিন্তু প্রাইজ পায় ক-জন বলুন!'

'অতি ঠিক কথা।'

'এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় ত্রিশ বছরের। ত্রিশ বছরে মোট সাতশো একত্রিশজনকে নানারকম কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করেছি। ব্যায়ামবীর বলরাম শীল, নৃত্যশিল্পী কল্লোলিনী কয়াল, জাদুকর পি পাল, সাঁতারু বিপ্লব

বসুর মতো বিখ্যাত লোকরা তো আছেই। তা ছাড়া ধরুন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্বের জন্য আমরা পাঁচু চোর, পরেশ পকেটমার, গুল মারার জন্য গয়েশ গায়েন- এদেরও বাদ দিইনি। সংবর্ধনায় আমার খুব হাতযশ।'

'শুনে বড্ড খুশি হলাম। আপনি করিতকর্মা লোক।'

'আজ্ঞে সবাই তাই বলে, তবে এটাকে আমি দেশ বা দশের সেবা বলেই মনে করি। অনেকেই বলে বটে, নিতাইবাবুর মতো এরকম আত্মত্যাগ, এরকম কর্মোদ্যোগী, এত বড়ো সংগঠক বড়ো একটা দেখা যায় না, কিন্তু আমি ভাবি, এটা তো আমার পবিত্র কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কী বলেন?'

'না না, তা বললে হবে কেন? আপনি বিনয়ী মানুষ বলেই কৃতিত্ব স্বীকার করতে চাইছেন না। কিন্তু আত্মত্যাগ ক-টা লোক আর করছে বলুন।'

'সে অবশ্য ঠিক কথা। সেদিন নবীনবাবু তো বলেই ফেললেন, নিতাইবাবু, আপনি দেশের যুবসমাজের কাছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ।'

'নবীনবাবু ঠিকই বলেছেন।'

'আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে এভাবে জনগণের সেবা যেন আজীবন করে যেতে পারি।'

'সে তো বটেই। সেবাটা চালিয়ে যাওয়াই উচিত।'

'তবে কিনা সেবা করতে করতেই জীবনটা কেটে যাচ্ছে, নিজের দিকে আর তাকাতে পারলাম কই বলুন।'

'দেশসেবকরা, জনগণের সেবার্তরা নিজের দিকে তো তাকায় না। তাকাতে নেইও।'

'এই আপনার মামাশ্বশুরের কথাই ধরুন, আমরা পাঁচজন তাঁর কৃতিত্বের কথা সর্বসমক্ষে তুলে না ধরলে একটা জাতীয় কর্তব্যকেই কি অবহেলা করা হবে না? আগামী রোববারই আমরা সংবর্ধনা কমিটি তৈরি করছি। লোকের অনুরোধে আমি সভাপতি হতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়েছি।'

'আপনার মতো কৃতী লোক থাকতে অন্য কাউকে সভাপতি করা হবেই বা কেন বলুন। সেটা যে গুরুতর অন্যায় হবে।'

'হেঁঃ হেঁঃ, সেইজন্যই রাজি হতে হল। সংবর্ধনা তো চাট্টিখানি কথা নয়! হল ভাড়া করা, ফুলের তোড়া, মালা ইত্যাদির জোগাড়, তারপর ধরুন উদ্বোধনী সংগীতের আর্টিস্ট, এসব তো লাগবেই। সংবর্ধনার পর জনগণের মনোরঞ্জনেরও তো একটু ব্যবস্থা রাখতে হবে না কি? তার জন্য কিশোরকণ্ঠী, মুকেশকণ্ঠী, হেমন্তকণ্ঠী কয়েকজন আর্টিস্টকে আনা, একটা

মূকাভিনয়, একটু ম্যাজিক-ট্যাজিক, তারপরে একখানা নাটক, হরবোলা, অর্কেস্ট্রা কোনটা না হলে চলে বলুন। মাইকের ভাড়া, জলযোগের ব্যবস্থা এসবও তো না করলেই নয়।'

'যে আজ্ঞে। এসব তো সংবর্ধনার চিরকালীন অঙ্গ, বাদ দিলে অঙ্গহানি হবে।'

'খরচাপাতিও আছে, তা ধরুন গিয়ে হাজার বিশেক টাকা হলে ম্যানেজ করে নেওয়া যায়।'

'বিশ হাজার তো আজকালকার বাজারে কিছুই নয়! আপনি ভালো সংগঠক বলেই হয়তো ম্যানেজ করতে পারবেন।'

'যে আজ্ঞে, তবে ওটা জনগণের চাঁদা থেকেই তুলে নিতে হবে। আর বাকি হাজার বিশেক টাকা যদি আপনার মামাশ্বশুরকে বলে একটা ডোনেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আর ভাবনা থাকে না। লটারিটা তো হেলায় জয় করেছেন, ওই সামান্য টাকা ওঁর গায়েই লাগবে না।'

'সে আর বেশি কথা কী? যিনি লটারি মেরেছেন তার তো আর টাকার অভাব নেই। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

'নিশ্চিন্ত হতে পারি তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে মামাশ্বশুরকে বলে টাকা আদায় করতে একটু সময় লাগবে।'

'কেন বলুন তো, উনি কি খুব ব্যস্ত?'

'তা ব্যস্তই বোধ হয়। লটারি পেলে সকলেই তো খুব ভি আই পি হয়ে ওঠে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। আপনি বরং আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।'

'সেটাও শক্ত নয়, তবে দেরি হবে।'

'আচ্ছা, এই দেরিটার কথা বারবার বলছেন কেন বলুন তো! নিজের মামাশ্বশুরের সঙ্গে কি আপনার সদ্ভাব নেই?'

'আজ্ঞে সদ্ভাব থাকারই তো কথা ছিল।'

'তবে দেরি হবে কেন?'

'লজ্জার কথা হল তাঁকে খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগবে।'

'বলেন কী? তিনি কি লটারি পেয়ে সাধু বা পাগল বা বিবাগি হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন? লটারি পাওয়ার শক অবশ্য অনেকে ঠিক সামলাতে পারে না।'

'সেরকম হতে পারে। আমার কাছে সঠিক তথ্য নেই। তবে সময় দিলে আমি তাকে ঠিকই খুঁজে বের করব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সাক্ষাৎ মামাশ্বশুর বলে কথা। তার ওপর শাঁসালো মানুষ। এরকম মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে আমাদের কাজকারবারই চলবে কীসে?'

'ঠিক কথাই, তবে আপনার অনুরোধ আমার মনে থাকবে। আমি তাকে খুঁজে বের করবই।'

'কত দেরি হবে বলতে পারেন?'

'তা দু-চার বছর ধরে রাখুন।'

'অ্যাঁ! সর্বনাশ! দু-চার বছর কী বলছেন মশাই? তাহলে সংবর্ধনার কী হবে? পাড়ার ক্লাবের ছোকরারা যে আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। বলি পুলিশে খবর দিয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে না, পুলিশকে এখনও জানানো হয়নি অবশ্য। তবে ঘটককে বলা হয়েছে বলে শুনলাম।'

'ঘটক! এর মধ্যে ঘটক আসছে কেন? লটারি পেয়ে আপনার মামাশ্বশুর কি আরও বিয়ে করতে চান নাকি?'

'তা চাইতেও পারেন। আমার ঠিক জানা নেই, তবে ঘটক ছাড়া তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল।'

'কেন বলুন তো! ঘটকের ভূমিকাটা কী?'

'উনিই খুঁজে আনবেন কিনা, অবশ্যি মামাশ্বশুরের আগে তার ভাগনিকেই খুঁজে পাওয়া দরকার।'

'ভাগনি! আচ্ছা মশাই, ভাগনির কথা উঠছে কেন?'

'যার ভাগনি নেই তার যে মামাশ্বশুর হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাই নেই, এটা তো মানবেন!'

'সে তো ঠিকই, কিন্তু আপনার মামাশ্বশুরের অসুবিধাটা কী?'

'সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করা যেতে পারত যদি তিনি বিধিমতো আমার মামাশ্বশুর হতেন।'

'বাধাটা কোথায়?'

'মামাশ্বশুর হননি বলেই বাধা, যার মামাশ্বশুর থাকে না সে যে অতি হতভাগ্য তা আজ আপনার কথা শুনেই বুঝলাম। ব্যাপারটা হল আপনার কথামতো লটারি জেতা মামাশ্বশুর খুঁজতে হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'সবই যে গুলিয়ে দিচ্ছেন মশাই।'

'ব্যাপারটা গোলমেলে ঠিকই, কথাটা হল মামাশ্বশুর বা নিদেন তার ভাগনিটিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সমস্যাটা জটিলই থেকে যাবে। প্রথম তার ভাগনিকে খুঁজে বার করা, পাত্রী দেখা, বিয়ের জোগাড়যন্তর করা, বিয়ে হওয়া-এই এতসব কাণ্ডের পর তবে না আপনি আমার মামাশ্বশুরের নাগাল পাবেন?'

'তার মানে কি আপনার মামাশ্বশুরই নেই বিশুবাবু?'

'আজ্ঞে না। মামাশ্বশুর নেই, তার ভাগনির সঙ্গে আমার বিয়েটাই যে হয়নি এখনও, আর আমি বিশুবাবুও নই।'

'তাহলে তো মুশকিলে ফেললেন মশাই। সংবর্ধনাটা কি ভেস্তে যাবে তাহলে? সংবর্ধনার জন্য যে পাড়ার ছেলেগুলো খেপে উঠেছে।'

'আহা, তাতে আটকাচ্ছে কেন? আপনার মতো একজন কৃতী মানুষকেও তো জনগণের সংবর্ধনা দেওয়া উচিত।'

'তা অবশ্য খুব একটা খারাপ বলেননি, তাহলে দিন তো মশাই, শতখানেক টাকা চাঁদা দিন, নিজের সংবর্ধনাটা সেরে ফেলি।'

'সেই ভালো, কিন্তু ওই যাঃ, অত টাকা যে সঙ্গে নেই!'

'কত আছে?'

'দাঁড়ান, বোধ হয় টাকা পাঁচেক হতে পারে।'

'তাই বা মন্দ কী! কাটছাঁট করে ওতেও সংবর্ধনা দেওয়া যাবে। দিন, পাঁচ টাকাই দিন।'

আকাশগঙ্গা

.লাকের সঙ্গে ভাব ভালোবাসা করতে নরহরি খুবই ভালোবাসে। ভাব জমানোর নানা ফন্দিফিকিরও জানা আছে তার। শনিবার রাতে ডাউন বর্ধমান-কলকাতা লোকালে উঠে সে দেখল কামরাটা বড়োই ফাঁকা। জনমনিষ্যি নেই। এধার-ওধার খুঁজে সে দেখল জানলার ধারে একজন মাত্র বসে বসে ঝিমোচ্ছে। অগত্যা নরহরি গিয়ে তার পাশটিতেই বসল।

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বিনয়ের

সঙ্গে বলল, 'মুখখানা খুব চেনা চেনা ঠেকছে যে!'

লোকটা নিমীলিত চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'চেনা লোককে তো চেনা চেনা দেখবারই কথা!'

নরহরি কস্মিনকালেও এই মুশকো চেহারার ফগলা, ভুঁড়ো গোঁফওয়ালা লোকটাকে দেখেনি। তবু খুশি হয়ে বলল, 'তা যা বলেছেন। কতকাল পরে দেখা!'

কিছু বলতে হয় বলেই বলা। কথা না কইলে নরহরির বড়ো হাঁসফাঁস লাগে। তবে ভাব জমাতে হলে ভুলভাল, সত্যি-মিথ্যে যা হোক কিছু বললেই হল।

লোকটা ঝিমোতে ঝিমোতে বলল, 'হ্যাঁ, এক বছর তিন মাস সতেরো দিন পর।'

নরহরি এ কথায় একটু হাঁ হল। ও বাবা! এ যে একেবারে দিনক্ষণ অবধি বলছে!

তবু নরহরি বেশ অমায়িকভাবেই বলল, 'হ্যাঁ, তা হবে। তা বাড়ির সবাই ভালো তো!'

লোকটা ফের নিমীলিত চোখে একবার নরহরিকে দেখে নিয়ে বলল, 'বাড়ি? বাড়ির কথা আর বলবেন না মশাই। তাদের হাল কী হয়েছে তা ভগবানই জানেন।'

'বাড়ির খবর পাচ্ছেন না বুঝি! তা গিয়ে ঘুরে আসুন না একবার। বাড়ি দূর তো আর নয়।'

'দূর! না, দূর আর এমন কী! আসলে ফুরসত পাচ্ছি কোথায় বলুন।'

'তা অবশ্যি ঠিক। আপনি তো কাজের লোক। তা সেই পুরোনো চাকরিই করছেন তো এখনও?'

'তা ছাড়া আর কী? চাকরিটা তেমন খারাপ ছিল না মশাই। তবে এই বুড়ো মা-বাবা, বউ-বাচ্চাদের ছেড়ে বিদেশবিভুঁইয়ে পড়ে থাকাটাই বড্ড খারাপ লাগে।'

একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই একটা চা-ওলা ছোকরা উঠল।

নরহরি বলল, 'একটু চা ইচ্ছে করবেন নাকি? ভাদ্র মাসের শেষে এবার একটু ঠান্ডাই পড়ে গেছে।'

'তা নিন একটু চা।'

চা খেতে খেতে নরহরি বলল, 'তা কতকাল বাড়ি যাওয়া হয়নি আপনার?'

'তা বেশ অনেকদিনই হয়ে গেল। দু-আড়াইশো বছর হবে।'

'কী বললেন, দু-আড়াই বছর?'

চা খেয়ে লোকটার ঝিমুনি কেটেছে। হাঃ-হাঃ করে হেসে বলল, 'দু-আড়াই বছর হলে তো কথাই ছিল না মশাই। সে তো নস্যি। আমি কি তাই বললাম আপনাকে?'

'তাহলে?'

'দু-আড়াইশো বছরের কথাই বলছি। এতদিনে মা-বাবা আরও একটু বুড়ো হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ছোটো মেয়েটা তখন হামা দিয়ে বেড়াত, এখন নিশ্চয়ই হেঁটে চলে বেড়ায়। রাঙী গাইটার বিয়োনোর কথা ছিল, তা তার বাছুরটাও বোধ হয় এতদিনে বড়ো হয়ে গেছে। গোয়ালঘরের পিছনে কলমের গাছটা ছোটো ছিল, এখন নিশ্চয়ই ফল দিতে শুরু করেছে।'

লোকটা পাগলই হবে। তবে ভয়ংকর পাগলকেই যা ভয়। অল্পস্বল্প পাগলকে নরহরি সামাল দিতে পারবে। তাই সে ভারি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, অনেকদিনের পাল্লা তো, ওরকম হতেই পারে। তা আপনার গ্রামটি কি বাঁকড়ো না মেদিনীপুরে?'

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'কোনোটাই নয়, আমার জেলা হল হরেকেষ্টপুর, থানা শিকরগাছা, গাঁয়ের নাম কালীতলা।'

'হরেকেষ্টপুর! এরকম জেলার নাম তো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'খুব বড়ো জেলা মশাই। আড়েদীঘে এতই বড়ো যে আপনাদের এগারোটা বর্ধমান জেলা তাতে অনায়াসে ঢুকে যাবে।'

নরহরি অবাক হয়ে বলে, 'ওরে বাবা! তা কোন লাইনে যেতে হয় বলুন তো! একবার না হয় ঘুরেই আসা যাবে।'

'কাজটা শক্ত হবে। পরাণ মাঝির খেয়া ছয় মাসে একবার করে এখানে খেপ মারে। তা সে খেয়ায় সবসময়ে জায়গা পাওয়া যায় না। মোটে বারোশো লোক বসবার জায়গা আছে।'

চোখ কপালে তুলে নরহরি বলল, 'খেয়া নৌকোয় বারোশো লোক! সেটা কি নৌকো, না জাহাজ?'

'আদর করে খেয়া বলে বটে সবাই। তবে সেখানা বেশ বড়োসড়ো ব্যাপারই বটে।'

'তা মশাই, খেয়া নৌকো তো আমাদের দামোদরেও খেপ মারে। দিনে অগুনতিবার এপার-ওপার করছে। কিন্তু আপনাদের পরাণ মাঝি ছ-মাসে একবার খেপ মারে কেন?'

'পাল্লাটাও তো দেখতে হবে। তা ধরুন এ মুড়ো ও মুড়ো ধরলে লক্ষ কোটি মাইলের তফাত।'

'এ যে দুনিয়াজোড়া কথা মশাই।'

'যে আজ্ঞে। দুনিয়াজোড়া কথাই তো।'

'নদীটার নাম কী বলুন তো।'

'আমরা তো বলি আকাশগঙ্গা।'

'আকাশগঙ্গা! না দাদা, এরকম নদীর নাম শুনিনি।'

'না শুনলেও দেখেছেন তো বটেই।'

'দেখেছি নাকি?'

'না দেখার কী আছে বলুন। চোখের সামনেই বুক চিতিয়ে পড়ে আছে। জল-টল নেই অবশ্য, শুধু খাত।'

'বলেন কী, জলছাড়া নদী! তা তাতে আবার খেয়া! না দাদা, আমার মাথায় সেঁধোচ্ছে না।'

লোকটা ভারি হাঃ-হাঃ করে হাসল। বলল, 'আকাশগঙ্গা কি যে সে নদী! তার দেমাকই আলাদা।'

'নদীটা কি আমাদের বর্ধমানের লাইনেই পড়বে মশাই?'

'তা পড়বে না কেন? আকাশগঙ্গার ঘাট সর্বত্র। ওপর পানে তাকালেই তো আকাশগঙ্গা মশাই। একেবারে ভগবানের রাজ্যে। ও নদীর কোনো কূলকিনারা নেই। কোথাও শুরু হয় না, কোথাও শেষ হয় না।'

'আপনি বোধ হয় ঠাট্টা করছেন।'

'আমি ঠাট্টা করার কে? ঠাট্টা যদি বলেন তো সেটা ভগবানেরই ঠাট্টা। অত বড়ো আকাশখানা আমাদের মুখের ওপর ছুড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় বলুন! আমরা ছোটোখাটো মানুষ সব, আকাশখানার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ারই তো কথা।'

নরহরি এবার খুব সন্তর্পণে বলল, 'আপনার আকাশগঙ্গা কি তাহলে আকাশের নদী মশাই?'

'তাই বটে।'

'সেটাকেই কি আকাশকুসুম বলে?'

'তাও বলতে পারেন। সন্ধেরাতের দিকে পূবমুখো দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতে কোনাকুনি যে লালচে তারাটাকে দেখতে পাবেন, ওরই কাছেপিঠে আমার গাঁ। ভারি ভালো গ্রাম মশাই। হপ্তায় তিন দিন হাট বসে। শিবরাত্রি, চড়ক, রথ আরও সব পালেপার্বণে বিরাট মেলা বসে। জাগ্রত রক্ষাকালীর থান আছে। লাগোয়া দ্বাদশ শিবের মন্দির। রথযাত্রায় দু-শো ফুট উঁচু রথ বেরোয়।'

নরহরির বাক্য শেষ হয়ে গেল। এ পাগলের সঙ্গে কথা কওয়ার মানেই হয় না। সে পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ফেলল। মাথাটা ঘুরছে।

'মশাই কি ঘুমোলেন?'

'আজ্ঞে একটু ঝিমুনি আসছে বটে।'

'তাহলে ঘুমোন। আমি পরের স্টেশন মশাগ্রামেই নেমে যাব।'

'তা বেশ।'

'শুধু নামবার আগে একটা কথা।'

'কী বলুন তো।'

'এক বছর তিন মাস সতেরো দিন আগে এই ট্রেনেই এমনি রাতের বেলা আপনি আমার ঘুম ভাঙিয়ে খেজুরে আলাপ জুড়েছিলেন, মনে আছে?'

নরহরি শশব্যস্তে বলল, 'তাই নাকি?'

'যে আজ্ঞে। তাই তক্কে তক্কে ছিলাম। আজ সুযোগ পেয়ে একটু পালটি দিয়ে গেলাম আর কি। ভবিষ্যতে আর বোধ হয় আপনি আমার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করবেন না।'

নরহরি ভারি খুশি হয়ে হাত কচলে বলল, 'আজ্ঞে না। কস্মিনকালেও না।'

হরবাবুর অভিজ্ঞতা

নিশুত রাতে হরবাবু নির্জন অন্ধকার মেঠো পথ ধরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। বৃষ্টিবাদলার দিন। পথ জলকাদায় দুর্গম। তার ওপর আকাশে প্রচণ্ড মেঘ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হরবাবুর টর্চ আর ছাতা আছে বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। টর্চের আলো নিবুনিবু হয়ে আসছে আর হাওয়ায় ছাতা উলটে যাওয়ার ভয়। বর্ষাবাদলায় সাপখোপের ভয়ও বড়ো কম নয়। গর্ত-টর্ত বুজে যাওয়ায় তারা আশ্রয়ের সন্ধানে ডাঙাজমির খোঁজে পথেঘাটে উঠে আসে।

হরবাবুর অবশ্যই এই নিশুত রাতে পৌঁছোনোর কথা নয়। কিন্তু ট্রেনটা এমন লেট করল যে হরিণডাঙা স্টেশনে নামলেনই তো রাত সাড়ে দশটায়। গোরুর গাড়ির খোঁজ করে দেখলেন সব ভোঁ ভোঁ, এমনকী তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাঁ গোবিন্দপুর যাওয়ার সঙ্গী-সাথিও কেউ জুটল না। গোবিন্দপুর না হোক দুই-তিন মাইল রাস্তা। হরবাবুর ভয় ভয় করছিল। কিন্তু উপায়ও নেই। তাঁর শালার বিয়ে। হরবাবুর স্ত্রী চার-পাঁচ দিন আগেই ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে এসেছেন। হরবাবুর জন্যে তাঁরা সব পথ চেয়ে থাকবে।

সামনেই তুলসীপোতার জঙ্গল। একটু ভয়ের জায়গা, আধমাইলটাক খুবই নির্জন রাস্তা। আশেপাশে বসতি নেই। হরবাবু কালী-দুর্গা স্মরণ করতে করতে যাচ্ছেন। বুকটা একটু কাঁপছেও। এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও পৃথিবীটা যে কেন এত পেছিয়ে আছে, তা তিনি বুঝতে পারেন না।

ফিরিঙ্গির হাট ছাড়িয়ে ডাইনে মোড় নিতে হবে। কিন্তু এত জম্পেস অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না, টর্চবাতির আলো চার-পাঁচ হাতের বেশি যাচ্ছেও না। বড়োই বিপদ।

হরবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'ঃও, আজ বেঘোরে প্রাণটা না যায়।' ডান দিকে তুলসীপোতার রাস্তার মুখটা খুঁজে পেয়েও দমে গেলেন হরবাবু। এতক্ষণ যাইহোক শক্ত জমির ওপর হাঁটছিলেন। এবার একেবারে থকথকে কাদা।

'হরি হে, এই রাস্তায় মানুষ যেতে পারে? পৃথিবীটা বাসযোগ্য নেই।'

হরবাবু আপনমনে কথাটা বলে ফেলতেই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'তা যা বলেছেন!'

হরবাবু এমন আঁতকে উঠলেন যে আর একটু হলেই তাঁর হার্টফেল হত। পিছনে তাকিয়ে দেখেন, একটা রোগা আর লম্বাপানা লোক। হরবাবুর সঙ্গে শালার বউয়ের জন্য গড়ানো একছড়া হার আছে। কিছু টাকাপয়সাও। লোকটা ডাকাত নাকি? হরবাবু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কে?'

'চিনবেন না। এদিক পানেই যাচ্ছিলাম।'

'অ। তা ভালো।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? গোবিন্দপুর নাকি?'

হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, সেখানেই যাওয়ার কথা।'

লোকটা একটু হাসল, 'যেতে পারবেন কি? এখন তো এই কাদা দেখছেন, গোড়ালি অবধি। এরপর হাঁটু অবধি গেঁথে যাবে।'

'তাহলে উপায়? আমার যে না গেলেই নয়।'

লোকটা একটু হেসে বলে, 'উপায় কাল সকাল অবধি বসে থাকা। তারপর ভোর বেলা ফিরিঙ্গির হাট থেকে গোরুর গাড়ি ধরে শিয়াখালি আর চটের হাট হয়ে গোবিন্দপুর যাওয়া। তাতে অবশ্য রাস্তাটা বেশি পড়বে। প্রায় সাত-আট মাইল। কিন্তু বর্ষাকালে তুলসীপোতা দিয়ে যাতায়াত নেই।'

'রাত এখানে কাটাব? থাকব কোথায়?'

'তার আর ভাবনা কী? একটু এগোলে ওই জঙ্গলের মধ্যে আমার দিব্যি ঘর আছে। আরামে থাকবেন।'

হরবাবু খুব দোটানায় পড়লেন বটে, কিন্তু কী আর করেন। লোকটা যদি তাঁর সব কেড়েকুড়েও নেয় তাহলে কিছু করার নেই বটে। কিন্তু গোবিন্দপুর যে পৌঁছোনো যাবে না তা বুঝতে পারছেন।

'আমার পিছু পিছু আসুন।' বলে লোকটা একটু এগিয়ে গেল।

হরবাবু খুব ভয়ে ভয়ে আর সংকোচের সঙ্গে তার পিছু পিছু যেতে যেতে বললেন, 'তা আপনার বাড়ি বুঝি ফিরিঙ্গির হাটেই?'

'তা বলতে পারেন! যখন যেখানে ডিউটি পড়ে সেখানেই যেতে হয়। আমার কাছে সব জায়গাই সমান। তবে আপনার এই পৃথিবীটা যে বাসযোগ্য নয় তা খুব ঠিক কথা। এখানে হরকিত, গুবজোর, সেরোই কিছুই পাওয়া যায় না। বড্ড অসুবিধে।'

লোকটা পাগল নাকি? হরবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কী কী পাওয়া যায় না বললেন?'

'বলে লাভ কী? আপনি পারবেন জোগাড় করে দিতে? ওসব হচ্ছে খুব ভালো ভালো সব সবজি।'

'জন্মে যে নামও শুনিনি! এসব কি বিলেতে হয়?'

'না, মশায় না। বিলেতের বাজারও চষে ফেলেছি।'

খুবই আশ্চর্য হয়ে হরবাবু বললেন, 'বিলেতেও গেছেন বুঝি?'

'কোথায় যাইনি মশায়! ছোটো গ্রহ, এমুড়ো-ওমুড়ো টহল দিতে কতক্ষণই বা লাগে।'

হরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই দুর্যোগের রাতে শেষে কি পাগলের পাল্লায় পড়লেন?

লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'নিতান্তই পেটের দায়ে পড়ে থাকা মশাই। নইলে এই অখাদ্য জায়গায় কেউ থাকে? এখানে ফোরঙ্গলিথুয়াম হয় না, কাঙ্গারাঙ্গা নেই, ফেজুয়া নেই-এ জায়গায় থাকা যায়?'

হরবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'এগুলোও কি সবজি?'

'আরে না। আপনাকে এসব বুঝিয়েই বা লাভ কী? আপনি এসব কখনো দেখেননি, জানেনও না। ফোরঙ্গলিথুয়াম একটা ভারি আমোদপ্রমোদের ব্যাপার। কাঙ্গারাঙ্গা হল খেলা। ফেজুয়া হল-নাঃ, এটা বুঝবেন না।'

হরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আজ্ঞে না। আমার মাথায় ঠিক সেঁধোচ্ছে না। তা মশাইয়ের দেশ কি আফ্রিকা?'

'হাসালেন মশাই। আফ্রিকা হলে চিন্তা কী ছিল! এ হল জরিভেলি লোকের ব্যাপার।'

'জরিভেলি?'

'শুধু জরিভেলি নয়, জরিভেলি লোক। এই আপনাদের মতো নয়টি গ্রহ নয়, আমাদের ফুন্দকনিকে ঘিরে পাঁচ হাজার গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে। সবকটা নিয়ে জরিভেলি লোক। এলাহি কাণ্ড!'

হরবাবু মূর্ছা গেলেন না। কারণ লোকটা পাগল। আবোল-তাবোল বকছে।

কিন্তু কয়েক কদম যেতে না যেতেই হরবাবু যে জিনিসটা দেখতে পেলেন তাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া। জঙ্গলের মধ্যে ছোটোখাটো একটা বাড়ির মতো একখানা মহাকাশযান। আলো-টালো জ্বলছে। ভারি ঝলমল করছে জিনিসটা।

ভিতরে ঢুকে হরবাবু যা দেখলেন, তাতে তাঁর মূর্ছা যাওয়ারই জোগাড়। হাজার কলকবজা, হাজার কিম্ভূত সব জিনিস। কোথাও আলো জ্বলছে নিবছে, কোথাও হুস করে শব্দ হল, কোথাও পিঁ পিঁ করে কী যেন বেজে গেল, কোথাও একটা যন্ত্র থেকে একটা গলার স্বর অচেনা ভাষায় নাগাড়ে কী যেন বলে চলেছে-লং পজং টাকাকালু লং পজং পাকালাকু . . .

হরবাবুর মাথা ঘুরছিল। তিনি উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি কোথা থেকে এক গেলাস কালোমতো কী একটা জিনিস এনে তাঁর হাতে দিয়ে বলল, 'খেয়ে ফেলুন।'

হরবাবু বুক ঠুকে খেয়ে ফেললেন। একবারই তো মরবেন। তবে স্বাদটা ভারি অদ্ভুত। ভিতরটা যেন আরামে ভরে গেল।

'এসব কী হচ্ছে মশাই বলুন তো?'

লম্বা লোকটা ব্যাজার মুখে বলল, 'কী আর হবে? আমার এখানে পোস্টিং হয়েছে। পাক্কা তিনটি মাস-আপনাদের হিসেবে-এই খানেই পড়ে থাকতে হবে।'

'কীসের পোস্টিং?'

'আর বলবেন না মশাই। এতদিন জরিভেলির বাইরে আমরা কোথাও যেতাম না। এখন হুকুম হয়েছে, কাছেপিঠে যেক-টা লোক আছে সেগুলো সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সোজা কাজ নাকি মশাই? যেখানে পোস্টিং হবে, সেখানকার ভাষা শেখো রে, সেখানকার আদবকায়দা রপ্ত করো, সেখানকার অখাদ্য খেয়ে পেট ভরাও রে। নাঃ, চাকরিটা আর পোষাচ্ছে না।'

হরবাবু একটু একটু বুঝতে পারছেন, লোকটা গুল মারছে না। তিনি উঠে একটা চেয়ারগোছের জিনিসে বসে পড়ে বললেন, 'আপনাদের জরিভেলি কতদূর?'

'বেশি নয়। আপনাদের হিসেবে মাত্র একশো তেত্রিশ আলোকবর্ষ দূরে।'

'সর্বনাশ, সে তো অনেক দূর!'

'হ্যাঁ, তা আর বেশি কী? আমার এই গাড়িতে ঘণ্টা খানেক লাগে।'

'অ্যাঁ'

'হ্যাঁ।'

হরবাবু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'তাহলে আর আমার শ্বশুরবাড়ি গোবিন্দপুর এমন কী দূর?'

'কিছু না, কিছু না।'

হরবাবু মহাকাশযান থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে লাগলেন।

পটকান যখন পটকাল

পটকান পালোয়ান ছিল শেরপুরের গর্ব। সে চেহারা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ষাট ইঞ্চি বুক, আশি ইঞ্চি পেট, গরিলার মতো হাত-পা। শরীরটার কোথাও কোনো ভেজাল নেই। ভুঁড়িখানা ঢালের মতো শক্ত। পটকান পালোয়ান ভুঁড়ি দিয়ে বিস্তর কুস্তিগিরকে চেপে দমসম করে দিয়েছে।

তিন কুলে পটকান পালোয়ানের কেউ ছিল না। খুব অল্পবয়স থেকে ভীষণ খাই খাই ছিল বলে খিটখিটে বাপ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই থেকে পটকান বিবাগি। অবশ্য সে বাপ এখন নেই, মাও গত হয়েছেন। পটকান তাই একা আনন্দে থাকে। সকালে দঙ্গলে গিয়ে তেল মাটি মাখে, কসরত করে, মুগুর ভাঁজে। অসংখ্য ডন-বৈঠক দেয়। এক সের ছোলা দিয়ে সকালে জল খায়। বেলা পড়লে রুটির পাহাড় মাংসের পর্বত দিয়ে শেষ করে। বিকেলে একপুকুর দুধ আর এক গামলা বাদাম বাটা খায়, রাতে ফের ঘিয়ের পরোটার বংশ লোপ করে চারটে মুরগি দিয়ে। এর ফাঁকে ফাঁকে এন্তার ডিম, সবজি, মিছরি, শরবত চালান হয়ে যায় তার অজান্তে। এ সব ছোটোখাটো খাবারগুলো সে খাওয়ার মধ্যে ধরে না।

পটকানের সঙ্গে সেবার লড়তে এল পাঞ্জাবের ভীম সিং, তারও বিশাল চেহারা। খাওয়াদাওয়াও প্রায় পটকানের সমান। জমিদারের কাছারি বাড়িতে লোক ভেঙে পড়ল কুস্তি দেখতে। পটকান ভীম সিংকে তিন মিনিটে চিত করে হাত ঝেড়ে বলল, 'ছোঃ।' জমিদারের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন। কিন্তু এসব চ্যাংড়া-প্যাংড়ার সঙ্গে লড়ার জন্য আমাকে ডাকা কেন?'

সবাই ভাবে, ঠিক কথা, কিন্তু মুশকিল হল পটকান লড়বেই বা কার সঙ্গে? দেশ-বিদেশ থেকে যারাই লড়তে আসে, সে যত বড়ো ওস্তাদই হোক, পটকান তিন মিনিটের বেশি সময় নেয় না। লড়াইয়ের শেষে আবার বলে, 'ছোঃ।' জমিদারের দিকে চেয়ে অভিমানের সঙ্গে বলে, 'আনাড়িদের সঙ্গেই কি আমাকে বরাবর লড়তে হবে হুজুর?'

জমিদারমশাই মহা সমস্যায় পড়ে বললেন, 'তা বাপু, তোমার যোগ্য কুস্তিগির পাই কোথায়? এঁরা যারা আসছেন লড়তে তাঁরাও সব নামডাকের লোক, কিন্তু তোমার কাছে কেউই ধোপে টেকে না দেখি।'

'তার চেয়ে হুজুর বন্দোবস্ত করুন, ওরা দু-জন করে আসুক লড়তে, আমি একা।'

তাই হল। লড়তে এল বচন পাণ্ডে আর হরি দোসাদ। দু-জনকে দু-বগলে নিয়ে হা-হা করে হেসে ওঠে পটকান। তারপর তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে, 'ছোঃ ছোঃ!' বলে জমিদারবাবুর দিকে তাকায়, 'হুজুর, দেশে কি আর মানুষ পাওয়া গেল না!'

জমিদারমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন, 'তাই তো! এরা তো দেখছি তেমন কিছু নয়। অথচ শুনেছিলাম এরা কিলিয়ে পাথর ভাঙে, পাঁচ মন ওজন তোলে এক এক হাতে, হাতি বুকে নেয়। সে সব তো গল্পকথা নয় বাপু, নিজের চোখে দেখেই এনেছি। আচ্ছা দেখি তোমার উপযুক্ত যদি কাউকে পাই।'

এরপর তিন পালোয়ান লড়তে এল একসঙ্গে। ভীষণ ভীষণ তাদের চেহারা। গোল্লা গোল্লা করে চায় আর দাঁত কিড়মিড় করে। তা সেই তিন জন যখন লড়তে নামল তখন বেলুন চুপসে আমসত্ত্ব হয়ে গেল ফের। তিনটেকে নিয়ে খানিক লোফালুফি খেলল পটকান, চেঁচিয়ে জমিদারমশাইকে বলল, 'হুজুর যখন বলবেন তখনই তিন জনকে মাটিতে ফেলব।'

ফেললও তাই, তিনবার ছোঃ দিয়ে জমিদারমশাইয়ের দিকে তাকাতেই জমিদারমশাই বেজায় ভয়-খাওয়া মুখ করে মিনমিন করলেন, 'তাই তো বাপু, এ তো বড়ো মুশকিলে ফেললে তুমি।'

খুব বড়ো একটা শ্বাস ফেলে পটকান বলল, 'এরকম চললে আমাকে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে দেখছি।'

এই কথায় সবাই ভারি চিন্তিত হয়ে পড়ে। জমিদারমশাইয়ের একেই হার্টের ব্যামো, বাঁ পায়ে বাতব্যাধি, রক্তচাপের রোগ, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, পেটটা ভুটভাট করে সব সময়ে। তার ওপর পটকানের এই কথা শুনে তিনি প্রায় অন্নজল ছাড়েন আর কি! শেরপুরের গর্ব পটকান পালোয়ান সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

শেরপুরের লোকেরা ভীষণ বিমর্ষ। পটকানের সঙ্গে কেউ লড়ে পারে না সে ঠিক, কিন্তু তা বলে একটু লড়াই হবে তো, কিছুক্ষণ কোস্তাকুস্তি করে তবে চিত হবি। এ যেন সব

হেরোর দল মাটি নেওয়ার জন্যই আসে। এইসব হেরোর দলকে শেরপুরের লোকেরা হারু বলে উল্লেখ করে। জেতে বলে পটকানের নাম তারা দিয়েছে জিতেন। সবাই বলাবলি করে, 'জিতেনের সঙ্গে এবার কোন হারু লড়তে আসছে রে?'

তা এল এবার। সারা দেশে লোক পাঠিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে মানুষের চেহারার দশ জন দানবকে ধরে আনা হল। তিন দিনে তারা শেরপুরের সব খাবার খেয়ে ফেলল প্রায়। চারদিকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। দশ পালোয়ান বাঘের মতো গর-র গর-র আওয়াজ ছাড়ে, মানুষের ভাষায় কথাই বলে না। দিনমানে তারা নিজেদের সামলাবার জন্য নিজেরাই নিজেদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। ভীষণ রাগী, কখন কার ঘাড় মটকে দিয়ে জেল হয়। তবু শেষরক্ষা হয় না বুঝি। তাদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা মজবুত পাকা ঘর। তবু দশ পালোয়ানের নড়াচড়ায় মেঝে দেবে গেল, দেওয়াল ভেঙে গেল একধারের। হাঁকডাকে চারধারে ভূমিকম্প হল কয়েকবার।

লড়াইয়ের দিন চারটে রথযাত্রার ভিড় ভেঙে পড়ল কাছারি বাড়িতে। হুলুস্থুল কাণ্ড। দশ দানব দঙ্গলের মাটি কাঁপিয়ে এসে ঢুকল একসঙ্গে। দশ জনের সঙ্গে একা লড়বে পটকান।

চোখে দেখেও কারও বিশ্বাস হচ্ছিল না ব্যাপারটা। পটকান দঙ্গলে ঢুকে গুরু প্রণামটা সেরে নিল কেবল। তারপরই দেখা গেল সে এক-একটা দানবকে ধরে পটাপট ভিড়ের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে, ঠিক যেমন গদাই মালী বাগানের আগাছা তুলে ছুড়ে দেয় বেড়ার বাইরে। দু-মিনিটে দশ পালোয়ান সাবাড় করে ঠিক দশ বার ছোঃ দিল পটকান। তারপর ভীষণ অভিমানের চোখে তাকাল জমিদারমশাইয়ের দিকে। বলল, 'হুজুর-'

রোগা-ভোগা জমিদারমশাইয়ের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে অপমানে। তিনি কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন।

পটকান বলল, 'হুজুর, এরা সব কারা এসেছিল হুজুর? এসব রোগা দুবলা লোক কোত্থেকে আনলেন?'

হঠাৎ জমিদারমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চোপরাও বেয়াদব! রোগা দুবলা লোক? অ্যাঁ? রোগা দুবলা লোক এরা সব!'

বলতে বলতে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জমিদারমশাই বাতব্যাধির কথা ভুলে, হার্টের ব্যামোর কথা বিস্মরণ হয়ে, রক্তচাপকে পরোয়া না করে, পেটের ভুটভাটকে উপেক্ষা করে এক লাফে এগিয়ে এলেন দঙ্গলের মাটির ওপর।

'কিছুতেই তোমার শিক্ষা হয় না, অ্যাঁ . . .' বলতে বলতে জমিদারমশাই পটকানের ঘাড়টা ধরে এক ঝটকায় তুলে ফেললেন মাথার ওপরে। তারপর সে কী বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

পটকান প্রাণভয়ে চ্যাঁচাচ্ছে তখন, 'বাবা গো! গেলাম গো! মেরে ফেললে গো! কে কোথায় আছ ছুটে এসো!'

কে শোনে কার কথা! কয়েকবার আচ্ছাসে ঘুরিয়ে জমিদারমশাই পটকানকে এক বেদম আছাড় মারলেন। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'ছোঃ!'

বলাইবাবু

'বাঃ, আপনার কুকুরটি কিন্তু ভারি সুন্দর বলাইবাবু।'

'কুকুর, কোথায় কুকুর!'

'ওই তো, আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে।'

'অ! না মশাই, ওটা আমার কুকুর নয়।'

'নয়! ইস দেখুন তো, আপনার কুকুর মনে করে গতকালও যে ওকে আমি লেড়ো বিস্কুট কিনে খাইয়েছি! বিস্কুটের আজকাল যা দাম হয়েছে, কহতব্য নয়। পয়সাটা কি তবে জলে গেল?'

'কিন্তু মশাই, আমার কুকুর মনে করে ওকে লেড়ো বিস্কুট খাওয়াতে গেলেন কেন? আমার কুকুরকে লেড়ো বিস্কুট খাওয়ানোয় আপনার লাভ কী?'

'আছে, ও আপনি বুঝবেন না। সামান্য একটা লেড়ো বিস্কুটই তো! তবে ও কিন্তু গতকালও আপনার পিছু পিছু বাজার অবধি গিয়েছিল। পরশুদিনও। এমনকী তার আগের দিনও।'

'অবাক কাণ্ড! কুকুরটা রোজ আমার পিছু নেয়, আমি তো তা জানতাম না।'

'আমার যতদূর মনে হয়, কুকুরটা লোক চেনে। আপনি যে একজন মহান লোক তা কুকুরটা বুঝতে পেরেছে।'

'আমি মহান লোক! তা মশাই, মহান কথাটার মানে কী দাঁড়াচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারেন? জীবনে কখনো কেউ আমাকে মহান বলেনি। শুনে বড়ো অবাক লাগছে।'

'কী যে বলেন বলাইবাবু। মহান কথাটার জন্মই তো হল আপনার জন্য। ও কথাটা আর কারও গায়ে তেমন ফিট করে না, কিন্তু আপনার গায়ে একদম মাপে মাপে বসে যায়।'

'বটে!'

'তা নয়! সবাই জানে আপনার মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদে, আপনি দু-হাতে গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেন, আপনি মানুষের বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়েন, নিতান্ত সামান্য মানুষকেও সম্মান দিয়ে কথা বলেন, জীবজন্তুর প্রতি আপনার প্রেম তো সর্বজনবিদিত।'

'চিন্তায় ফেলে দিলেন মশাই। আমি মানুষকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না। বাড়িতে ভিক্ষুক এলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কারণ অধিকাংশ ভিক্ষুকই প্রফেশনাল নিষ্কর্মা। মানুষ নিজের দোষে বিপদে পড়ে বলে আমি কারও বিপদআপদে বোকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি না আর অধিকাংশ মানুষই সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয় বলে তাদের আমি পোকামাকড়ের বেশি মনে করি না। আরও একটা কথা, কুকুর বেড়াল ইত্যাদি নানা রোগজীবাণু বহন করে বলে আমি তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলি।'

'আহা বলাইবাবু, এসবও তো বিবেচকের মতোই কাজ। আর তাতে আপনার মহান হতে আটকাচ্ছে কীসে?'

'তাতেও আটকাচ্ছে না! তাজ্জব করলেন মশাই!'

'আজ্ঞে, দু-চারটে গুণ বাদ গেলেও ক্ষতি নেই। গান্ধীজি কি ফুটবল খেলতে পারতেন?'

'বোধ হয় না। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন?'

'আচ্ছা, বিদ্যাসাগরমশাই কি গান জানতেন?'

'জানি না তো!'

'রবিঠাকুর কি ক্যালকুলাস জানতেন?'

'না জানাই সম্ভব।'

'তা বলে কি তাঁরা মহান নন?'

'তা বটে। তাহলে আপনি আমাকে মহান বানিয়েই ছাড়বেন।'

'আজ্ঞে না! আমি বলতে চাইছিলাম যে, আপনি মহান হয়েই জন্মেছেন। তা আপনি যতই নিজেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুন। আর এটাও আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মহানদেরই লক্ষণ।'

'আমি মশাই, নিজেকে মোটেই তুচ্ছ জ্ঞান করি না। আমি বিলক্ষণ জানি যে, আমি একটি বড়ো কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সেজন্য আমার যথেষ্ট অহংকারও আছে।'

'বলাইবাবু, ওই অহংকারও আপনাকে মানায়।'

'আচ্ছা মশাই, আপনি তো গায়ে পড়ে অনেক কথা বলছেন। কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না! আপনি কে বলুন তো!'

'কী যে বলেন, আমাকে চিনতে যাবেন কোন দুঃখে? উঁচু সার্কেলের লোকদের কাছে দেওয়ার মতো পরিচয় তো নয়।'

'সে তো আপনার হাড়হাভাতে চেহারা আর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবু নামধাম জেনে রাখা ভালো।'

'নাম হল ধর্মদাস ঘোষ।'

'কী করা হয়-টয়?'

'ওই সামান্য একটু ডাক্তারি করে থাকি। হোমিয়োপ্যাথি।'

'তা মন্দ কী? হোমিয়োপ্যাথদের তো আজকাল বেশ পসার শুনেছি।'

'তা আজ্ঞে কিছু কিছু মানুষ ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। তারা যাতে হাত দেয় তাতেই সোনা ফলে। তবে কিনা হোমিয়োপ্যাথিতে আমি তেমন সুবিধে করে উঠতে পারিনি। তাই ওর সঙ্গে একটু জ্যোতিষচর্চাও করে থাকি।'

'ওরে বাবা, আপনি জ্যোতিষীও?'

'ওই যে বললাম, কপাল ভালো থাকলে সবকিছুতেই হাতযশ হয়। কিন্তু আমার জ্যোতিষবিদ্যারও তেমন কদর হয়নি।'

'এবার বলুন তো ধর্মদাসবাবু, আজ গায়ে পড়ে এই খেজুর করার উদ্দেশ্যটা কী?'

'আজ্ঞে, গত কয়েকদিন ধরেই আপনাকে আমি ফলো করছি।'

'ফলো করছেন! আশ্চর্য ব্যাপার! ফলো করছেন কেন?'

'আজ্ঞে পদাঙ্ক অনুসরণও বলতে পারেন। ভাবলাম কৃতবিদ্য লোক আপনি, বিশাল ডিগ্রি, বিশাল চাকরি, বিশাল নামডাক, তা আপনার হাওয়া-বাতাস গায়ে লাগলেও উপকার আছে। তাই রোজই, আপনি যখন আর পাঁচজনের মতো বাজার করতে বেরোন তখন আমি আপনার পিছু নিই।'

'কারও পিছু নেওয়া যে অভদ্রতা সেটা নিশ্চয়ই জানেন!'

'যে আজ্ঞে।'

'এরজন্য আপনাকে আমি পুলিশে দিতে পারি তা জানেন?'

'পারেন বই কী। মানগণ্য লোক আপনি, পুলিশকে ডাকলে তারা ধেয়ে আসবে। উটকো লোক আমি, কী উদ্দেশ্যে ফলো করছি এটাও তো ভাববার কথা।'

'যাকগে, আমি পুলিশ ডাকছি না। আপনিও আর ফলো করবেন না।'

'আজ্ঞে। তবে কিনা ওই কুকুরটাও কিন্তু রোজই আপনাকে ফলো করে।'

'কুকুরটা কেন ফলো করে তা আমি জানি না, তবে তার উদ্দেশ্য ততটা সন্দেহজনক নাও হতে পারে।'

'যে আজ্ঞে। আপনি বিবেচক মানুষ।'

'আপনার কি আর কিছু বলার আছে?'

'তেমন কিছু নয়। না বললেও চলে। আপনার হাতে হয়তো এত সময়ও নেই। ব্যস্ত মানুষ আপনি, বাজার করে এসে চাট্টি খেয়েই হয়তো অফিসে রওনা হবেন। আজ অবশ্য শনিবার, আপনার ছুটি। তা হলেও হয়তো বিকেলের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর বা লন্ডন যাওয়ার আছে, কিংবা নিদেন দিল্লি-টিল্লি।'

'সিঙ্গাপুর। খবর-টবর রাখেন দেখছি।'

'কী যে বলেন! হোমরাচোমরা মানুষরা যা করেন তাই খবর। এমনকী হেমন্ত আগরওয়ালের সঙ্গে পার্টিতে একটু আবডাল হয়ে কথা বললেও খবর, কিংবা দুবাইয়ের নটবরলালের সঙ্গে চোখাচোখি হলেও খবর।'

'অ্যাঁ! কী কী বললেন?'

'আজ্ঞে, ও কিছু নয়। বড্ড বেশি কথা বলে ফেলি বলে আমার গিন্নিও আমাকে প্রায়ই বকাঝকা করেন। আমাদের কথার দামই বা কী বলুন।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, বেশি কথা বলেন বটে, কিন্তু হেমন্ত আগরওয়াল বা নটবরলালের নাম তো আপনার জানার কথা নয়!'

'বলেন কী বলাইবাবু! এ নামে কি সত্যিকারের কেউ আছে নাকি? আমি তো জিভের ডগায় যা এল বলে ফেললাম।'

'না মশাই না! ব্যাপারটা এখন আমার কাছে অতটা সোজা মনে হচ্ছে না! ধর্মদাসবাবু একটু ঝেড়ে কাশুন তো।'

'এই দেখো ফ্যাসাদ। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, আপনি হয়তো আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। বড়ো মানুষরা রেগে গেলে যে আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের ঘোর বিপদ!'

'ধর্মদাসবাবু, ব্যাপারটা একটু সিরিয়াস কিন্তু।'

'না না বলাইবাবু, আমি আসলে আপনার ভালোর জন্যই বলতে এসেছিলাম যে, আপনি একজন গণ্যমান্য লোক, আপনার কোনো অসোয়াস্তির কারণ ঘটুক এটা আমি চাই না।'

'অসোয়াস্তিটা কীসের?'

'এই যে ওই কুকুরটা আর আমি আপনাকে রোজ ফলো করি, কিন্তু আপনি তা টের পান না এটা যেমন অসোয়াস্তি তেমনি এই আমাদের মতো আরও জনা দুই আপনার পিছু নেয় রোজ। একজন ওই যে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে, মোটা মতো, ধুতি আর শার্ট পরা। আর একজন ওই যে, দেওয়ালে পোস্টার পড়ছে, লম্বা রোগামতো!'

'আশ্চর্য! ওরা আমাকে রোজ ফলো করে, ঠিক জানেন?'

'আজ্ঞে। তবে হয়তো ওরা চাকরির উমেদার, কিংবা টেন্ডার দিতে চায়, কিংবা হয়তো কোনো ধান্দা আছে। কিংবা এও হতে পারে ওদের কোনো উদ্দেশ্যই নেই।'

'না মশাই, ভাবিয়ে তুললেন।'

'আপনাদের তো এমনিতেই ভাবনাচিন্তার অবধি নেই। সর্বদাই নানারকম সমস্যার মোকাবিলা করছেন। বড়ো কোম্পানি হলে যা হয় আর কি। তাই আমি ভাবলাম, বলাইবাবুর মতো একজন মহান মানুষকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। বিশেষ করে এখন হয়তো আপনি ত্রিশ-বত্রিশ কোটি টাকার একটা ডিল নিয়ে ভারি ভাবনায় আছেন, হয়তো বড়ো বড়ো নানা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন, হয়তো দু-তিনটে শত্রু কোম্পানি আপনাকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সবসময়ে যাকে এতসব সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় তার কি এসব ছোটোখাটো ব্যাপারে নজর থাকে!'

'দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। ত্রিশ-বত্রিশ কোটি টাকার ডিলের কথা আপনি জানলেন কী করে, এবং আর যা যা বললেন সেগুলোও তো খুব একটা আন্দাজে ঢিল ছোড়া নয়। ধর্মদাসবাবু, আপনি আসলে কে বলুন তো?'

'আজ্ঞে আমি একজন হোমিয়োপ্যাথ এবং জ্যোতিষী, বলিনি আপনাকে?'

'বলেছেন, কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'আমাকে বিশ্বাস করা উচিতও নয়। আমি প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও মিথ্যে কথা বলে থাকি। তবে কিনা মিথ্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে সত্যি কথাও ঢুকে যায়। চালে কাঁকড়ের মতোই আর কি! যেগুলো বেছে বের করা মুশকিল।'

'আপনি কী চান স্পষ্ট করে বলবেন?'

'ওরে বাপ রে! আপনার কাছে চাইবার মতো মুখ বা যোগ্যতা কোনোটাই কি আমার আছে? জানি, আপনি এক মহান মানুষ। চাইলেই দিয়ে ফেলবেন। কিন্তু দেখুন, চাওয়ার

জন্যও বুকের পাটা লাগে। আমাদের মতো নগণ্য মানুষের তো ওটারই অভাব কিনা।'

'নগণ্য কিনা জানি না, তবে আপনি অতি বিপজ্জনক লোক।'

'কী যে বলেন বলাইবাবু! বিপজ্জনক হতে গেলেও কিছু এলেম চাই। আমাকে তো বাড়ির বেড়ালটাও গ্রাহ্য করে না। সংসারে আমার কোনো সম্মান নেই। ছেলেপুলেদের শাসন করার মতো ব্যক্তিত্ব নেই। আর সেইজন্যই দেখুন না, ছেলেটাকে কত করে বললাম, ওরে, চাকরি-বাকরির যা বাজার, একটা লাইন ধর। তা সে বাপের কথা গ্রাহ্যই করল না।'

'ছেলে বেকার বুঝি!'

'বেকার বলে বেকার! বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে।'

'কী পাশ করেছে বলুন তো?'

'সে আর বলবেন না। টেনেমেনে ইংরেজিতে এম.এ. করেছে। আর একটু কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আর কি!'

'ঠিক আছে, কাল সকাল দশটায় সে যেন আমার অফিসে গিয়ে দেখা করে।'

'না, না, সেটা কি উচিত কাজ হবে? আপনি ব্যস্ত মানুষ।'

'আপনি কি জানেন যে, আপনি অতি ঘোড়েল লোক!'

'কেউ কেউ বলে বটে কথাটা। ভাবি বড়ো বড়ো ঘোড়েলদের তুলনায় আমি তো নস্যি। চারদিকে চেয়ে দেখুন না, ঘোড়েলদের কী রমরমা, ঘোড়েলরাই দেশ চালাচ্ছে, তারাই ব্যাবসাবাণিজ্য সামলাচ্ছে, তারাই পাঁচজনের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। উঁচু জাতের ঘোড়েল হলেও নাহয় কথা ছিল।'

'বুঝেছি, আর আত্মগ্লানিতে ভুগবেন না ধর্মদাসবাবু। আপনার ছেলের চাকরিটা হয়ে যাবে।'

'আপনি মহান মানুষ বলাইবাবু।'

'যে আজ্ঞে ধর্মদাসবাবু।'

জকপুরের হাটে

নটবর সাউ সন্ধে লাগতেই দোকান বন্ধ করে হাট করতে বেরিয়ে পড়ল। শেষ হাটে জিনিসপত্র বেজায় সস্তায় পাওয়া যায়। দোকানিরা ঝপাঝপ মাল বেচে হালকা হয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন।

জকপুরের হাট বেশি দূরেও নয়। আকন্দপুরের খালটা যেখানে মাওবেড়ের দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে শিবতলার মাঠে বিরাট জায়গা জুড়ে হাট। হ্যাজাক, টেমি, কারবাইডের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে যেন। কেউ কেউ দোকান গুটিয়ে ফেলেছে, কেউ কেউ গোটাচ্ছে আবার কোথাও রমরম করে বিকিকিনি চলছে।

ব্যাপারীরা বেশিরভাগই নটবরের মুখ চেনা। এই যেমন রায়দিঘির বিখ্যাত বেগুন নিয়ে আসে মুকুন্দ পাল, সোনার গাঁয়ের ফুলকপি নিয়ে বসে শিবু গায়েন, চণ্ডীগড়ের বড়ো বড়ো লাল মুলো বেচতে আসে হারান দাস। নটবরের অবশ্য আজ অন্য দরকারেও আসা। হাটের পশ্চিম ধারে এক বুড়োমতো মানুষকে মাঝে মাঝে টেমি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। তার লম্বা সাদা দাড়ি, বিশাল গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া সাদা চুল। বয়স হেসেখেলে অন্তত পঁচাশি হবে। মুখখানার চামড়ায় অনেক ভাঁজ, মাথায় একটা সাদা টুপিও থাকে। মাঝে মাঝে গায়ে লাল রঙের কাপড় জুড়ে তৈরি একটা জোব্বা মতো। এই সাংঘাতিক শীতে খোলা মাঠের দিকে বসে বুড়ো কিছু পুঁথি-পুস্তক বিক্রি করতে বসে থাকে। গাঁয়ের লোক বই-টই বেশি পড়ে না। তাই বুড়োর বিক্রিবাট্টাও নেই। তবুও বুড়ো বসে থাকে।

সেবার হাটে এসে কৌতূহলের বশে নটবর তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল, বিচিত্র সব নাম-'মহাকাশের হাতছানি', 'পৃথিবীতে আজব মানুষের আগমন', 'সহজ উড়ন শিক্ষা', 'জাদুবলে রোগআরোগ্য', 'দ্রব্যগুণের সাহায্যে গগনে বিহার'।

সবই বুজরুকি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৌতূহল এক সাংঘাতিক ব্যাপার, ঝোঁক চাপলে মাথাটা যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে যায়। নটবর কেনাকাটা সেরে বুড়োর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। টেমির আলোয় ম্লান পুরোনো বইগুলো হলদেটে দেখাচ্ছে। বুড়ো শীতে জবুথবু হয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বই-টই আগের দিনই দেখে পছন্দ করে রেখেছিল নটবর-'সহজ ভূত নামাইবার কৌশল'।

'ও দাদু!'

বুড়ো চোখ চেয়ে নটবরকে দেখে বেজার মুখে বলে, 'কী চাই?'

'এই বইখানা কত দাম?'

'এক টাকা।'

'বইতে যা লেখা তাতে কাজ হয়?'

'কে জানে বাবু, আমি তো পরখ করিনি?'

'কাজ না হলে বই ফেরত দেব কিন্তু?'

'না বাবু, ওসব ফেরত-টেরত হবে না। নিলে নাও, না নিলে পথ দেখো।'

'আহা, এসব তো বুজরুকিও হতে পারে?'

'তা হতে পারে!'

নটবর একখানা টাকা ঠকাং করে ফেলে বইখানা তুলে নিল। গেল একখানা টাকা। তা আর কী করা যাবে!

বইখানা পকেটে পুরে নটবর বাড়ি রওনা হল।

না, ভূতে নটবরের বিশ্বাস নেই। সে ভূত-টুত মানে না। এই নিয়ে বন্ধু ভজহরির সঙ্গে তার প্রায়ই তর্ক হয়। ভজহরি আবার ঘোরতর ভূতে বিশ্বাসী। প্রায়ই বলে, 'এখন মানছ না, কিন্তু একদিন ঠেলায় পড়ে মানবে।'

ভূত না মানলেও কৌতূহলকে তো আর ঠেকানো যায় না।

আজ বড়োই শীত পড়েছে। তার গ্রাম শামুকখোলা একটু দূরেই। ভারী থলি দু-খানা দু-হাতে ঝুলিয়ে যথাসাধ্য জোরেই হাঁটছে নটবর। কুয়াশায় পথঘাট আবছা, তবে একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্না থাকায় তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। রথতলা ছাড়িয়ে আমবাগানের পাশের রাস্তায় সবে পা দিয়েছে-এমন সময় একটা লোক পিছন থেকে তার পাশাপাশি এসে পড়ল।

লোকটা বলে উঠল, 'শামুকখোলা যাচ্ছেন নাকি মশাই?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো ভালো। তা হাটে আজ কেমন কেনাকাটা হল?'

'এই টুকিটাকি।'

'মুলো, বেগুন সব পেলেন?'

'তা পেলাম।'

'বেশ বেশ।'

'তা আপনি কোন দিকে?'

'এই একটু বিষয় কার্যে এসে পড়েছিলাম এই দিকে। তা আর কী কিনলেন?'

'এই ঘরগেরস্থের টুকিটাকি জিনিস।'

লোকটা হেসে বলল, 'আছে কিন্তু।'

'কী আছে?'

'ওই যা বলছিলাম আর কি। আচ্ছা মশাই আসি, এই ডানহাতি আমার রাস্তা।'

নটবর ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারল না। উটকো লোকটা যে কোথা থেকে উদয় হল, কোথায় অস্ত গেল কে জানে!

সামনেই বাঁ-ধারে কপালী দিঘি। চারধারে গাছগাছালি। দিঘির কোল ঘেঁষে রাস্তাটা পেরোনোর সময় হঠাৎ নটবরের মনে হল সামনের ঘাটে কে যেন চান করছে। এই শীতের রাতে ঠান্ডা জলে চান করে কে?

ঘাটের কাছে পৌঁছে দেখল চান করে একটা মোটাসোটা লোক উঠে এল। গামছা নিংড়োতে নিংড়োতে বলল, 'হাটে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আপনি এই শীতের রাতে চান করছিলেন যে?'

'চান না করলে শরীরটা বড়ো ম্যাজম্যাজ করে। সারা দিনে আমি বার পঁচিশেক চান করি কিনা!'

'বলেন কী? ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবে যে?'

লোকটা একটু হেসে বলে, 'আরে না, নিউমোনিয়া কি আর সকলের হয়! তা হাটে কী কী পেলেন?'

'এই একটু শীতের শাকপাতা।'

'শুধু শাকপাতা?'

'আর এই টুকিটাকি।'

'শুধু টুকিটাকি?'

'এই সামান্য জিনিসপত্তর।'

লোকটা গা মুছতে মুছতে বলল, 'তা বলে ভাববেন না যে নেই।'

'কী ভাবব না?'

'এখনও আছে, অনেক আছে। যাই আর একবার ডুব দিয়ে আসি।'

লোকটা ফের জলে নেমে গেল দেখে নটবর হাঁ! আচ্ছা পাগল তো!

গাঁয়ের কাছ বরাবর চলে এসেছে নটবর। জটেশ্বরের খালের সাঁকোটা পেরোলেই গাঁয়ের সীমানায় ঢুকে পড়বে।

সাঁকোতে পা দিতেই নটবর দেখতে পেল সাঁকোর মাঝ বরাবর বাঁশের রেলিং-এ হাতে ভর রেখে একটা লোক ঝুঁকে জলের দিকে চেয়ে আছে। নটবর সাঁকোতে উঠতেই 'মচাৎ' করে শব্দ হওয়ায় লোকটা ফিরে তাকাল। চেনা মানুষ নয়।

'নটবর নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'হাট করে ফিরলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?'

'মাছ ধরছি।'

'মাছ ধরছেন।' বলে নটবর হাঁ হয়ে গেল। সাঁকোর ওপর থেকে এই রাত্তিরে মাছ ধরা যায় বলে সে জন্মে শোনেনি। হেসে বলল, 'কীভাবে ধরছেন? মন্তর দিয়ে নাকি?'

'না ছিপ দিয়ে। দেখবেন?'

লোকটার হাতে যে ছিপ রয়েছে সেটা এতক্ষণ লক্ষ করেনি নটবর। এবার করল। লোকটা ডান হাতের ছিপটা হঠাৎ 'ছপাৎ' করে ওপরে তুলতেই দেখা গেল বঁড়শিতে বেশ বড়োসড়ো একটা মাছ লাফঝাঁপ করছে। তাজ্জব ব্যাপার!

'দেখলেন তো নটবরবাবু?'

'দেখলাম। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার।'

'না না, এ আর বিস্ময়ের কী? তা হাটে যা খুঁজতে গিয়েছিলেন তা পেলেন?'

'তা পেলাম, শীতের শাকসবজি আর কি।'

'উঁহু, ওসব নয়। আর যা খুঁজতে গিয়েছিলেন!'

'এই টুকিটাকি সব জিনিসপত্র। ঘরগেরস্থালিতে তো কত কিছুই লাগে!'

'সে আমি জানি। কিন্তু সে সব ছাড়া আর কিছু?'

'না, আর বিশেষ কী?'

'কী যে বলেন নটবরবাবু! যাকগে, কথাটা হল-ওসব নিয়ে বেশি মাথা না ঘামানোই ভালো।'

'কী সব নিয়ে! কীসের কথা বলছেন?'

'বলছিলাম কী, দু-তরফ নিজের নিজের মতো করে আছে। কাজ কী বলুন অন্য তরফের তল্লাশ নিতে যাওয়ার। ওতে অন্য তরফের অসুবিধে হয় কিনা।'

দুই তরফ! নটবর হঠাৎ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কোন তরফের কথা বলতে চাইছে লোকটা!

'আচ্ছা আসি নটবরবাবু!' বলে লোকটা হনহন করে তার পাশ কাটিয়ে উলটো দিকে চলে গেল। তাকে ভেদ করেই গেল যেন! কিন্তু নটবরের গায়ে একটু ছায়াও লাগল না। হঠাৎ নটবরের গা শিউরে উঠল।

'বাপরে!' বলে বাজারের থলি ফেলে নটবর প্রাণপণে ছুটতে লাগল। পড়ি-কি-মরি অবস্থা।

পরদিন সে ভজহরিকে গিয়ে বইখানা দান করে বলল, 'আছে রে ভাই আছে।'

ভজহরি একগাল হেসে বলল, 'বলেছিলাম কি না!'

গ্রহান্তরে

জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বরুণবাবুর। সকাল থেকে গভীর রাত্রি অবধি খেটেখুটে যা আয় হয় তাতেও সংসারটা ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না। বাড়িতে নিত্য খিটিমিটি লেগেই আছে। ছেলেপুলেগুলো ঠিকমতো মানুষ হচ্ছে না। বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়ার জন্য চোখ রাঙাচ্ছে। চাকরির জীবন প্রায় শেষ হয়ে এল। আয়ুও কি আর বেশিদিন আছে। বরুণবাবুর খুব ইচ্ছে করে সংসারের ঝামেলা থেকে বিদায় নিয়ে কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে। তিনি টের পাচ্ছেন সংসারের ওপর তাঁর আর কোনো টান বা মোহ নেই। সারাদিনের শেষে বাড়ি ফিরতেও তাঁর ইচ্ছে করে না।

দূরের একটা টিউশনি সেরে শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরছিলেন বরুণবাবু। মনটা বড়োই খারাপ। বুড়ো হতে চললেন, অথচ জীবনে একটা দিনও সুখে বা শান্তিতে কাটিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। নিজের ওপর, সংসারের ওপর, গোটা দুনিয়ার ওপর তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে।

ট্রাম ফাঁকা। একেবারেই ফাঁকা। শুধু আর একটা লোক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সামনের সিটে বসা। আর কেউ নেই।

হঠাৎ লোকটা ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কেমন আছেন বরুণবাবু?'

আর যাই হোক বরুণবাবুর স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। লোকটা রীতিমতো সুপুরুষ, বয়সও কম, চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু লোকটাকে বরুণবাবু কিছুতেই চিনতে পারলেন না।

ভদ্রতা করে বললেন, 'চলে যাচ্ছে কোনোরকমে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক-'

লোকটা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল, 'চিনতে পারছেন না তো! চেনার কথাও নয়। আপনি জীবনে এই প্রথম আমাকে দেখছেন।'

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'তাহলে-'

লোকটা বলল, 'আমিও আপনাকে চিনতাম না। এই ট্রামেই আমাদের প্রথম দেখা হল।'

'তাহলে আমার নামটা জানলেন কী করে?'

লোকটা তেমনি হাসি হাসি মুখে বলে, 'সেটাও শক্ত কিছু নয়। চেষ্টা করলেই পারা যায়। আপনি যে বরুণ সরকার সেটা অহরহ তো আপনার মনের মধ্যে ভুরভুরি কাটছেই। সেই স্পন্দনটা ধরতে পারলেই হল।'

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'অ্যাঁ! স্পন্দন ধরতে পারলেই হল! সেটাই কি খুব সহজ কাজ?'

লোকটি হেসে বলল, 'চেষ্টা করলেই সহজ। অভ্যাসে কী না হয় বলুন।'

'আপনি কি থট-রিডার?'

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কথাটা মন্দ বলেননি। ওরকমই ধরে নিতে পারেন।'

বরুণবাবু একটু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা আমি এখন কী ভাবছি তা বলতে পারেন?'

'পারি। আপনি আমার সম্পর্কে ভাবছেন, হুঁ-হুঁ বাবা তুমি একখানি আস্ত বুজরুক।'

'ও বাবা! আপনি তো সাংঘাতিক লোক দেখছি!'

'বললাম তো অভ্যাসে সব হয়। এইমাত্র আপনি ফুলকপির পোড়ের ভাজা আর সোনা মুগডালের কথা ভাবলেন ... এইমাত্র ভাবলেন আপনার চলে-যাওয়া ছেলে ছোটকুর কথা ... এইমাত্র ভাবলেন ...'

'থাক থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ঠিকানাটা একটু দিন তো। সময় করে আপনার সঙ্গে একদিন বসতে হবে। আপনি যখন এত জানেন তখন আপনার কাছ থেকে কিছু জেনে নিতে হবে। কোথায় থাকেন আপনি?'

লোকটা মিটিমিটি হাসল, 'আমার ঠিকানা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। আমি অনেক দূরে থাকি। যদি যেতে চান তো আমিই নিয়ে যাব আপনাকে।'

'কলকাতা শহরটা আমি টিউশনি করে হাতের তেলোর মতো চিনি। এই তো খিদিরপুর থেকে ফিরছি।'

'কলকাতা চিনলে তো হবে না। আমি যে অনেক দূরের লোক।'

'কত দূরের?'

'আপনাদের হিসেবে অন্তত আড়াই হাজার লাইট ইয়ার।'

'দূর মশাই, আপনি এবার গুল মারতে শুরু করেছেন। ঠিক আছে ঠিকানা না হয় না-ই বললেন, দেখা তো হতে পারে আমাদের।'

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, 'আমি এই সামনে ময়দানে নেমে যাব। আর দেখা হওয়ার সুবিধে নেই।'

'ময়দানে নামবেন! সেখানে কী আছে?'

'সেই কথাই তো বলতে চাইছি। আপনার তো আর সংসার-টংসার ভালো লাগছে না, তাই না?'

'আজ্ঞে না।'

'বেঁচে থাকার আনন্দটাই আর তেমন টের পাচ্ছেন না!'

'না। কিন্তু-'

'দাঁড়ান। আমি সব জানি। আপনাকে তাই একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। বেশ চটপট জবাব দেবেন।'

'আজ্ঞে সে আর বলতে!'

'ধরুন যদি আমি আপনার বয়স কমিয়ে দিই, যদি অমর করে দিই, শরীরটা যদি সুস্থ করে দিই, তাহলে কেমন হয়?'

'ঃউ মশাই, এ তো স্বপ্নের কথা বলছেন।'

'স্বপ্ন নয়। সত্যি। আমরা ময়দানে পৌঁছে গেছি। শুভস্য শীঘ্রম। নেমে পড়ুন।'

বরুণবাবু একটু দ্বিধা করলেন। নামিয়ে ছিনতাই করবে না তো!

লোকটা বলল, 'আপনার পকেটে ছ-টাকা পঁচাত্তর পয়সা আছে। হাতঘড়িটা পুরোনো, ওটা বেচলে পঁচিশ টাকাও পাওয়া যাবে না। জীবন তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। নেমে পড়ুন।'

বরুণবাবু নেমে পড়লেন। লোকটা আজগুবি কথা বলছে বটে, কিন্তু একবার এই গুলবাজকে একটু বাজিয়েই দেখা যাক না।

ময়দানে বেশ ঘোর অন্ধকার। কুয়াশা চেপে পড়েছে। লোকটা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মতো একখানা জিনিস বের করে বোতাম টিপতেই

সামনে একখান ডিমের মতো দেখতে মোটরগাড়ির মতো জিনিস দেখা গেল। একখানা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির চেয়ে বেশি বড়ো নয়।

বরুণবাবু সভয়ে বললেন, 'এটা কী?'

'আমরা বলি মনোরথ। আলোর গতির চেয়ে মনের গতি অনেক বেশি। এক লহমায় কোটি কোটি লাইট ইয়ার পেরিয়ে যেতে পারে। আমাদের এ গাড়িও তাই।'

'বলেন কী মশাই! ইয়ার্কি মারছেন না তো!'

'ইয়ার্কি হলে না হয় কান মলে দেবেন। আসুন।'

লোকটা কলকাঠি নেড়ে একটা দরজা খুলল। ভিতরে বিশেষ যন্ত্রপাতি দেখা গেল না। বসার জন্য বেশ আরামদায়ক গদি আছে। শীত বা গরম কিছুই লাগছে না।'

'বরুণবাবু, আপনার খিদে পায়নি তো?'

'আজ্ঞে না।'

'পেলেও একটু চেপে রাখুন। একেবারে পৌঁছে খাবারের ব্যবস্থা হবে।'

বরুণবাবু দুশ্চিন্তায় একটু ঘামতে লাগলেন।

কোনো ঝাঁকুনি লাগল না, শব্দও হল না। তবে শরীরটা হঠাৎ খুব হালকা লাগতে লাগল বরুণবাবুর। লোকটা মুখোমুখি বসে হাতের ছোট্ট যন্ত্রটা নিয়ে কী সব যেন করছে।

বরুণবাবু বাইরের দিকে চাইলেন। যা দেখলেন তাতে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। ঘোর অন্ধকার আকাশে বিশাল বড়ো বড়ো সব সূর্য দেখা যাচ্ছে, সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

লোকটা একটু হেসে বলল, 'আমরা এক সেকেন্ডেই পৌঁছে যেতে পারতাম। ইচ্ছে করেই একটু নীহারিকাটা পাক দিয়ে নিলাম। এসে গেছি।'

শরীরটা আবার স্বাভাবিক লাগল বরুণবাবুর। লোকটা দরজা খুলে বলল, 'আমাদের গ্রহ আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছে বরুণবাবু। আসুন।'

বরুণবাবু নামলেন। নেমেই টের পেলেন, পরিষ্কার বাতাসে তাঁর বুক ভরে গেল। অনেক তরতাজা লাগছে নিজেকে। চারদিকে চেয়ে দেখলেন, বাড়িঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটও নয়। চারদিকে শুধুই নিবিড় জঙ্গল। আকাশে দু-দুটো চাঁদ, তার আলোয় চারদিকটা জ্যোৎস্নায় একেবারে ভেসে যাচ্ছে। বিশাল বড়ো বড়ো গাছ যেন মেঘ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে মোটা মোটা লতা পাকিয়ে উঠেছে। সুন্দর ফুলের গন্ধে ম-ম করছে বাতাস।

বরুণবাবু বললেন, 'এ তো দেখছি শুধুই জঙ্গল।'

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, 'ওপরটা আমরা জঙ্গলের আবরণই রেখে দিয়েছি। তাতে আবহমণ্ডল সুস্থ থাকে। বন্যজন্তুরও অভাব নেই। আমরা থাকি ভূগর্ভে।'

'এখানে দেখছি শীত নেই।'

'না। শীত গ্রীষ্ম কিছুই নেই। সবসময়েই বসন্তকাল। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়।'

'এসব গাছপালা কি পৃথিবীর মতোই?'

'না। তবে তুলসী, নিম এরকম কিছু গাছ এখানেও পাবেন। আর সব অন্যরকম।'

'আচ্ছা, আমি তো পৃথিবী থেকে আসছি, আমার কোনো ইনফেকশানের ভয় নেই তো এখানে?'

লোকটা হাসল, 'না। কারণ মনোরথের মধ্যেই আপনাকে সূক্ষ্ম রশ্মি দিয়ে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। আর আমাদের এই গ্রহে কোনো ক্ষতিকারক জীবাণুই নেই। এখানে কারও কখনো কোনো অসুখ করে না।'

'কক্ষনো না?'

'না বরুণবাবু। আমরা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। আমাদের কোনো হাসপাতাল নেই। ওষুধ তৈরি হয় না।'

বরুণবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হলে?'

'তাও হয় না। আমার চল্লিশ হাজার তিনশো একানব্বই বছর বয়সে কখনো কোনো অসুখবিসুখ হয়নি।'

'অ্যাঁ! কত বললেন?'

'চল্লিশ হাজার তিনশো একানব্বই বছর, আপনাদের হিসেবে। আমাদের এখানে অবশ্য এক বছর আপনাদের সাড়ে তিনশো বছরের সমান।'

এই বলে লোকটা হাতের যন্ত্রটা টিপতেই পায়ের নীচে একটা আলোকিত সিঁড়ির মুখ খুলে গেল।

নীচে সারি সারি প্রকোষ্ঠ। লম্বা লম্বা হলঘর। করিডোর। চলন্ত সিঁড়ি। চলন্ত মেঝে। সব ঝকঝক তকতক করছে। কাচের আড়ালে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ নানা ধরনের অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে।

'আপনার নামটি কিন্তু আমাকে বলেননি স্যার।'

'আমার নাম ধৃতি। আসুন, এই ঘর।'

ঘরটা একটা কাচের বর্তুলাকাত চেম্বার। তাঁকে একখানা যন্ত্রের সামনে টুলের মতো জিনিসে বসিয়ে ধৃতি বলল, 'আপনার বয়সটা কমিয়ে দিচ্ছি। কত বছর বয়সে ফিরে যেতে চান?'

বরুণবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'পঁচিশ।'

'ঠিক আছে।' বলে ধৃতি একটা বোতাম টিপে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে চেম্বারের দরজাটা সেঁটে দিল।

কোনো শব্দ নেই, কম্পন নেই। অথচ বরুণবাবু টের পাচ্ছেন তাঁর শরীরের ভিতরে কী যেন একটা হয়ে যাচ্ছে। তিনি বদলে যাচ্ছেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর তিনি বুঝতে পারলেন, প্রক্রিয়াটা থেমে গেছে। সামনে একটা ঘষা কাচের পর্দায় বাংলা অক্ষরে এই ক-টা কথা ফুটে উঠল, 'অভিনন্দন। আপনি এখন পঁচিশ বছরের যুবক!'

বরুণবাবু যন্ত্রকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আবার যখন বুড়ো হব তখন ফের বয়স কমানো যাবে কি?'

পর্দায় ফুটে উঠল, 'আর কখনোই পঁচিশের বেশি বয়স হবে না আপনার। যেমন আছেন তেমনই চিরকাল থাকবেন।'

'চিরকাল বলতে?'

'চিরকাল বলতে চিরকাল। ইটারনিটি।'

'উরেব্বাস। তাহলে কতদিন বাঁচব?'

'চিরকাল।'

'হার্ট অ্যাটাক, ব্লাড প্রেশার, স্ট্রোক এসব হবে না?'

'কস্মিনকালেও নয়।'

'খুব রিচ খাবার খেলেও নয়?'

'খাবার কেন খাবেন?'

'খাব না?'

'না। আপনার আর কখনো খিদেই হবে না।'

'বলেন কী?'

'খিদে হবে না, ঘুম পাবে না, ক্লান্তি আসবে না।'

'বটে! তাই তো আমার খিদের ভাবটা আর টের পাচ্ছি না, না?'

'কখনো পাবেন না।'

'তাহলে পুষ্টি হবে কী করে?'

'শরীরের ক্ষয় না হলে পূরণেরই বা কী প্রয়োজন?'

'আচ্ছা জলতেষ্টা পাবে তো?'

'কেন পাবে?'

'বাথরুমও তো পাবে, তখন শরীরের জল বেরিয়ে যাবে না?'

'বাথরুমও পাবে না।'

'বড়ো বাইরে বা ছোটো বাইরে কোনোটাই নয়?'

'না।'

'ব্যায়াম করার দরকার আছে কি?'

'করতে পারেন, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ নেই।'

'আচ্ছা ধরুন কেউ যদি আমাকে গুলি করে, কি ছোরা মারে বা আমি যদি আগুনে পুড়ে যাই তাহলেও মরব না?'

'না। আমাদের বায়োনিক ল্যাবরেটরির অটোমেটিক মেশিন আবার আপনার সব কিছু নতুন করে দেবে। আপনি কিছুতেই মারা যেতে পারবেন না এখানে।'

'ব্যথা তো লাগবে।'

'তাও লাগবে না। ব্যথার স্নায়ু এখানে আনন্দের তরঙ্গ তোলে, ব্যথার নয়।'

'ওরে বাবা! এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড দেখছি!'

'কিছুই সাংঘাতিক নয়। খুব সোজা ব্যাপার।'

'আমি কিন্তু ঘুমকাতুরে মানুষ।'

'শুয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ঘুমোনো অসম্ভব।'

'আর একটা কথা। পৃথিবীতে আমার বউ আর ছেলেপুলে, আত্মীয় আর বন্ধুবান্ধবেরা আছে, তাদের কথা তো আমার মনে পড়বে!'

'পড়বে। স্মৃতিঘর বলে একটা চেম্বার আছে। সেখানে গিয়ে আপনি ইচ্ছে করলে যেকোনো স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারবেন। আবার যেকোনো স্মৃতিকে জাগিয়েও তুলতে পারবেন। আপনার যা ইচ্ছা।'

'মন যদি খারাপ হয়?'

'এখানে মন খারাপ হয় না। পাশেই আনন্দঘর আছে। সেখানে গিয়ে আনন্দের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে নেবেন, তাহলেই হবে।'

'সবসময়ে আনন্দে থাকতে পারব?'

'অবশ্যই।'

এ সময়ে দরজা খুলে ধৃতি ঘরে ঢুকল। বলল, 'বাঃ, এই তো যুবক হয়ে গেছেন।'

'আচ্ছা, আমি যদি আর একটু সুপুরুষ হতে চাই?'

'কোনো বাধা নেই। আসুন।'

এরপর ধৃতি তাঁকে বিভিন্ন ঘরে নিয়ে গিয়ে সুপুরুষ করে দিল। আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। পৃথিবীর স্মৃতি খানিকটা আবছা করে দিল।

সব হয়ে যাওয়ার পর বরুণবাবু বললেন, 'এবার কী হবে ধৃতি?'

'এখানে তো কিছুই হয় না।'

'একটা কাজ-টাজ কিছু দেবে না?'

'কাজ অনেক আছে। সেগুলো সবই যন্ত্র-মানুষেরা করে। ইচ্ছে করলে আপনিও করতে পারেন।'

'কিন্তু আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিং জানি না।'

'চিন্তা নেই।' বলে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মস্তিষ্ক চালু করা হল বরুণবাবুর। তিনি দিব্যি কলকব্জার ব্যাপার বুঝতে শুরু করলেন।

'যদি ডাক্তার হতে চাই?'

'তাও পারেন।'

'কবি?'

'তাও।'

'নাঃ, এ যে দেখছি সব পেয়েছির দেশ। এখানকার মানুষেরা তাহলে বেশ আরামেই আছে বলো! তোফা আছে!'

'মানুষ! এখানে মানুষই নেই।'

'ওই যে কতজনকে দেখছি। কাজ-টাজ করছে।'

'কেউ মানুষ নয়। সব যন্ত্রের তৈরি।'

বরুণবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'বলো কী হে। মানুষ কি তাহলে তুমি একা! অ্যাঁ!'

ধৃতি একটু হেসে বলল, 'তাও নই।'

'মানে?'

'আমিও মানুষ নই বরুণবাবু। যন্ত্র মাত্র। এই গ্রহে বহু লক্ষ বছর কোনো মানুষ নেই। একসময়ে ছিল। তারা আমাদের হাতে এই গ্রহ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য গ্রহে, নীহারিকার ওপাশে অন্য নীহারিকায় চলে গেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আমাদের একজন মানুষ বড়ো দরকার ছিল। তাই আপনাকে আনা।'

'অ্যাঁ!'

'ভয় পেলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, আমার যে ভয় হচ্ছে।'

'ওই একটা জিনিসকেই আমরা জানতে চাই। ভয়। মানুষের ভয়কে আমরা জয় করতে পারিনি। কেন পারিনি তা জানার জন্যই আপনাকে আনা।'

বরুণবাবু হঠাৎ বিকট গলায় বললেন, 'তাহলে কি এই গ্রহে আমি একা একটা মানুষ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওরে বাবা রে! আমি কিছুতেই এখানে থাকব না ... কিছুতেই না ... ও ভাই ধৃতি, শীগগির আমাকে আমার নোংরা পৃথিবীতেই দিয়ে এসো। রোগ-ভোগ বয়স মৃত্যু ওসব নিয়েই আমি থাকতে চাই ... ও ভাই ধৃতি, তোমার পায়ে পড়ি ...'

'এসপ্ল্যানেড আ গয়া বাবু। উঠিয়ে।'

পটাং করে চোখ মেললেন বরুণবাবু। ট্রাম এসপ্ল্যানেডে এসে গেছে। চোখ কচলে তিনি চারদিকে চাইলেন। যা দেখছেন তা অতি সত্য। এ কলকাতাই বটে। তিনি পৃথিবীতেই আছেন।

মস্ত একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন তিনি। নেমে পড়লেন। মনটায় বড়ো আনন্দ হচ্ছে।

শ্যামবাজারমুখো একখানা বাসে উঠে দেখলেন, বেশ লোকজন আছে। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই আনন্দের চোটে বললেন, 'খুব বাঁচা বেঁচে গেছি মশাই।'

লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

কৃপণ

কদম্ববাবু মানুষটা যতটা না গরিব তার চেয়েও ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চণ্ডীপাঠ করেন কি না কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন তা সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তাঁর জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, 'এটা তো জুতো নয়, জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে।' বাস্তবিকই জুতো জোড়া এত ছেঁড়া আর তাপ্পি-মারা যে, সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুনছুঁচ আর খানিকটা সুতো জোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পারা যায় তাহলে ছাতাই বা পারা যাবে না কেন? সুতরাং ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও নিজেই সারাতে বসে গেলেন। এর পর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটোখাটো দর্জির কাজ সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তাঁর বউ আর ছেলে-মেয়েরা তাঁর এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায় লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যতরকম পন্থা আছে সবই তাঁর মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি-চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তাঁর বউ আর ছেলে-মেয়েরা করে নেয়।

ছোটো ছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর কৌটো ছ্যাঁদা করে

তার মধ্যে একটা ডান্ডা গলিয়ে লাটাই হল। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবুর পয়সা বেঁচে গেল।

এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরোনো বাড়ির রকে উঠে ঝুলবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পিছনে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতো লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, 'এই যে শ্যামবাবু! এসে গেছেন তাহলে? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।'

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, 'আমি তো শ্যামবাবু নই।'

'না হলেই-বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে! দেরি হলেই কুরুক্ষেত্তর করবেন। এই কি রঙ্গরসিকতার সময়? আসুন, আসুন।'

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, 'আমি তো দাবা খেলতে জানি না।'

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সব সময়ে কি রসিকতা করতে হয়?'

ভিতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এইসব পুরোনো বনেদি বাড়িতে তিনি কখনো ঢোকেননি। যেদিকে তাকান চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুল লোক ভেবে এ বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে এ কথাটা ভালো করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেওয়ালগিরির ...

ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, 'ঃএ শ্যামবাবু, এই ছেঁড়া তাপ্পি দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামি জাপানি ছাতাখানার কী হল?'

কদম্ববাবু শুধু হতভম্বের মতো বললেন, 'জাপানি ছাতা?'

লোকটা হঠাৎ তাঁর পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, 'আপনার মতো শৌখিন মানুষ কটা আছে বলুন।'

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপসপ করছিল। কদম্ববাবু জুতো জোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতো জোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, 'সেই সোনালি সুতোর কাজ-করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?'

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে, তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণেরা টেরই পায় না যে, তারা কৃপণ। তারা ভাবে যে তারা যা করছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারি লজ্জা পেলেন তিনি। এমনকী তিনি যে শ্যামবাবু নন এ কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন, 'বর্ষাকাল বলে নাগরা জোড়া পরিনি।'

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলল, 'যার দেড়শো জোড়া জুতো সে আবার সামান্য নাগরার মায়া করবে এটা কি ভাবা যায়? শ্যামবাবু ছেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল!'

কদম্ববাবু এ কথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরনে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না।

যেন তাঁর মনের কথাটি টের পেয়েই লোকটা হঠাৎ বলে উঠল, 'নাঃ, আজ বোধ হয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন শ্যামবাবু। তা ভালো। বড়োলোকদেরও কি আর মাঝে মাঝে গরিব সাজতে ইচ্ছে যায় না! নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালি-মারা জামা, পরনে হেঁটো ধুতি হয় কী করে!'

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, 'ঠিক ধরেছেন বটে।'

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরদালানেরও কী শ্রী! দু-ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং, পায়ের নীচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড়ো একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তবে শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

দু-ধারে সারি সারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক-একটা ঝাড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও

হয় কমপক্ষে ...

নাঃ, কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখানা ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!'

কদম্ববাবু হে-হে করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন।

সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ সিঁড়িতে পা রাখতেও তাঁর লজ্জা করছিল।

দোতলায় উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রূপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রুপো। রুপোর ফুলদানি, রুপোর ফুলের টব, রুপোর টেবিল, রুপোর চেয়ার, দেয়ালে রুপোর বাঁধানো বড়ো বড়ো ফটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকি হেসে বলল, 'হল কী শ্যামবাবুর? অ্যাঁ! এ বাড়ি কি আপনার অচেনা? রুপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? কর্তাবাবু যে সোনামহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে থেকে হেদিয়ে পড়লেন! আসুন তাড়াতাড়ি।'

সোনামহল্লা! কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপো মহলেই যে লাখো লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে।

কিংখাবের একটা পর্দা সরিয়ে লোকটা বলল, 'যান ঢুকে পড়ুন।'

কদম্ববাবু কাঁপতে কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লার সব কিছুই সোনার। এমনকী পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওলা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানি, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তা-ই জানা ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝখানে একটা নীচু সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটা সোনায় বাঁধানো আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন তাঁকে নজরেই পড়েনি তাঁর।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, 'এই যে শ্যামকান্ত! এসো।'

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোর আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে সেটা যে শুধু সোনা দিয়ে তৈরি তা-ই নয়, প্রত্যেকটা খোপে আবার হিরে, মুক্তো, চুনি আর পান্না বসানো। একধারে সোনার ঘুঁটি, অন্যধারে রুপোর। প্রত্যেকটা ঘুঁটির মাথায় আবার এক কুঁচি করে হিরে বসানো।

'বসো, বসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা। এই হল আমার বাজি।'

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সর ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সর মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এত বড়ো হয় তা জানা ছিল না তাঁর।

'তুমি কি বাজি রাখবে শ্যামবাবু?'

কদম্ববাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'আমি গরিব মানুষ, কী আর বাজি রাখব বলুন।'

কর্তাবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাঃ-হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, 'গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয় সে আবার কেমন গরিব?'

'আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন!'

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সে কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।'

টাকার ওপর ঘেন্না! কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

কর্তাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আজ সকালে মনটা খুব খারাপ ছিল। কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। কী করলাম জান? দশ লক্ষ টাকার নোট আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলাম।'

'অ্যাঁ?'

'শুধু কি তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুড়ে ছুড়ে কাক তাড়ালাম। তাতে একটু মনটা ভালো হল। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হিরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলাম।'

কদম্ববাবু দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে নিজেকে সামাল দিলেন। লোকটা বলে কী?

কর্তাবাবু বললেন, 'এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজি রাখবে বললে না?'

কদম্ববাবু মুখটা কাঁচুমাচু করে ভাবতে লাগলেন।

কর্তাবাবু নিজেই বললেন, 'টাকাপয়সা হিরে জহরত তো আমার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।'

কলম! কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন। মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ান্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উলটোদিকে।

কিন্তু চাল? দাবার যে কিছুই জানেন না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, 'সাবাস!'

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেললেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে! অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! আমি যে মাত!'

তারপরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে, কদম্ববাবুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখও বুজে ফেললেন।

যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেওয়ালগিরি? কোথায় আসবাবপত্র? এ যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ভাঙা সোঁদা একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে বসে আছেন তিনি! চারদিকে চুন বালি খসে ডাঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল! ইঁদুর দৌড়োচ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন।

সেই বাড়িরই এমন দৃশ্য কে বিশ্বাস করবে? মেঝের পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে ...

কদম্ববাবু পড়ি-কি-মরি করে ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে কোনোরকমে বাইরে দরজায় পৌঁছোলেন। দরজাটা অক্ষতই আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তাঁর ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবলেন, সত্যিই তো! টাকা বাঁচিয়ে হবেটা কী? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি!

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেললেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন দামি একজোড়া জুতো!

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্য কেনাকাটা করাটা ভালো দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নির জন্য শাড়ি আর ছেলে-মেয়েদের জন্য জামা-কাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল তাঁর।ঊ

মাঝি

জয়চাঁদ বিকেলের দিকে খবর পেল, তার মেয়ে কমলির বড়ো অসুখ, সে যেন আজই একবার গাঁয়ের বাড়িতে যায়।

খবরটা এনেছিল দিনু মণ্ডল, তার গাঁয়েরই লোক।

জয়চাঁদ তাড়াতাড়ি বড়ো সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে নিল। বুকটা বড়ো দুরদুর করছে। তার ওই একটিই মেয়ে, বড্ড আদরের। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। অসুখ হলে তাদের গাঁয়ে বড়ো বিপদের কথা। সেখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। ওষুধ বলতে কিছু পাওয়া যায় মুদির দোকানে, তাই মুদিই রোগের লক্ষণ শুনে ওষুধ দেয়। তাতেই যা হওয়ার হয়। কাজেই জয়চাঁদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

দুশ্চিন্তার আরও কারণ হল, আজ সকাল থেকেই দুর্যোগ চলছে। যেমন বাতাস তেমনি বৃষ্টি। এই দুর্যোগের দিনে সুন্দরবনের গাঁয়ে পৌঁছোনো খুবই কঠিন ব্যাপার।

দিনু মণ্ডল বলল, 'পৌঁছোতে পারবে না বলে ধরেই নাও। তবে বাস ধরে যদি ধামাখালি অবধি যাওয়া যায় তাহলে খানিকটা এগিয়ে থাকা হল। সকাল বেলায় নদী পেরিয়ে বেলাবেলি গাঁয়ে পৌঁছোনো যাবে।'

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, আজই পৌঁছোনোর চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটা আমার পথ চেয়ে আছে।'

জয়চাঁদ আর দিনু মণ্ডল দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার পথে একজন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকে মেয়ের রোগের লক্ষণ বলে কিছু ওষুধও নিয়ে নিল জয়চাঁদ। এরপর ভগবান ভরসা।

বৃষ্টির মধ্যেই বাস ধরল তারা। তবে এই বৃষ্টিতে গাড়ি মোটে চলতেই চায় না। দু-পা গিয়েই থামে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় বারবার। যত এসব হয় ততই জয়চাঁদ ধৈর্য হারিয়ে ছটফট করতে থাকে।

যে গাড়ি বিকেল পাঁচটায় ধামাখালি পৌঁছোনোর কথা তা পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত ন-টা বেজে গেল। ঝড়-বৃষ্টি আরও বেড়েছে। ঘাটের দিকে কোনো লোকজনই নেই। তবু ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে দু-জনে ঘাটে এসে দেখল, নৌকো বা ভটভটির নাম-গন্ধ নেই। নদীতে বড়ো বড়ো সাংঘাতিক ঢেউ উঠছে। বাতাসের বেগও প্রচণ্ড। উন্মাদ ছাড়া এই আবহাওয়ায় কেউ নদী পেরোবার কথা কল্পনাও করবে না এখন।

দিনু মণ্ডল বলল, 'চলো ভায়া, বাজারের কাছে আমার পিসতুতো ভাই থাকে, তার বাড়িতেই আজ রাতটা কাটাই গিয়ে।'

জয়চাঁদ রাজি হল না। বলল, 'তুমি যাও দিনুদাদা, আমি একটু দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

'পাগল নাকি? আজ নৌকো ছাড়লে উপায় আছে? তিন হাত যেতে না যেতে নৌকো উলটে তলিয়ে যাবে।'

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে। তুমি তোমার ভাইয়ের বাড়িতে জিরোও গিয়ে। আমি যদি কিছু করতে না পারি তাহলে একটু বাদে আমিও যাচ্ছি।'

দিনু মণ্ডল ফিরে গেল। জয়চাঁদ দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে। ছাতা হাওয়ায় উলটে গেছে অনেকক্ষণ। ঘাটে কোনো মাথা গোঁজার জায়গাও তেমন নেই। জয়চাঁদ বৃষ্টি-বাতাস উপেক্ষা করে ঘাটে বসে ভিজতে লাগল। মেয়ের কথা ভেবে কাঁদলও খানিক। কে জানে কেমন আছে মেয়েটা! ভগবানই ভরসা।

কতক্ষণ কেটেছে তা বলতে পারবে না জয়চাঁদ। সময়ের হিসেব তার মাথা থেকে উড়ে গেছে। বসে আছে তো বসেই আছে। ঝড়-বৃষ্টি একসময়ে প্রচণ্ড বেড়ে উঠল। এমন সাংঘাতিক যে জয়চাঁদ দু-বার বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেল। জলে-কাদায় মাখামাখি হল সর্বাঙ্গ।

সামনে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নদী। নদীতে শুধু পাঁচ-সাত হাত বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে। সত্যিই এই নদীতে দিশি নৌকো বা ভটভটি চলা অসম্ভব। জয়চাঁদ তবু যে বসে আছে তার কারণ, এই নদীর ওপাশে পৌঁছোলে আরও পাঁচ-সাত মাইল দূরে তার গাঁ। এখান থেকে সে যেন গাঁয়ের গন্ধ পাচ্ছে, মেয়েকে অনুভব করতে পারছে।

গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটু চমকে উঠল জয়চাঁদ। ভুল দেখল নাকি? অন্ধকারে নদীর সাদাটে বুকে ঢেউয়ের মাথায় একটা ডিঙি নৌকো নেচে উঠল না। চোখ

রগড়ে জয়চাঁদ ভালো করে চেয়ে দেখল। দুটো ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার পর এবার সে সত্যিই দেখল, একটা ঢেউয়ের মাথায় ছোট্ট একটু ডিঙি নৌকো ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। এ দুর্যোগে কেউ ডিঙি বাইবে এটা অসম্ভব! তবে এমন হতে পারে, ডিঙিটা কোনো ঘাটে বাঁধা ছিল, ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে বেওয়ারিশ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ জয়চাঁদের মাথায় একটা পাগলামি এল। সে একসময় ভালোই নৌকো বাইত। ডিঙিটা ধরে একবার চেষ্টা করবে? পারবে না ঠিক কথা, কিন্তু এভাবে বসে থাকারও মানে হয় না। ডিঙি নৌকো সহজে ডোবে না। একবার ভেসে পড়তে পারলে কে জানে কী হয়।

জয়চাঁদ তার ঝোলা ব্যাগটা ভালো করে কোমরে বেঁধে নিল। তারপর ঘাটে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিঙিটা একটা গোঁত্তা খেয়ে নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে প্রায়। জয়চাঁদ ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে এবং ফের এগিয়ে কোনো রকমে ডিঙিটার কানা ধরে ফেলল। এই ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে ডিঙি ধরে রাখা মুশকিল। জয়চাঁদ ডিঙিটাকে টেনে আনল পাড়ে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাওয়া চোখে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। নৌকোর খোলের মধ্যে জলে একটা লোক পড়ে আছে। সম্ভবত বেঁচে নেই।

জয়চাঁদ বড়ো দুঃখ পেল। লোকটা বোধ হয় পেটের দায়েই মাছ-টাছ ধরতে এই ঝড়-জলে বেরিয়েছিল। প্রাণটা গেল। জয়চাঁদ নৌকোটা ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লোকটাকে পাঁজা কোলে তুলে এনে ঘাটের পাথরে উপুড় করে শোয়াল। প্রাণ থাক বা না থাক, বাঁচানোর একটা চেষ্টা তো করা দরকার। সে লোকটার পিঠ বরাবর ঘন ঘন চাপ দিতে লাগল। যাতে পেটের জল বেরিয়ে যায়। সে হাতড়ে হাতড়ে বুঝতে পারল, লোকটা বেশ রোগা, জরাজীর্ণ চেহারা। বোধ হয় বুড়ো মানুষ।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যখন জয়চাঁদ হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন লোকটার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। ঃউ বা ঃআ গোছের। জয়চাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে লোকটাকে কিছুক্ষণ দলাইমলাই করল। প্রায় আধঘণ্টা পর লোকটার চেতনা ফিরে এল যেন।

লোকটি বলল, 'কে বটে তুমি?'

'আমাকে চিনবেন না। গাং পেরোবার জন্য দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ আপনার ডিঙিটা চোখে পড়ল।'

লোকটা উঠে বসল। ঝড়ের বেগটা একটু কমেছে। বৃষ্টির তোড়টাও যেন আগের মতো নয়। লোকটা কোমর থেকে গামছা খুলে চোখ চেপে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, 'ঃও, বড্ড ফাঁড়া গেল আজ। প্রাণে যে বেঁচে আছি সেই ঢের। তা তুমি যাবে কোথা?'

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, 'যাব ক্যাওটা গাঁয়ে। ওপার থেকে পাঁচ-সাত মাইল পথ। মেয়েটার বড্ড অসুখ খবর পেয়েই যাচ্ছিলুম। তা সে আর হয়ে উঠল না দেখছি।'

লোকটি বলল, 'হুঁ। কেমন অসুখ?'

'ভেদবমি হয়েছে শুনেছি। কলেরা কি না কে জানে। গিয়ে জ্যান্ত দেখতে পাব কি না বুঝতে পারছি না।'

লোকটা বলল, 'মেয়েকে বড্ড ভালোবাস, না?'

'তা বাসি। বড্ডই বাসি। মেয়েটাও বড্ড বাবা-বাবা করে।'

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'চলো তাহলে।'

জয়চাঁদ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়?'

'তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'খেপেছেন নাকি? কোনোরকমে প্রাণে বেঁচেছেন, এখন নৌকো বাইতে গেলে মারা যাবেন নির্ঘাত। আমার মেয়ের যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। আর এই দুর্যোগে নদী পেরোনো সম্ভবও নয়।'

রোগা লোকটা গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, 'ওহে, বাঁচা-মরা তো আছেই, সে কি আমাদের হাতে? আমাদের হাতে যা আছে তা হল, চেষ্টা। চলো, নৌকোয় উঠে পড়ো, তারপর ভগবান যা করেন।'

লোকটার গলার স্বরে কী ছিল কে জানে, জয়চাঁদ উঠে পড়ল।

বুড়ো লোকটা নৌকোর খোল থেকে একটা বইঠা তুলে নিয়ে গলুইয়ে বসল। অন্য প্রান্তে জয়চাঁদ। উত্তাল ঢেউয়ে নৌকোটা ঠেলে দিয়ে লোকটা বইঠা মারতে লাগল।

ডিঙিটা একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে পরমুহূর্তেই জলের উপত্যকায় নেমে যাচ্ছিল। আবার উঠল, আবার নামল। ওঠা আর নামা। মাঝ দরিয়ায় প্রচণ্ড তুফানে উত্তাল ঢেউয়ে ডিঙিটা যেন ওলট-পালট খেতে লাগল। কিন্তু জয়চাঁদ দু-হাতে শক্ত করে নৌকোর দুটো ধার চেপে ধরে অবাক চোখে দেখল, জীর্ণ বৃদ্ধ মানুষটা যেন শাল খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। হাতের বইঠা যেন জলকে তোলপাড় করে সব বাধা ভেঙে নৌকোটাকে তির গতিতে নিয়ে চলেছে।

একটা বিশাল দোতলা সমান ঢেউ তেড়ে আসছিল বাঁ-দিক থেকে। জয়চাঁদ সেই করাল ঢেউয়ের চেহারা দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'জয়চাঁদ, ভয় পেয়ো না।'

অবাক হয়ে জয়চাঁদ ভাবল, আমার নাম তো এর জানার কথা নয়!

ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হয়ে এক সময়ে নৌকোটা ঘাটে এসে লাগল। লোকটা লাফ দিয়ে নেমে ডিঙিটাকে ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে বলল, 'এ ঘাট চেন জয়চাঁদ?'

জয়চাঁদ অবাক হয়ে অন্ধকারে একটা মস্ত বট গাছের দিকে চেয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য! এ তো আনন্দপুরের ঘাট। এ-ঘাট তো আমার গাঁয়ের লাগোয়া! এখানে এত তাড়াতাড়ি কী করে এলাম? নৌকোয় আনন্দপুর আসতে তো সাত-আট ঘণ্টা সময় লাগে।'

'ঝড়ের দৌলতে আসা গেছে বাবু।'

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'না। ঝড় তো উলটোদিকে বইছে।'

'যাহোক, পৌঁছে তো গেছ।'

জয়চাঁদ একটু দ্বিধায় পড়ে হঠাৎ বলল, 'আপনি কে?'

'আমি! আমি তো একজন মাঝি। তোমার দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি।'

জয়চাঁদের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, 'আপনাকে প্রাণ ফিরে দিতে পারি তেমন ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আসলে কে?'

'বাড়ি যাও জয়চাঁদ। মেয়েটা তোমার পথ চেয়ে আছে।'

জয়চাঁদ চোখের জল মুছে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতে লোকটা পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'করো কী জয়চাঁদ, করো কী, বাড়ি যাও জয়চাঁদ।'

'গিয়ে?'

'মেয়ের কাছে যাও। সে ভালো আছে। অসুখ সেরে গেছে।'

'জানি মাঝি, আপনি যাকে রক্ষা করেন তাকে মারে কে।'

বুড়ো মাঝি একটু হাসল। তারপর উত্তাল ঝড়ের মধ্যে বিশাল গাঙে তার ছোটো ডিঙিটা নিয়ে কোথায় চলে গেল কে জানে!

চকবেড়ের গোহাটায়

চকবেড়ের গোহাটায় গোরু কিনতে গিয়েছিল পানাই মণ্ডল। চকবেড়ে অঞ্চলটা তেমন চেনা নয় তার। যাতায়াতই নেই। তবে নামটা জানা ছিল। আর এই গোহাটাই পরগনায় সবচেয়ে বড়ো। তার বউ বলে দিয়েছে, ওগো, আজকাল যে সব হাতির মতো বড়ো বড়ো জারসি গোরু, পাঞ্জাবি গোরু বেরিয়েছে ওগুলো কিনো না। ওই বিরাট গোরু দেখলে বাপু ভয় করে। একটা লক্ষ্মীমন্ত দেখে দিশি গোরু কিনে এনো।

পানাই মণ্ডল গোরুর মর্ম তেমন জানে না। এতকাল গাইগোরু পোষার মতো অবস্থাই ছিল না তার। পর পর বছর চারেক ভালো বর্ষা হওয়ায় চাষটা কপালজোরে ভালোই হয়েছিল। তার ওপর নিমাই নস্কর নামে একটা চাষবাসে পাশ করা ছোকরা এসে তাকে অকালের ফসল ফলানো শিখিয়েছে। সেইসব করে হাতে কিছু বাড়তি পয়সা চলে এল। তাইতেই পাকা ঘর হল, একটা টিউবওয়েল বসাল, শ্যালো কিনে ফেলল, বউ ফুলুরানি বায়না ধরল, গোরু না রাখলে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী আসে না। অতএব গোরু একটা চাই।

তা সে আর বেশি কথা কী! ট্যাঁকে টাকা নিয়ে পানাই অগত্যা গোহাটায় চলে এসেছে। মুশকিল হল গোরু সে ভালো চেনে না। তার জমি চাষ হয় ভাড়া করা ট্র্যাকটরে। সুতরাং বলদ রাখারও ঝামেলা পোয়াতে হয়নি কোনো দিন। অভিজ্ঞতা না থাকলে ঠকে যাওয়া আর বিচিত্র কী। সেই জন্যে একজন জানবুঝওয়ালা লোককে সঙ্গে আনবে ভেবে পীতাম্বরকে বলেছিল। কিন্তু পীতাম্বরের শাশুড়ির এখন-তখন অবস্থা, খবর পেয়ে সে জলেশ্বরে চলে গেছে। পানাই সুতরাং তার বড়ো শালা ঝিকুকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ঝিকু বলল, 'জামাইদা, গোরুর বিষয়ে আমার তেমন জ্ঞানই নেই।'

তবু দুই আনাড়িতেই এসেজে আজ।

চকবেড়ের গোহাটায় ঢুকে তাদের চোখ চড়কগাছ। সমস্ত জায়গাটা গোরু গোরু গন্ধে একেবারে ভোঁ ভোঁ করছে। তেমনই ধুলো উড়ছে। গোবর আর গোচোনায় একেবারে নান্দিভাস্যি ব্যাপার। তার সঙ্গে হাজারে হাজারে মাছি আর পোকামাকড় একেবারে ঝেঁপে ধরেছে চক্করটাকে।

ঝিকু নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলে, 'ওরে বাবা, এ তো দেখছি নরক গুলজার!'

শুধু গোরু নয়। নামে গোহাটা হলেও পাঁঠা-ছাগলের ব্যাপারীরাও বিস্তর জড়ো হয়েছে। সুতরাং দিশাহারা অবস্থা। বিস্তর খদ্দেরেরও আগমন ঘটেছে। ব্যাপার দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে পানাই বলে, 'ওরে ঝিক, এ তো আমাদের বাঁশবনে ডোম কানা অবস্থা রে! কেউ কি আর আমাদের পাত্তা দেবে?'

ঝিকু আনাড়ি হলেও চালাক-চতুর। তার ওপর বি.এ. পাশ করে এম.এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। বলল, 'লোকে যেন আনাড়ি বলে বুঝতে না পারে।'

ঘোরাঘুরি করতে করতেই হঠাৎ একটা বেঁটেমতো লোক জুটে গেল সঙ্গে। চোখে-মুখে ভারি মোলায়েম গদগদ ভাব। চোখে ধূর্তামি। খুব মাখো মাখো গলায় বলল, 'গোরু কিনবেন নাকি কর্তা? আমি হলুম গে লালমোহন, লোকে বলে গোরুর জহুরি। তা কী গোরু চাই? পছন্দসই যদি কিনিয়ে দিতে পারি তাহলে ওয়ান পারসেন্ট দালালি দিয়ে দেবেন।'

পানাই একটু ভালো মানুষ গোছের, হয়তো রাজি হয়ে যেত, কিন্তু ঝিকু ফস করে বলে বসল, 'ওহে বাপু, আমাদের গোরু নিয়েই কারবার, নবগ্রামে আমাদের গোশালা গিয়ে দেখে এসো, চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।'

লোকটা ভড়কাল না। বলল, 'তা তো বটেই। গোশালা যখন আছে তখন গোরু চিনবেন বই কী। তবে কিনা গোহাটায় অনেক বড়ো বড়ো গোরুর ব্যাপারীও ঘোল খেয়ে যায় কিনা। গত হপ্তায় শিবেন মান্নার মতো পাকা লোককেও এক ব্যাপারী বুড়ো গোরু গছিয়ে হাওয়া হল।'

পানাই একটু ভয় খেয়ে বলল, 'তাহলে তো খুব ভাবনার কথা হে!'

'তা তো বটেই। তারপর ধরুন চোরাই গোরুর ব্যাপার আছে, রোগী গোরুর ব্যাপার আছে, বন্ধ্যা গোরুর ব্যাপার আছে। গোরু নিয়ে মহাভারত হয়ে যায় কর্তা। গত বিশটি বছরে এই গোহাটার সঙ্গে লেপটে আছি। গো-শাস্ত্র এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি।'

পানাই মণ্ডল বলল, 'তা তো বটেই।'

ঝিকু বলল, 'ঠিক আছে, ভালো গোরু দেখিয়ে দেবে চলো। ভালো গোরু যদি সস্তায় পাই তাহলে দালালি নয় বাপু, পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারি।'

লালমোহন মাথা নেড়ে বলল, 'তা হবে না কর্তা। অত কমে পেরে উঠব না। দালালি করে খাই, আমারও ঘরে বালবাচ্চা আছে, খরচাপাতি আছে, এই দালালিই সম্বল। আরও জনা কুড়ি দালাল নানা এলাকা ভাগ করে কাজকারবার করছে, লড়ালড়ি তো কম নয় মশাই।'

গাঁইগুঁই করে পানাই নিমরাজি মতো হল। ঝিকু লোকটার সঙ্গে বিস্তর দরাদরি করে হাফ পারসেন্টে রাজি করাল।

তবে লালমোহন লোকটা বেশ কাজের। প্রথমেই যে ব্যাপারীর কাছে নিয়ে গেল সে লোকটাকে দেখলে মায়া হয়। ভারি দীন-দুঃখী চেহারা, দুটি ছোটো গোরু নিয়ে হাটের একটা একটেরে কোনায় সকলের চোখের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। গোরু দুটোও ভারি ঠান্ডা, লোকটার মতোই।

দুটো গোরুই ভারি পছন্দ হয়ে গেল পানাইয়ের। তার মধ্যে সাদায় বাদামি ছোপওলা গোরুটা যেন তার দিকে চেয়ে চোখের ভাষায় কিছু বলতে চাইছিল।

সে ব্যাপারীকে বলল, 'এটির কত দাম নেবে গো ব্যাপারী?'

রোগাভোগা মানুষটা ক্ষীণ গলায় বলে, 'যা ভালো বুঝবেন দেবেন।'

ঝিকু আর লালমোহন মাঝখানে পড়ে বিস্তর ঝামেলা পাকিয়ে তুলল। লালমোহন বলল, 'ছ-হাজারে ছেড়ে দাও গো ব্যাপারী।'

ঝিকু ফুঁসে উঠে বলল, 'তার মানে? তুমি দর হাঁকবার কে হে বাপু? দালালি চাও সে পরে দেখা যাবে। দরদাম তো আমরা করব। তুমি দূরে গিয়ে দাঁড়াও।'

লালমোহন বলল, 'এ গোরুর দাম আট-দশ হাজারের নীচে নয় কিন্তু। তোমাদের ভালোর জন্যই বলছিলাম।'

'তোমাকে আর আমাদের ভালো দেখতে হবে না। আমাদের ভালো আমরা বেশ বুঝি।'

লালমোহন যে সুবিধের লোক নয় তা বুঝে নিতে বেশি সময় লাগল না। কারণ লালমোহন বলে বসল, 'ব্যাপারীরা পেটের দায়ে অনেক সময় কম দামে গোরু বেচে দেয় বটে, কিন্তু সেটা ধর্মত ন্যায্যত ঠিক নয়। গোরুর একটা ধরাবাঁধা দাম তো আছে হে বাপু!'

ঠিক এই সময়ে সবাইকে চমকে দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠ বলে উঠল, 'দাম চার হাজার টাকা।'

লালমোহন চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর রুখে উঠে বলল, 'চার হাজার! বললেই হল চার হাজার! কে বলল কথাটা শুনি?'

কিন্তু কেউ কোনো সাড়াশব্দ করল না আর।

কাঁচুমাচু মুখে গোরুর ব্যাপারী পানাইকে বলল, 'আজ্ঞে কর্তা, ওই চার হাজার দিয়েই গোরুটা নিয়ে যান। বড়ো ভালো গোরু।'

পানাই বলল, 'তাহলে গোরুটা বেচছ কেন হে? রেখে দিলেই তো পারতে।'

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'গোরু তো আমার নয় বাবু। গোরুর মালিক পরমেশ্বর রায়। তাঁর গোয়ালে অনেক গোরু। গোরু বেশি হলে বেচে দেন। আমি হলুম তাঁর রাখোয়াল। পয়সা থাকলে আমিই কিনে নিতুম মশাই। কিন্তু আমাকে বেচলেও চার হাজার টাকা উঠবে না। তবে বলে রাখছি বাবু, গোরুটা হাতছাড়া করবেন না। আপনাকে দেখলে ভালো লোক বলে মনে হয়, তাই বলছি।'

লালমোহন তড়পে উঠে বলল, 'ও তুমি পরমেশ্বর রায়ের রাখাল! দিনেদুপুরে তাকে ঠকাচ্ছ? দাঁড়াও, আজই পরমেশ্বরবাবুর কাছে গিয়ে তোমার নামে নালিশ জানিয়ে আসব।'

ঝিকু তেড়ে উঠে বলল, 'তুমি কার দালাল বলো তো হে লালমোহন! আমাদের কাছে দালালি চাইছ, আর আসল দালালি করতে লেগেছ গোরুর মালিকের? তুমি তো ফেরেব্বাজ লোক হে! দু-মুখো সাপ!'

ফের সেই গমগমে গলাটা বলে উঠল, 'ও কিন্তু গোরুচোর।'

লালমোহন রাগে একটা লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে, কে বলল কথাটা? কার এত আস্পর্দা?'

কেউ অবশ্য টুঁ শব্দটিও করল না।

লালমোহন আগুন চোখে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখে বলল, 'এ তল্লাটে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে কেউ পার পাবে না। এই গোহাটায় আমার কথাই আইন। এই গোরুর দাম ছয় হাজার টাকার এক পয়সা কম নয়। কিনতে হয় কেনো নইলে কেটে পড়ো।'

ঝিকু ঘুঁষি পাকিয়ে বলে, 'বললেই হল?'

পানাই মণ্ডল ভীতু মানুষ, তাড়াতাড়ি দু-জনের মাঝখানে পড়ে বলল, 'হাঙ্গামায় কাজ নেই বাপু, গোরু আমি আর কিনছি না। গোরু কেনার এত ঝামেলা জানলে কে এত দূরের গোহাটায় আসত। ঘাট হয়েছে লালমোহনবাবু, আমি গোরু নেব না।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই গুরুগম্ভীর গলায় ফের যেন দৈববাণী হল, 'ও গোরু তোমার। নিয়ে যাও। লালমোহন পাজি লোক।'

লালমোহন দিশাহারার মতো চারদিকে চাইল। কিন্তু কথাটা কার মুখ থেকে বেরোল সেটা বুঝতে পারল না। চারদিকে বিস্তর ক্রেতা-বিক্রেতা, ফড়ে দালালের ভিড়, গোলমালে কান পাতা দায়। এর মধ্যে এই বাজ ডাকা গলায় কে মাঝে মাঝে কথা কয়ে উঠছে তা সে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ মস্তানি ঝেড়ে ফেলে সে পানাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিন মশাই, ওই চার হাজার দরের কমিশনটা দিয়ে ফেলুন তো। তারপর গোরু নিয়ে চলে যান।'

পানাই গোলমাল এড়ানোর জন্য ট্যাঁকে হাত দিয়েছিল টাকাটা দিয়ে ফেলবে বলে। কিন্তু আচমকাই শান্ত, ছোটোখাটো গোরুটা এগিয়ে এসে দুম করে একটা প্রবল ঢুঁসো মেরে দিল লালমোহনকে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে লালমোহন 'বাবারে' বলে চেঁচিয়ে চোখ উলটে ফেলল।

গোরুর ব্যাপারী ভারি অবাক হয়ে বলল, 'বড়ো আশ্চর্য কাণ্ড মশাই। সাবিত্রী বড়ো ঠান্ডা স্বভাবের গোরু। কখনো কাউকে ঢুঁ দেয়নি আজ অবধি। তা যাই হোক, এসব কাণ্ড দেখে বড়ো ঘাবড়ে গেছি। গোরু আপনিই নিন।'

খুশি মনে টাকা গুনে দিয়ে গোরু সাবিত্রীকে নিয়ে হাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পানাই। মাঠের ভিতর হাঁটা পথ ধরে পানাই বলল, 'হ্যাঁরে ঝিকু, কাণ্ডটা কিছু বুঝলি?'

ঝিকু মাথা নেড়ে বলল, 'না জামাইদা, অশরীরী কাণ্ড। কথাগুলো কে বলল বলো তো!'

ঠোঁট উলটে পানাই বলল, 'কিছুই বুঝলুম না, মনে হল দৈববাণী-টৈববানী কিছু হচ্ছে, একটু ভয় ভয় করছে যেন।'

'তা আমারও কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। কিন্তু জামাইদা, চারদিকটা কেমন হঠাৎ থম মেরে গেছে দেখছ?'

'তাই তো রে! আকাশের রংটাও তো ভালো নয়। ঝড় আসবে বুঝি? ঘূর্ণিঝড় এলে এরকমটা হয়। এত বড়ো ফাঁকা মাঠে ঝড়ের মুখে পড়লে যে বিপদ হবে রে!'

'ছোটো জামাইদা।'

'ছোটার কি উপায় আছে। গোরুটা রয়েছে না!'

'গোরুটা তোমার ট্যাঁটন আছে জামাইদা। লালমোহনকে কেমন ঢুঁসোটা মারল বল!'

'সেইটেও চিন্তার কথা রে! এত ঠান্ডা স্বভাবের গোরু হঠাৎ এমন খেপে গেল কেন বলো তো!'

'গোরুটা এলেবেলে গোরু নয় জামাইদা। কিন্তু পা চালাও, ঝড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ? উড়িয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু!'

খোলা মাঠে ঝড়টা একেবারে উন্মাদের মতো ধেয়ে আসছিল। দূর থেকেই তার ডাকাতের মতো হাঁকার শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে একটা গুম গুম মেঘ ভাঙা আওয়াজ আর বাজের ঝিলিক।

হঠাৎ দড়িতে একটা হ্যাঁচকা টান পড়ায় পড়ো পড়ো হয়ে ছুটতে লাগল পানাই। চেঁচিয়ে বলল, 'ঝিকু, ধর আমাকে, গোরুটা পালাচ্ছে যে!'

ঝিকু এসে তার একটা হাত চেপে ধরল বটে, কিন্তু আটকাতে পারল না। গোরুর টানে দু-জনেই প্রাণপণে ছুটতে লাগল এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে। প্রচণ্ড বাতাস আর ধুলোয় দিক ঠিক রইল না। একটা ছোটোখাটো গোরুর গায়ে যে এত জোর আর এত রেগে ছুটতে পারে সেটা তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

কিন্তু ঝড়টা তাদের পেড়ে ফেলার আগেই সেই গোরুটা মাঠটা আড়াআড়ি পার হয়ে একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে এনে ফেলল তাদের। চারদিকে বড়ো বড়ো গাছ। তাতে আড়াল হওয়া একটা পোড়ো বাড়ি। তবে দেউড়ির পর একখানা দালান গোছের জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। শালা-ভগ্নীপোত গোরু সমেত ঢুকে পড়ল সেখানে। আর তখনই বাইরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ল। কয়েকটা গাছ উপড়ে প্রায় উড়ে গিয়ে দূরে আছড়ে পড়ল। ঘরটাও থরথর করে কেঁপে উঠছিল বাতাসের ধাক্কায়। ভারি হতভম্ব হয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

ঝড় যখন থামল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাইরে বেরিয়ে কিন্তু তারা কোথায় এসেছে আর কোনদিকে গেলে গাঁয়ে পৌঁছোনো যাবে তা ঠাহর করতে পারল না। অন্ধকারে চারদিকটা একদম লেপাপোঁছা।

'ওরে ঝিকু, এ তো বড়ো বিপদেই পড়া গেল।'

'তাই তো জামাইবাবু! এই অন্ধকারে কোনদিকে যাওয়া যায়?'

হাতের দড়িতে মৃদু টান পড়তেই হাঁটতে হাঁটতে পানাই বলল, 'আয় ঝিকু, সাবিত্রীর পিছু পিছু যাই চল। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কী জানি বাপু, গোরুটা বোধ হয় সাক্ষাৎ ভগবতী।'

আশ্চর্যের বিষয়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোরু নিয়ে তারা গাঁয়ের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়তে পারল।

'ঝিকু, সাবিত্রী কী করে আমাদের গাঁ চিনল বলতে পারিস?'

'না দাদা, আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।'

বাড়ি আসতেই শাঁখ আর উলুধ্বনি দিয়ে পানাইয়ের বউ গোরুকে বরণ করে চাল কলা আরও কী সব মেখে খেতে দিল। বাচ্চারা এসে গোরুর গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

পানাই বলল, 'লক্ষ্মী গোরু চেয়েছিলে, কপালজোরে তাই মিলিয়ে দিয়েছেন ভগবান। মা লক্ষ্মীকে পেন্নাম করো সবাই।'

সাবিত্রী ভারি খুশি হয়ে ডাক ছাড়ল, হাম্বা।

নয়নচাঁদ

গভীর রাতে একটা শব্দ শুনে নয়নচাঁদবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

এমনিতেই নয়নচাঁদের ঘুম খুব পাতলা। টাকা থাকলেই দুশ্চিন্তা। আর দুশ্চিন্তা থাকলেই অনিদ্রা। অনিদ্রা থেকেই আবার অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য থেকে ঘটে উদরাময়। সুতরাং টাকা থেকেও নয়নচাঁদের সুখ নেই। সারা বছর কবরেজি পাঁচন, হোমিয়োপ্যাথি গুলি আর অ্যালোপ্যাথির নানা বিদঘুটে ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন কোনো মতে।

ঘুম ভাঙতেই নয়নচাঁদ চারদিকে চেয়ে দেখলেন। রাত্রিবেলা এমনিতেই নানা রকমের শব্দ হয়। ইঁদুর দৌড়োয়, আরশোলা খরখর করে, কাঠের জোড় পটপট করে ছাড়ে, হাওয়ায় কাগজ ওড়ে, আরও কত কী। তাই নয়নচাঁদ তেমন ভয় পেলেন না। তবে আধো ঘুমের মধ্যে তাঁর মনে হয়েছিল, শব্দটা হল জানালায়। জানালার শিক-এ যেন টুং করে কেউ একটা ঢিল মেরেছিল।

বিছানার মাথার দিকেই জানালা, জানালার পাশেই একটা টেবিল। তাতে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস। নয়নচাঁদ টর্চ জ্বেলে জলের গেলাসটার দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেলেন। টেবিলের ওপর একটা কাগজের মোড়ক পড়ে আছে।

নয়নচাঁদ উঠে বড়ো বাতি জ্বেলে মোড়কটা খুললেন। যা ভেবেছেন তাই। ঢিলে জড়িয়ে কে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাঁকে, সাদামাটা একখানা কাগজে লাল অক্ষরে লেখা : নয়নচাঁদ, আমাকে মনে আছে? সামান্য দেনার দায়ে আমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছিলে। শেষ অবধি গলায় গামছা বেঁধে আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়। আমার বউ আর বাচ্চারা ভিখিরি হয়ে সেই থেকে পথে পথে ঘুরছে। অনেক সহ্য করেছি, আর না। আগামী অমাবস্যায়

তোমার ঘাড় মটকাব। ততদিনে ভালো মন্দ খেয়ে নাও। ফুর্তি করো, গাও, নাচো, হাসো। বেশি দিন তো আর নয়। ইতি তোমার যম জনার্দন।

নয়নচাঁদ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। চাকরবাকর, বউ, ছেলেমেয়েদের ডাকার চেষ্টা করলেন। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

জনার্দনকে খুব মনে আছে নয়নচাঁদের। নিরীহ গোছের মানুষ। তবে বেশ খরচের হাত ছিল। প্রায়ই হ্যান্ড নোট লিখে নয়নচাঁদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করত। কখনো টাকা শোধ দিতে পারেনি। নয়নচাঁদ মামলায় জিতে লোকটার বাড়িঘর সব দখল করে নেয়। জনার্দন সেই দুঃখে বিবাগি হয়ে কোথায় চলে যায়। মাসখানেক বাদে নদীর ওপারে এক জঙ্গলের মধ্যে একটা আমড়া গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার পচা গলা লাশটা পাওয়া যায়। তার বউ ছেলেপিলেদের কী হয়েছে তা অবশ্য নয়নচাঁদ জানেন না। সেই ঘটনার পর বছর তিন-চার কেটে গেছে।

নয়নচাঁদের ভূতের ভয় আছে। তা ছাড়া অপঘাতকেও তিনি খুবই ভয় পান। খানিকক্ষণ বাদে শরীরের কাঁপুনিটা একটু কমলে তিনি জল খেলেন এবং বাড়ির লোকজনকে ডাকলেন। রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে পারল না! এই রহস্যময় চিঠি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা গবেষণা হতে লাগল।

পরদিন সকালে গোয়েন্দা বরদাচরণকে ডেকে পাঠানো হল। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাড়ারই লোক।

বরদাচরণ লোকটা একটু অদ্ভুত। স্বাভাবিক নিয়মে কোনো কাজ করতে তিনি ভালোবাসেন না। তাঁর সব কাজেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই যেমন কোনো বাড়িতে গেলে তিনি কখনো সদর দরজা দিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকবেন না। এমনকী খিড়কি দরজা দিয়েও না। তিনি হয় পাঁচিল টপকাবেন, নয়তো গাছ বেয়ে উঠে ছাদ বেয়ে নামবেন। এমনকী জানালা ভেঙেও তাঁকে ঢুকতে দেখা গেছে।

নয়নচাঁদের বাড়িতে বরদা ঢুকলেন টারজানের কায়দায়। বাড়ির কাছেই একটা মস্ত বটগাছ আছে। সেই বটের একটা ঝুরি ধরে কষে খানিকটা ঝুল খেয়ে বরদা পাশের একটা জাম গাছের ডাল ধরলেন। সেটা থেকে লাফিয়ে পড়লেন একটা চালতা আছে। সেখান থেকে নয়নচাঁদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে অবশেষে একটা রেইন পাইপ ধরে তিনতলার জানলায় উঁকি দিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'এই যে নয়নবাবু, কী হয়েছে বলুন তো?'

জানলায় আচমকা বরদাচরণকে দেখে নয়নচাঁদ ভিরমি খেয়ে প্রথমটায় গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁকে ফের সামাল দেওয়া হল। বরদাচরণ

ততক্ষণে ধৈর্যের সঙ্গে জানালার বাইরে পাইপ ধরে ঝুলে রইলেন।

অবশেষে যখন ঘটনাটা বরদাচরণকে বলতে পারলেন নয়নচাঁদ তখন বরদা খুব গম্ভীর মুখে বললেন, 'তাহলে এ জানালাটাই! এটা দিয়েই ঢিলে বাঁধা চিঠিটা ছোড়া হয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ বাবা বরদা।'

জানালাটা খুব নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে বরদা বললেন, 'হুম, অনেকদিন জানালাটা রং করাননি দেখছি।'

'না। খামোখা পয়সা খরচ করে কী হবে? জানালা রং করালেও আলো হাওয়া আসবে, না করালেও আসবে। ঝুটমুট খরচ করতে যাব কেন?'

'তার মানে আপনি খুব কৃপণ লোক, তাই না?'

'কৃপণ নই বাবা, লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে হিসেবি বলতে পারো।'

'কাল রাতে আপনি কী খেয়েছিলেন?'

'কেন বাবা বরদা, রোজ যা খাই তাই খেয়েছি। দু-খানা রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি।'

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি খুবই কৃপণ। ভীষণ কৃপণ।'

'না বাবা, কৃপণ নই। হিসেবি বলতে পারো।'

'আমার ফিস কত জানেন? পাঁচশো টাকা, আর খরচপাতি যা লাগে।'

নয়নচাঁদ ফের ভিরমি খেলেন। এবার জ্ঞান ফিরতে তাঁর বেশ সময়ও লাগল।

বরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কৃপণ বা হিসেবি বললে আপনাকে কিছুই বলা হয় না। আপনি যাচ্ছেতাই রকমের কৃপণ। বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে কৃপণ লোক আপনিই।'

নয়নচাঁদ মুখখানা ব্যাজার করে বললেন, 'পাড়ার লোক হয়ে তুমি পাঁচশো টাকা চাইতে পারলে? তোমার ধর্মে সইল?'

'আপনার প্রাণের দাম কি তার চেয়ে বেশি নয়?'

'কিছু কমই হবে বাবা। হিসেব করে দেখেছি আমার প্রাণের দাম আড়াইশো টাকার বেশি নয়।'

'তবে আমি চললুম, ভিজিট বাবদ কুড়িটা টাকা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।'

নয়নচাঁদ আঁতকে উঠে বললেন, 'যেয়ো না বাবা বরদা, ওই পাঁচশো টাকাই দেবখন।'

বরদাচরণ এবার পাইপ বেয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'চিঠিটা দেখি।'

চিঠিটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটা পড়লেন। কালিটা পরীক্ষা করলেন। কাগজটা পরীক্ষা করলেন। আতসকাচ দিয়ে অক্ষরগুলো দেখলেন ভালো করে। তারপর নয়নচাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, 'এটা কি জনার্দনেরই হাতের লেখা?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। জনার্দন কয়েকটা হ্যান্ডনোট আমাকে লিখে দিয়েছিল। সেই লেখার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।'

বরদা বললেন, 'হুঁ মনে হচ্ছে গামছাটা তেমন টেঁকসই ছিল না।'

'তার মানে কী বাবা? এখানে গামছার কথা ওঠে কেন?'

'গামছাই আসল। জনার্দন গলায় গামছা বেঁধে ফাঁসে লটকেছিল তো! মনে হচ্ছে গামছা ছিঁড়ে সে পড়ে যায় এবং বেঁচেও যায়। এ চিঠি যদি তারই লেখা হয়ে থাকে তো বিপদের কথা। আপনি বরং কটা দিন একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করুন। আমোদ-আহ্লাদও করে নিন প্রাণভরে।'

'তার অর্থ কী বাবা। কী বলছ সব? আমি জীবনে কখনো ফুর্তি করিনি। তা জান?'

'জানি বলেই বলছি। টাকার পাহাড়ের ওপর শকুনের মতো বসে থাকা কি ভালো? অমাবস্যার তো আর দেরিও নেই।'

নয়নচাঁদ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'জনার্দন যে মরেছে তার সাক্ষীসাবুদ আছে। লাশটা সনাক্ত করেছিল তার আত্মীয়রাই।'

'তবে তো আরও বিপদের কথা। এ যদি ভূতের চিঠি হয়ে থাকে তবে আমাদের তো কিছুই করার নেই।'

নয়নচাঁদ এবার ভ্যাক করে কেঁদে উঠে বললেন, 'প্রাণটা বাঁচাও বাবা বরদা, যা বল তাই করি।'

বরদা এবার একটু ভাবলেন। তারপর মাথাটা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, দেখছি।'

এই বলে বরদাচরণ বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তিনদিন পর। মাথার চুল উশকোখুশকো, গায়ে ধুলো, চোখ লাল। বললেন, 'পেয়েছি।'

নয়নচাঁদ আশান্বিত হয়ে বললেন, 'পেরেছো ব্যাটাকে ধরতে? যাক বাঁচা গেল।'

বরদা মাথা নেড়ে বললেন, 'তাকে ধরা অত সহজ নয়। তবে জনার্দনের বউ ছেলে-মেয়ের খোঁজ পেয়েছি। এই শহরেরই একটা নোংরা বস্তিতে থাকে, ভিক্ষে-সিক্ষে করে

পরের বাড়িতে ঝি-চাকর খেটে কোনোরকমে বেঁচে আছে।'

'অ, কিন্তু সে খবরে আমাদের কাজ কী?'

বরদা কটমট করে চেয়ে থেকে বললেন, 'চিঠিটা যদি ভালো করে পড়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, ভূতটার কেন আপনার ওপর রাগ! তার বউ ছেলে-মেয়ে ভিখিরি হয়ে যাওয়াটা সে সহ্য করতে পারছে না।'

'তা বটে।'

'যদি বাঁচতে চান তো তাদের আগে ব্যবস্থা করুন।'

'কী ব্যবস্থা বাবা বরদা?'

'তাদের বাড়িঘর ফিরিয়ে দিন। আর যা সব ক্রোক করেছিলেন তাও।'

'ওরে বাবা! তার চেয়ে যে মরাই ভালো।'

'আপনি চ্যাম্পিয়ন।'

'কীসে বাবা বরদা।'

'কিপটেমিতে। আচ্ছা আসি, আমার কিছু করার নেই কিন্তু।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। অত চটো কেন? জনার্দনের পরিবারকে সব ফিরিয়ে দিলে কিছু হবে?'

'মনে হয় হবে। তারপর আমি তো আছিই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নয়নচাঁদ বললেন, 'তাহলে তাই হবে বাবা।'

অমাবস্যার আর দেরি নেই। মাঝখানে মোটে সাতটা দিন। নয়নচাঁদ জনার্দনের ঘরবাড়ি, জমিজমা, ঘটিবাটি এবং সোনাদানা সবই তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। জনার্দনের বউ আনন্দে কেঁদে ফেলল। ছেলেমেয়েগুলো বিহ্বল হয়ে গেল।

বরদা নয়নচাঁদকে বললেন, 'আজ রাতে রুটির বদলে ভালো করে পরোটা খাবেন। সঙ্গে ছানার ডালনা আর পায়েস।'

'বল কী?'

'যা বলছি তাই করতে হবে। আপনার প্রেশার খুব লো। শক-টক খেলে মরে যাবেন।'

'তাই হবে বাবা বরদা। যা বলবে করব। শুধু প্রাণটা দেখো।'

নয়নচাঁদ পরোটা খেয়ে দেখলেন, বেশ লাগে। কোনোদিন খাননি। ছানার ডালনা খেয়ে আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল। আর পায়েস খেতে খেতে পূর্বজন্মের কথাই মনে পড়ে গেল তাঁর। না, পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই।

সকালবেলাতেই বরদা জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন।

'এই যে নয়নচাঁদবাবু, কেমন লাগছে?'

'গায়ে বেশ বল পাচ্ছি বাবা। পেটটাও ভুটভাট করছে না তেমন।'

'আপনার কাছারিঘরে বসে কাগজপত্র সব দেখলাম। আরও দশটা পরিবার আপনার জন্য পথে বসেছে। তাদের সব সম্পত্তি ফিরিয়ে না দিলে কেসটা হাতে রাখতে পারব না।'

'বল কী বাবা বরদা? এরপর যে আমিই পথে বসব।'

'প্রাণটা তো আগে।'

কী আর করেন, নয়নচাঁদ বাকি দশটা পরিবারের যা কিছু দেনার দায়ে দখল করেছিলেন তা সবই ফিরিয়ে দিলেন। মনটা একটু দমে গেল বটে, কিন্তু ঘুমটা হল রাত্রে।

অমাবস্যা এসে পড়ল প্রায়। আজ রাত কাটলেই কাল অমাবস্যা লাগবে।

সন্ধেবেলা বরদা এসে বললেন, 'কেমন লাগছে নয়নচাঁদবাবু, ভয় পাচ্ছেন না তো!'

'ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি বাবা।'

'ভয় পাবেন না। আজ রাত্রে আরও দু-খানা পরোটা বেশি খাবেন। কাল সকালে যত ভিখিরি আসবে কাউকে ফেরাবেন না। মনে থাকবে?'

নয়নচাঁদ হাঁপ-ছাড়া গলায় বললেন, 'তাই হবে বাবা, তাই হবে। সব বিলিয়ে দিয়ে লেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাব, যদি তাতে তোমার সাধ মেটে।'

পরদিন সকালে উঠে নয়নচাঁদের চক্ষু চড়ক গাছ। ভিক্ষে দেওয়া হয় না বলে এ বাড়িতে কখনো ভিখিরি আসে না। কিন্তু সকালে নয়নচাঁদ দেখেন, বাড়ির সামনে শয়ে শয়ে ভিখিরি জুটেছে। দেখে নয়নচাঁদ মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা ভাঙার পর ব্যাজার মুখে উঠলেন। সিন্দুক খুলে টাকা বের করে চাকরকে দিয়ে ভাঙিয়ে আনলেন। ভিখিরিরা যখন বিদেয় নিল তখন নয়নচাঁদের হাজার খানেক টাকা খসে গেছে।

নয়নচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। হাজার টাকা যে অনেক টাকা!

দুপুরে একরকম উপোস করেই কাটালেন নয়নচাঁদ। টাকার শোক তো কম নয়।

নিজের ঘরে শুয়ে থেকে একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল। যখন তন্দ্রা ভাঙল তখন চারদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। ঘরে কেউ আলোও দিয়ে যায়নি।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে নয়নচাঁদ চেঁচালেন, 'ওরে কে আছিস?'

কেউ জবাব দিল না।

ঘাড়টা কেমন সুড়সুড় করছিল নয়নচাঁদের। বুকটা ছমছম। চারদিকে কীসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে অদৃশ্যে। ফিসফাস কথাও শুনতে পাচ্ছেন।

নয়নচাঁদ সভয়ে কাঠ হয়ে জানালাটার দিকে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ সেই অন্ধকার জানালায় একটা ছায়ামূর্তি উঠে এল।

নয়নচাঁদ আর সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তেড়ে উঠে জানালার কাছে ধেয়ে গিয়ে বললেন, 'কেন রে ভূতের পো, আর কোন পাপটা আছে আমার শুনি? আর কোন কর্মফল বাকি আছে? থোড়াই পরোয়া করি তোর?'

একটা টর্চের আলোয় ঘরটা ভরে গেল হঠাৎ। জানালার বাইরে থেকে বরদাচরণ বললেন, 'ঠিকই বলেছেন নয়নবাবু। আপনার আর পাপ-টাপ নেই। ঘাড়ও কেউ মটকাবে না। অমাবস্যা একটু আগেই ছেড়ে গেছে।'

'বটে?'

'তবে ফের অমাবস্যা আসতে আর কতক্ষণ? এবার থেকে যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চালিয়ে যান। সকালে ভিখিরি বিদেয়, দুপুরে ভরপেট খাওয়া, বিকেলে দানধ্যান সৎচিন্তা, রাত্রে পরোটা, মনে থাকবে?'

নয়নচাঁদ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'থাকবে বাবা থাকবে।'

ফুটো

দোলগোবিন্দবাবু দুঃখী মানুষ। বরাবরই তাঁর দুঃখে কেটেছে। ছেলেবেলায় গরিব বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি-মোয়া বিক্রি করে পেট চালিয়েছেন। লেখাপড়া শিখেছেন অতি কষ্টে। এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের জীবনটা তাঁর আজও বেশ দুঃখেই কাটে। অল্প মাইনের একটা চাকরি করেন। ঘরে তাঁর বউ দিনরাত গঞ্জনা দেন। ছেলে-মেয়ে দুটো ভারি রোগাভোগা। অফিসেও তাঁকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। ভালোমানুষ বলে বেশি করে খাটিয়ে নেয়। দোলগোবিন্দবাবু নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন। তাঁর অফিস বলতে একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি। নানারকম জিনিস তৈরি হয়। কালি, ইঁদুরমারা বিষ, নানারকম সিনথেটিক আঠা। দোলগোবিন্দবাবু একজন সামান্য কেমিস্ট। ক-এর সঙ্গে ফরমুলা অনুযায়ী খ মিশিয়ে গ তৈরি করা আর কি। তবে মাঝে মাঝে অনেক রাত অবধি যখন একা একা বসে কাজ করেন তখন তাঁর ইচ্ছে যায়, নানারকম জিনিসের সঙ্গে নানারকম বেখাপ্পা জিনিস মিশিয়ে দেখলে কেমন হয়? এরকম মিশিয়ে দেনও কয়েকবার। তেমন কিছু দাঁড়ায়নি।

আজও অফিস থেকে বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাইরে দুর্যোগ চলছে। ভয়ংকর হাওয়া দিচ্ছে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। রাস্তায় হাঁটুভর জল দাঁড়িয়ে গেছে। দোলগোবিন্দবাবু র্যাক-এ মেলানো তাঁর ছাতাটা নিতে গিয়ে একটু অবাক হলেন। বাঁ-দিকের দ্বিতীয় হুকটায় তিনি বরাবর তাঁর ছেঁড়া তাপ্পি দেওয়া ছাতাটা ঝুলিয়ে রাখেন। আজও রেখেছেন। অথচ ছাতাটা নেই। তার বদলে একটা খুব ঝকমকে নতুন ছাতা ঝুলছে। শুধু নতুন নয়, বেশ কায়দার ছাতা। কালো বাঁকানো পুরু হ্যান্ডেল, দারুণ দামি কাপড়, ওজনেও সাধারণ ছাতার চেয়ে পাঁচ গুণ ভারী। র্যাক-এ আর দ্বিতীয় ছাতা নেই। অফিসের সবাই কখন বাড়ি চলে গেছে।

দোলগোবিন্দবাবু দারোয়ান রামবিলাসকে ডেকে ছাতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। রামবিলাস বলল, 'আমি তো কিছু জানি না বাবু।'

অন্যের ছাতাটা নেওয়া উচিত হবে কি না তা বুঝতে পারছিলেন না তিনি। তবে ছাতা যারই হোক, সে ছাতা নিতে এই দুর্যোগে আজ আসবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কাল ছাতাটা ফেরত আনলেই হবে। এই ভেবে দোলগোবিন্দ ছাতাটা নিয়ে বেরোলেন।

ছাতাটা ভালো। খুবই ভালো। মাথার ওপর তুলে দোলগোবিন্দ ছাতাটা খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই সেটা আপনা থেকেই নিঃশব্দে এবং বেশ বিনীতভাবে খুলে গেল। আজকালকার অটোমেটিক ছাতা যেমন অভদ্রভাবে ফটাং করে খোলে সেরকমভাবে নয়।

বৃষ্টি আজ বড়োই প্রবল। রাস্তায় কলকল করে যেন নদী বয়ে চলেছে। বাস ট্রাম ট্যাক্সি সব বন্ধ। একটা কুকুরকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দোলগোবিন্দবাবু বুঝলেন, আজ জল ঠেঙিয়ে পায়ে হেঁটেই ফিরতে হবে।

রাস্তায় পা দিয়ে দোলগোবিন্দ দেখলেন, সিঁড়ির নীচে তেমন জল নেই। চটি ভিজল না। দোলগোবিন্দও হাঁটতে হাঁটতে আরও টের পেলেন, ছাতাটা এতই ভালো যে চারদিকে প্রবল বৃষ্টি এবং বাতাস সত্ত্বেও তাঁর গায়ে একটুও ছাঁট লাগছে না, বাতাসও নয়। এত ভালো ছাতা নিশ্চয়ই এদেশে হয় না।

বেশ আনমনেই হাঁটচ্ছিলেন দোলগোবিন্দ। হাঁটতে হাঁটতে ছেলেবেলার কথা ভাবছিলেন। তাঁদের খোড়ো চালের ঘরে বর্ষাকালে বড়ো জল পড়ত। তাঁরা ঘরে বসে ভিজতেন আর সারা রাত জেগে বসে জড়োসড়ো হয়ে কাটাতেন।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, পায়ের নীচে যেন মাটিটা ভালো টের পাচ্ছেন না! হল কী? নীচের দিকে তাকিয়ে উনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই কনভেন্ট রোডের রাস্তাটা কোন জাদুবলে যেন প্রায় দশ হাত নীচে পড়ে আছে। আর তিনি ভেসে যাচ্ছেন।

না, কথাটা ঠিক হল না। তিনি ঠিক ভেসেও নেই। তিনি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। কোনো বাড়তি শক্তি লাগছে না, চেষ্টা করতে হচ্ছে না, একেবারে গ্যাস বেলুনের মতো দিব্যি উঠে যাচ্ছেন তিনি।

এই অশরীরী কাণ্ডে দোলগোবিন্দ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাঁচাও! গেলুম!'

ঝড়বৃষ্টিতে সেই শব্দ কেউ শুনতে পেল না। আর শুনলেও লাভ ছিল না। দোলগোবিন্দ তখন মাটি থেকে বিশ-তলা বাড়ির উচ্চতায় ঝুলছেন, মানুষ তাঁর কী সাহায্য করতে পারে!

দোলগোবিন্দ কিছুক্ষণ চোখ বুঝে রইলেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। ভাবলেন, এটা তো দুঃস্বপ্ন, কেটে যাবে এখুনি।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন কাটল না। দোলগোবিন্দ যখন চোখ খুললেন তখন কলকাতা শহরটা প্রায় মাইলটাক নীচে পড়ে আছে। দোলগোবিন্দ শিব, কালী, হরি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাকার যত দেবদেবীর নাম মনে পড়ল তাঁদের বিস্তর ডাকাডাকি করতে লাগলেন। একবার ছাতাটা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু লাফালে তাঁর হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যাবে না, তা ছাড়া ছাতাটাই যেন তাঁর হাতখানা মুঠো করে ধরে আছে। ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারবেন না।

দোলগোবিন্দ কখনো এরোপ্লেন চড়েননি। উঁচু পাহাড়েও কখনো ওঠেননি। বলতে কী এত উঁচুতে তাঁর এই প্রথম ওঠা। নীচের দিকে চেয়ে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, হাত-পা হিম হয়ে গেল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন।

ধোঁয়া ধোঁয়া দেখার অবশ্য দোষও নেই। একটু বাদেই দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন যে ধোঁয়া নয়, তাঁর চারপাশে মেঘ, আঁতকে উঠে ভিরমি খেতে খেতেও সজাগ রইলেন দোলগোবিন্দবাবু। মেঘ খুব বিপদের জিনিস। মেঘ থেকেই বিদ্যুৎ চমকায় এবং বাজ পড়ে। কাছাকাছি যদি এখন বিদ্যুৎ চমকায় তাহলে বড়ো বিপদ।

বেশ কিছুক্ষণ চারপাশ ঘন কুয়াশার মতো মেঘে ঢাকা রইল। দোলগোবিন্দ কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না, তারপর একসময়ে হঠাৎ আকাশটা হেসে উঠল মাথার ওপর। ঝকমক করছে তারা, বেশ জ্যোৎস্নাও ফুটফুট করছে। পায়ের তলায় পড়ে আছে কোপানো খেতের মতো মেঘের স্তর।

দোলগোবিন্দ আচমকাই দেখতে পেলেন, হাত দশেক দূরে একটা ডিঙিনৌকো বাতাসে ভাসছে। এক হাতে চোখ কচলে নিয়ে তাকালেন, না, ঠিক ডিঙিনৌকো নয়, একটা অতিকায় পটল। কিংবা...

আর ভাববার সময় পেলেন না। ছাতাটা তাঁকে ধরে এনে ওই অতিকায় পটলের মতো বস্তুটার পিঠে খুব যত্নের সঙ্গে নামিয়ে দিল, তারপর ছাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

দোলগোবিন্দবাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই পায়ের নীচে ম্যানহোলের মতো একটা ঢাকনা খুলে গেল এবং তিনি সেই ফুটো দিয়ে ভিতরে পড়ে গেলেন।

নাঃ, খুব একটা জোরে পড়লেন না। তা ছাড়া যেখানে পড়লেন সেখানে ফোম রবারের মতো গদিও ছিল। শুধু ভড়কে যাওয়ায় মুখ দিয়ে 'আঁক' করে একটা শব্দ বেরিয়েছিল তাঁর।

মহাকাশযান, উফো, ভিন্ন গ্রহের জীব ইত্যাদি সম্পর্কে আর পাঁচজনের মতো দোলগোবিন্দবাবুও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই পটলের মতো বস্তুটি যে ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে আসা একটি উফো সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই রইল না। উফোর ভেতরটা

খুবই বড়োসড়ো এবং নানারকম কিম্ভূত যন্ত্রপাতি রয়েছে চারদিকে। দিব্যি ঝলমলে আলো জ্বলছে।

দোলগোবিন্দবাবু উঠে দাঁড়াতেই একটা মানুষ-না, অবিকল মানুষ নয়- অনেকটা মানুষের চেহারার একটা জীব তাঁর দিকে এগিয়ে এল। মানুষের সঙ্গে এর তফাত হচ্ছে এই জীবটার শুঁড় এবং লেজ আছে। বাকিটা মানুষের মতোই। শুঁড়টা হাতির শুঁড়ের মতো অত বড়ো নয়। লেজটা অনেকটা গোরুর লেজের মতো। লোকটার পোশাক বলতে একটা হাফ প্যান্টের মতো বস্তু, গায়ে একটা জহরকোট গোছের জিনিস।

এদিক-সেদিক আরও কয়েকজন অবিকল একরকম জীবকে দেখতে পেলেন দোলগোবিন্দ, তারা সব তখনও মনোযোগে যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করছে।

সামনের জীবটা প্রথমে শুধু দুর্বোধ্য একটা ভাষায় দোলগোবিন্দবাবুকে কিছু একটা বলল। ভাষাটা না বুঝলেও কথা বলার ঢং-এর মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা আছে।

এরপর জীবটা একটা রেডিয়োর মতো যন্ত্র মুখের কাছে তুলে ধরে কথা বলতে লাগল।

আশ্চর্য! পরিষ্কার বাংলা ভাষা।

জীবটা বলল, 'আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। আমাদের ভাষা তুমি বুঝবে না। আমি যে যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তা একটা অনুবাদ যন্ত্র। আমার ভাষাকে তোমার ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে দিচ্ছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ তো!'

ঘাবড়ে গেলেও দোলগোবিন্দ ঘাড় কাত করে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখন শোনো। যে ছাতাটা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তা আমরাই পাঠিয়েছিলাম। আমাদের এই মহাকাশযানে একটা যন্ত্রের মধ্যে একটা ফুটো দেখা দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই ফুটো আমরা বন্ধ করতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের সবজান্তা যন্ত্রমগজের সাহায্য নিই। যন্ত্রমগজ আমাদের তোমার নাম জানিয়ে বলে, একমাত্র এই লোকটাই সেই কেমিক্যাল তোমাদের দিতে পারে যার সাহায্যে ফুটো সারানো সম্ভব। তাই তোমাকে একটু কষ্ট দিয়ে এখানে টেনে এনেছি।'

দোলগোবিন্দ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'কিন্তু আমি তো বৈজ্ঞানিক নই, সামান্য ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি কেমিক্যালের কী জানি?' জীবটা বলল, 'ভালো করে ভেবে দেখো। আমাদের যন্ত্রমগজ কখনো মিথ্যে কথা বলে না। ভুলও করে না। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ও শুধু একটা লোকেরই নাম বলেছে। দোলগোবিন্দ মিত্র। সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

দোলগোবিন্দ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুই তাঁর মনে পড়ল না। তবে মাঝে মাঝে উনি কিছু আজগুবি মিকশ্চার তৈরি করেছেন, করে সেগুলো বাতিল শিশি বা জারের মধ্যে ভরে নিজের আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। তা দিয়ে কোনো কাজ হবে না জেনেও আমতা আমতা করে বললেন, 'দেখুন এই ইয়ে, আমি ফুটো বন্ধ করার কোনো কৌশল জানি না। তবে আমার কাছে কয়েকটা আজগুবি মিকশ্চার আছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনটা কাজে লাগবে তা তো জানি না।'

জীবটা বলল, 'আপনি এক্ষুনি আপনার ল্যাবরেটরিতে চলে যান। ওই ছাতাই আপনাকে নিয়ে যাবে এবং নিয়ে আসবে। যদি আমাদের ছিদ্র সারাতে পারেন, তবে আপনাকে আমরা পুরস্কার দেব।'

তাই হল। ফের প্রাণ হাতে করে ছাতার হাতল ধরে ঝুলে রইলেন দোলগোবিন্দ। ল্যাবরেটরির সামনে এসে দেখলেন, সর্বনাশ, দরজায় তালা দেওয়া।

কী করবেন, ভাবছেন, এমন সময় হাতের ছাতাটা আপনা থেকেই উঠে তালাটায় গিয়ে একটা গুঁতো মারল। সঙ্গে সঙ্গে টক করে খুলে গেল তালা।

ভিতরে আলমারি খুটে মোট পাঁচটা শিশি আর জার হাতে আর বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন দোলগোবিন্দ। ছাতাটা তালায় আর একটা গুঁতো দিতেই সেটা এঁটে গেল। দোলগোবিন্দর হাত আর বগল থেকে শিশি আর জারগুলোও পটাপট চুম্বকের আকর্ষণে ছাতার মধ্যে সেঁধিয়ে শিকগুলোর সঙ্গে লেগে রইল।

ঝুল খেতে খেতে দোলগোবিন্দ এসে সেই মহা পটলের মতো মহাকাশযানে উঠলেন।

সেই জীবটা এগিয়ে এসে দোলগোবিন্দবাবুকে খুব খাতির করে নিয়ে গেল।

পটলটার তলার দিকে একটা ধাতব বাক্সের মতো জিনিস আছে। ফুটোটা সেখানেই।

দোলগোবিন্দবাবুর মনে পড়ল, যে শিশিটায় সবুজ রঙের ঘন পদার্থ রয়েছে তা থেকে দু-ফোঁটা একবার তাঁর টেবিলের ওপর পড়ে যায়। পরে সেটা এমন শক্ত হয়ে জমে গিয়েছিল যে, তিনি সেটা উকো দিয়ে ঘষেও তুলতে পারেননি। সুতরাং দোলগোবিন্দ আর দেরি না করে সবুজ শিশি থেকে দু-ফোঁটা ফুটোয় ঢেলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা শক্ত হয়ে জমে গেল।

জীবটা একটা যন্ত্র থেকে তাপ্পি দেওয়া জায়গাটায় অনেকক্ষণ ধরে তাপ দিল। আবার একটা পাইপ থেকে ভীষণ ঠান্ডা একটা পদার্থ ছড়াল ওর ওপর। কিন্তু ফুটোর তাপ্পি টিঁকে রইল।

লেজ ও শুঁড়িওলা জীবটা দোলগোবিন্দর দিকে চেয়ে খুব বিনীতভাবে বলল, 'চমৎকার! আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন তা আর বলার নয়। এর জন্য আপনাকে আমরা আমাদের গ্রহের দু-টি অতি মূল্যবান জিনিস দিয়ে যাচ্ছি। এ দুটো দিয়ে আপনি ভাগ্য ফেরাতে পারেন।'

জীব ভদ্রলোক দোলগোবিন্দকে দুটো খুদে বাক্স দিলেন। দোলগোবিন্দও ফের ছাতার বাঁট ধরে নেমে নিজের বাসার দোরগোড়ায় নামলেন।

পরদিন সকালে বাক্স দুটো খুলে হাঁ হয়ে গেলেন দোলগোবিন্দ, একটায় খানিকটা কর্কচ লবণ, অন্যটায় একটুখানি চুন। রসিকতা নয় তো!

না। অনেকক্ষণ ভেবে দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন, এ দুটো জিনিস সম্ভবত ওই গ্রহে পাওয়া যায় না, নিশ্চয়ই ভীষণ মূল্যবান। শুঁড়-লেজওলা জীব বোধ হয় জানে না যে পৃথিবীতে ওই দুই বস্তু অঢেল এবং সস্তা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল বটে দোলগোবিন্দর, কিন্তু দমলেন না। সবুজ শিশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন। যেখানে ফুটো পান সেখানেই প্রয়োগ করেন। ছাদের ফুটো, ছাতার ফুটো, বাসনের ফুটো।

ফুটো সারানোয় রীতিমত নামডাক হতে লাগল তাঁর। ক্রমে নৌকো জাহাজ এরোপ্লেনের ফুটো পর্যন্ত সারাতে তাঁর ডাক পড়তে লাগল।

বলা বাহুল্য, দোলগোবিন্দর নাম এখন ফুটোবাবু। কোটি কোটি টাকার মালিক। বিশাল বাড়ি, গাড়ি, কোনো কিছুরই অভাব নেই।

রাতের অতিথি

গোপালবাবু যে! শুনলুম কাল রাতে আপনার বাড়িতে চোর এসেছিল!

ঃও, সে কী কাণ্ড মশাই! চোর বলে চোর! সাংঘাতিক চোর!

চোর-ডাকাতের যুগ পড়েছে মশাই। চারদিকেই চুরির একেবারে মোচ্ছব পড়ে গেছে। কী চুরি হচ্ছে না বলুন। সোনাদানা, টাকাপয়সা, বাসনকোসন, জামাকাপড়, এমনকী জুতো, ঝাঁটা, বস্তা, পাপোশ যা পাচ্ছে চেঁছেপুঁছে নিয়ে যাচ্ছে। পরেশবাবুর বাড়িতে যেদিন চুরি হল তার পরদিন তো তাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকু পর্যন্ত ছিল না।

তা যা বলেছেন। চোরদের আস্পদ্দা দিন দিন বাড়ছে।

অতি সত্য কথা। নরেনবাবুর বাড়িতে যে চোরটা এসেছিল সে তো রীতিমতো নরেনবাবুকে দু-চার কথা শুনিয়ে যেতে ছাড়েনি। কিপটে, কঞ্জুস, নীচু নজর, রুচিহীন, এমনকী এমন কথাও বলে গেছে, আপনার বাড়িতে চুরি করতে এসে যে ভুল করেছি, গঙ্গাস্নান করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে...

বটে! এ তো সাংঘাতিক অপমান।

অপমান বলে অপমান! নরেনবাবু তো সেই থেকে ভারি মনমরা হয়ে পড়েছেন। দু-দিন অন্নজল গ্রহণ করেননি। তবে কিনা বিশ্বকঞ্জুস নরেনবাবুর সেই থেকে হাত বেশ দরাজ হয়েছে। এখন দেখছি বাজার থেকে বড়ো মাছ, ময়রার দোকান থেকে সন্দেশ এসব কিনছেন।

তাই নাকি! এই জন্যেই সব জিনিসেরই খারাপ আর ভালো দুটো দিক থাকে।

তা আপনার বাড়ি থেকে কী কী চুরি গেল?

সেসব এখনও হিসেব করা হয়নি।

কিন্তু গোপালবাবু, আপনার কবজিতে রোলেক্স হাতঘড়িটা এখনও দেখতে পাচ্ছি যে! ব্যাপারটা কী? চোর কি ওটা দামি ঘড়ি বলে বুঝতে পারেনি?

পারেনি মানে! ঘড়িটা একটানে খুলে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কত সালের কোন মডেল, কত দাম সব গড়গড় করে বলে গেল মশাই।

তাজ্জব কথা! তবু নেয়নি?

না। ঘড়িটা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'এ ঘড়ির এখন অনেক দাম। সাবধানে রাখবেন।'

বলেন কী? কলিযুগ কি শেষ হয়ে গেল নাকি মশাই? তারপর ধরুন, আপনার স্ত্রীর গলায় একটা পনেরো ভরির সীতাহারের কথাও যেন শুনেছি। সবাই বলে খুব দামি হার নাকি। তা সেটা নিশ্চয়ই গেছে।

উঁহু। সীতাহারটা তো ছুঁলই না। দূর থেকেই বলে দিল চোদ্দো ভরি আট রতি মাপ আছে। এখনকার বাজার দর নাকি দেড় লাখ টাকার ওপরে।

সেটাও নেয়নি! এ আবার কেমনধারা চোর? আপনার লোহার আলমারিটা খোলেনি?

খুলেছে বই কী। চোর বলে কথা! খুলল, দেখল।

ওই আলমারিতেই তো বোধ হয়-

ঠিকই ধরেছেন। আমার সব ক্যাশ টাকা ওই আলমারিতেই থাকে। আজ লেবার পেমেন্টের জন্য আড়াই লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ওই আলমারিতেই রেখেছিলাম। টাকাগুলো বের করে গুনে-টুনে দেখলও।

তারপর থলিতে ভরল তো!

হ্যাঁ, থলিও তার সঙ্গে একটা ছিল বটে। রাকস্যাকের মতো একটা ব্যাগ। ভরার উপক্রমও একবার করেছিল। তারপর নিজের মনে 'না থাক' বলে যেমন ছিল তেমনি আবার আলমারিতে সাজিয়ে রেখে দিল।

আড়াই লাখ টাকা! চোর আড়াই লাখ টাকা হাতে পেয়েও নিল না মশাই! ঃএ, আমারই তো হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আপনার সেই দুবাই না তেহরান থেকে

আনা হিরের কালেকশনটা? লোকে তো বলে পূর্ব ভারতে আপনার মতো হিরের কালেকশন কারও কাছে নেই।

ঠিকই বলে। আমি বহুকাল ধরেই হিরে কালেকশন করে আসছি, ওটাই আমার নেশা। রেয়ার সব হিরে মশাই। লাখ লাখ টাকা দাম।

তা সেসব কি ছাড়তে পারে?

ছাড়েওনি। আমাকে দিয়ে জোর করিয়ে সিন্ধুক খুলিয়ে সব আঁতিপাঁতি করে দেখেছে। দেড়শো হিরে ছাড়াও নানান সাইজের মুক্তো, নীলা, পোখরাজ, চুনি, গোমেদ মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকার পাথর।

আহা, শুনেই আমার পিলে চমকাচ্ছে। তা গেল তো সেগুলো! যাবেই। অত দামি জিনিস কি বাড়িতে রাখতে আছে মশাই? ব্যাঙ্কের ভল্টে বা মাটির নীচে পুঁতে-টুঁতে রাখতে হয়।

তা বটে। সেরকম একটা ফন্দি মনে মনে ঠিকও করে রেখেছি। কিন্তু সেটা কার্যকর করার আগেই কাল মধ্যরাতে চোরের আবির্ভাব।

জানলা ভেঙে ঢুকল বুঝি?

না, অতি ঘোড়েল চোর। ভাঙচুর করলে তো শব্দ শুনতে পেতাম। আমার আবার ভারি সজাগ ঘুম। বাড়ির দেউড়িতে দারোয়ান আছে, দু-দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর, টোটাভরতি বন্দুক আছে, বালিশের তলায় পিস্তল নিয়ে শুই। সুতরাং মোটামুটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্রই বলা যায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার বাড়িটা তো দুর্গ-বিশেষ। কুকুর দুটোও খুবই তেজি। দারোয়ান দুটোও বেশ তাগড়াই চেহারার বটে। তাহলে চোরটা ঢুকল কীভাবে বলুন তো!

সেটাই রহস্য। আমি চোরটাকে জিজ্ঞেসও করেছিলুম, 'বাপু হে, এ বাড়িতে ঢোকা তো সহজ নয়! তুমি ঢুকলে কী করে?'

জবাবে কী বলল?

বলল, 'দুনিয়ায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। সব জায়গাতেই ঢোকা সম্ভব। আমি আপনার বাড়ির সামনের তেঁতুল গাছ থেকে হুক সমেত একটা নাইলন দড়ি ছুড়ে ছাদের রেলিঙে আটকে দিয়ে সেইটে বেয়ে ছাদে এসে নামি।'

এ তো দেখছি টারজান!

তা বলতে পারেন। দিব্যি কসরত করা চেহারা। ভদ্রঘরের ছেলের মতোই মনে হয়।

দিনকাল যা পড়েছে, ভদ্রঘরের বেকার ছেলেদেরও এইসব পথেই নামতে হচ্ছে। তা তারপর কী হল?

চোরেরা নিঃশব্দে চুরি করে, সেটাই রেওয়াজ। কিন্তু এর কায়দা আলাদা। খুব মোলায়েম গলায় আমার নাম ধরে ডেকে ঘুম ভাঙাল।

নাম ধরে? ছিঃ ছিঃ, আপনি বয়স্ক মানুষ।

না, সে আমাকে গোপালকাকা বলে ডেকেছিল।

বাঁচোয়া। তারপর বলুন।

আমি পিস্তল খুঁজতে গিয়ে দেখি, সেটা যথাস্থানে নেই। চোরটা বলল, 'অস্ত্রশস্ত্র আমি সরিয়ে নিয়েছি। আলমারি সিন্দুক সব খুলুন। সময় নেই।'

ওরে বাবা! এ তো চোরের বেশে ডাকাত!

তাও বলতে পারেন। সব দেখল। টাকাপয়সা, হিরেজহরত, সোনাদানা, কিন্তু কোনোটাই তার যেন তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। হিরেজহরতগুলো একটু নাড়াচাড়া করল বটে, কিন্তু যেন তেমন গা করল না।

এ কেমন বেয়াদব চোর মশাই! এত কসরত করে ঢুকল, সব হাতের নাগালে পেল তাও তার গাল উঠল না কেন?

সেইটেই রহস্য। সব দেখেশুনে বলল, 'আপনার আর কোনো দামি জিনিস নেই?' আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এর চেয়ে দামি জিনিস আর কী থাকবে?' চোরটা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এসব দামি জিনিস বটে, কিন্তু আমার দরকার লাগবে না।'

বটে! খুব নবাবপুত্তুর দেখছি। তারপর?

তারপর সে বলল, 'আপনার বইপত্র কোথায় থাকে?' আমি বললুম, 'নীচের লাইব্রেরি ঘরে।'

বইপত্র! ছোঃ! বইপত্র দিয়ে কী হবে?

সেইটে তো জানি না। তবে নিয়ে যেতে হল। দেখলাম বইপত্রে তার বেশ আগ্রহ আছে। বিস্তর বই বের করে করে দেখল, আবার যত্ন করে জায়গায় রেখে দিল। অনেকক্ষণ ধরে প্রতিটি আলমারি ঘাঁটল সে।

বই ঘেঁটে সময় নষ্ট করা কেন বাপু?

আমিও তাকে সে-কথাই বলেছিলুম। সে বলল, 'ও আপনি বুঝবেন না।'

তারপর?

বললে বিশ্বাস করবেন না, খুঁজে পেতে সে একখানা বই বের করল। বেশ পুরোনো বই। নাম নীলবসনা সুন্দরী। কার লেখা জানি না। বইপত্র পড়ার অভ্যাস আমার নেই। বাপ-দাদার আমল থেকেই ওগুলো পড়ে আছে।

নীলবসনা সুন্দরী! তা সেটা কী করল?

সেটাই চুরি করল মশাই। বলল, 'এটা চুরি করতেই আমার আসা।'

শুধু একটা বই?

হ্যাঁ। বইটা নিয়ে সে হাওয়া হয়ে গেল মশাই!

আশ্চর্য! এরকম আহাম্মক আর দেখিনি!

ভগবানের আবির্ভাব

ক্যানসারের ওষুধ যে প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা লোহিতাক্ষ নিজেই বুঝতে পারছিলেন। উত্তেজনায় তাঁর বুক কাঁপছিল, তেষ্টা পাচ্ছিল, হাত-পা ঠান্ডা আর মাথা গরম হয়ে উঠছিল।

লোহিতাক্ষর সামনে একটা কাচের পাত্র বুনসেন বার্নারের ওপর বসানো। ভিতরে একটা সবুজ তরল টগবগ করে ফুটছে। সবুজ রংটা আরও গাঢ় হয়ে কালচে মেরে এলে তিনি সেটা একটা পিউরিফায়ারের মধ্যে রাখবেন। একটা ফানেলের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ তরলটি একটি টেস্ট টিউবে এসে জমবে। তারপর আর মাত্র দুটো পর্যায় থাকবে। ক্যানসারগ্রস্ত একটা ইঁদুর খাঁচায় ধুঁকছে। তার ওপর প্রয়োগ করবেন। কিন্তু ফলাফল কী হবে তা লোহিতাক্ষ জেনে গেছেন। তাঁর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সেটা হল, কপালের বাঁ-দিকে একটা আব। যখনই তিনি কোনো সাফল্যের কাছাকাছি আসেন তখনই ওই আবটার মধ্যে একটা কুড় কুড় শব্দ হয়। ঠিক যেন একটা পোকা আবের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কুড় কুড় কুড় কুড় করে আনন্দে গান গায়।

লোহিতাক্ষর আবের মধ্যে পোকাটা এখন কুড় কুড় কুড় কুড় শব্দ করছে; লোহিতাক্ষ যখন সর্দিকাশির ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন তখনও আবের মধ্যে এরকমই শব্দ হয়েছিল। আর সে কী ওষুধ! চার বার নাক ঝাড়লেই সর্দি সাফ। সেবার সর্দির ওষুধ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য অতএব দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজও তাঁর বাঁধা। আবের ওপর আদর করে একটু হাত বুলিয়ে নিলেন লোহিতাক্ষ।

এমন সময়ে ল্যাবরেটরির দরজা খুলে বনমালী ঢুকল। বনমালী লোহিতাক্ষর কাজের লোক।

'বাইরে দু-জন লোক এসেছেন।'

'এই সকালে আবার কে এল?'

'তা কী জানি। একজন বেঁটে, অন্যজন লম্বা। ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে না। যান গিয়ে দেখুন।'

'ভালো লোক নয় কী করে বুঝলি?'

'আপনিও বুঝবেন। আমি শুধু কয়েছিলুম যে, বাবু এখন কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে না, তাইতে প্রায় মারতে এল।'

'ঃও তাই বুঝি খারাপ লোক! তা কী চায় তারা?'

'তা আর জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। আপনার ভিজিটার আপনি গিয়ে সামাল দিন।'

লোহিতাক্ষ সাধারণত উটকো লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। কিন্তু আজ তিনি নিজের সাফল্যের আনন্দে এত ডগমগ যে, বার্নারের তাপটা কমিয়ে উঠে পড়লেন, 'চল তো গিয়ে দেখি কেমন লোক।'

লোহিতাক্ষর বাইরের ঘরে যে দু-জন অপেক্ষা করছিল তারা সুবিধের লোক নয় তা এক নজরেই বোঝা যায়। বেঁটে লোকটা ভীষণ বেঁটে, পাঁচ ফুটের নীচেই হবে। আর তার চেহারা অনেকটা ফুটবলের মতো গোলাকার। লম্বা লোকটা আবার বিসদৃশ রকমের লম্বা এবং দৈত্যের মতোই তার স্বাস্থ্য। মিল একটা জায়গায়। দু-জনের চোখই ভাঁটার মতো জ্বলন্ত। দেখলেই মনে হয়, তারা চোখের ইশারায় মানুষের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কোন দেশের লোক তাও বুঝবার উপায় নেই। গায়ের রং তামাটে উজ্জ্বল, মুখ ভাবলেশহীন, চুল কালো। সাহেব, বাঙালি, চীনে সবই হতে পারে।

'কী চাই আপনাদের?'

বেঁটে লোকটা তার ভাঁটার মতো চোখ দুটোকে গনগনে করে লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে থাকে। পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'তুমিই জড়িবুটিওয়ালা লোহিতাক্ষ সেন?'

এ কথায় কার না রাগ হয়? নোবেলজয়ী বৈজ্ঞানিক লোহিতাক্ষ বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী। তাঁকে প্রথম পরিচয়ে 'তুমি' করে সম্বোধন আর 'জড়িবুটিওয়ালা' বললে তো তাঁর খেপে যাওয়ারই কথা। লোহিতাক্ষও খেপলেন এবং দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'তার মানে? এটা কি ইয়ার্কির জায়গা?'

বেঁটে লোকটা একটা মস্ত চুরুট ধরিয়ে এক গাল কটু গন্ধের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'শান্ত হও। তুমি যে একটা মেডেল পেয়েছ তা আমরা জানি।'

লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে বললেন, 'মেডেল। কীসের মেডেল?'

'ওই যে নোবেল প্রাইজ না কী যেন! তা সে যাকগে, তুমি যে ভালো ছেলে তা আমরা জানি।'

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপছিলেন বটে, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতেও তিনি লক্ষ করলেন, বেঁটে লোকটার বাঁ-কপালে একটা কালো রঙের জরুল। লোকটা মাঝে মাঝে জরুলটায় হাত দিচ্ছে।

লোহিতাক্ষ বললেন, 'আপনারা বেরিয়ে যান। আমার বাজে কথায় নষ্ট করার মতো সময় নেই।'

বেঁটে লোকটা একটু গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, 'কেন? কী এমন রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত আছ হে? অ্যাঁ।'

বলেই লোহিতাক্ষর মুখে এক ঝাঁক ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে অপমানসূচক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। তারপর বলল, 'আগেকার লোকেরা ভক্তি শ্রদ্ধা জানত, আর এখনকার তোমরা! ছ্যা ছ্যা, একটু ভদ্রতাও জাননা দেখছি।'

এ কথায় লোহিতাক্ষ লোকটাকে খুন করার জন্য পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর রিভলবার নেই। কস্মিনকালেও ছিল না।

বেঁটে লোকটা কিন্তু লোহিতাক্ষর মনের কথা টের পেল এবং সঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'খেলনাটা দাও তো।'

দৈত্যটা একটা রিভলবার বের করে বেঁটের হাতে দিল। আর বেঁটেটা রিভলবারটা নিজের বুকের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল। ভীষণ একটা শব্দ ও ধোঁয়ার ভিতরে বুলেটটা লোকটার বুকে লেগে ঠং করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

বেঁটে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, 'দেখলে তো! বিশ্বাস না হয় নিজেই চেষ্টা করে দেখো। এই নাও রিভলবার। জেনুইন জিনিস, সত্যিকারের গুলিই ভরা আছে।'

বলতে বলতে রিভলবারটা এগিয়ে দিল লোকটা।

লোকটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আর এক কুণ্ডলী ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আরে লজ্জা কী? চালাও না। আচ্ছা আনাড়ি রে বাবা।'

লোহিতাক্ষ রিভলবারটা তুলে দুম করে গুলি করলেন। গুলিটা আগের বারের মতোই লোকটার বুকে লেগে ছিটকে পড়ল।

লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল, 'কী বলো হে মেডেল-পাওয়া কম্পাউন্ডার, সুবিধে করতে পারলে? দাও খেলনাটা আমার হাতে দাও। আর শোনো, আমি হচ্ছি ভগবান। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নেই।'

লোহিতাক্ষ রাগে গড়গড় করে বললেন, 'ভগবানই হোন আর যাই হোন আপনি অত্যন্ত অভদ্র।'

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। গা দুলিয়ে, ভুঁড়ি নাচিয়ে। তারপর বলল, 'ওরে বাপু, আমার নাম ভগবান নয়, আমি স্বয়ং ভগবান। যাদের মূর্তি-টুর্তি তোমরা পুজো করো তাদেরই একজন।'

লোহিতাক্ষ নাস্তিক লোক। আর নাস্তিক বলেই তাঁর ভগভদ্ভক্ত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই খুব ঝগড়া হয়। তাঁর স্ত্রী মোটেই তাঁর নাস্তিকতাকে ভালো চোখে দেখেন না।

লোহিতাক্ষ লোকটার দিকে চেয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, 'ভগবান তো একটা বোগাস ব্যাপার। আমি ওসব বিশ্বাস করি না। আর আপনাদেরও আমার ভালো লোক মনে হচ্ছে না। আপনি থার্ড গ্রেড ম্যাজিসিয়ান মাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এখন আসুন। নমস্কার।'

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'বিশ্বাস করো না কী হে? জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছ চোখের সামনে। কত লোক আমাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য কত সাধ্যসাধনা করে।'

'আমার ইয়ার্কি করার সময় নেই। ল্যাবরেটরিতে আমি একটা জরুরি কাজ করছি। আপনারা আসতে পারেন।'

বলতে বলতেই লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে দেখলেন, বেঁটে লোকটার মধ্যে কী-একটা পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেখা গেল, মেঝের ওপর পাতা বাঘছালে স্বয়ং মহাদেব বসে আছেন, ছাই মাখা শরীর, মাথায় জটাজুট, ধ্যান-নিমীলিত চোখ, সারা গায়ে ফোঁস ফোঁস করে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোহিতাক্ষ তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে লাগলেন। ততক্ষণে শিবের বদলে ধনুর্ধর রামচন্দ্র দেখা দিয়েছেন। পরমুহূর্তেই রামচন্দ্র গায়েব হয়ে বংশীধারী কৃষ্ণকে দেখা গেল।

বেঁটে লোকটা তেমনি গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, 'দেখলে তো! এবার প্রত্যয় হল?'

লোহিতাক্ষ একটু কেমন যেন হয়ে গেলেন। ম্যাজিসিয়ানরা অনেক কৌশল জানে ঠিকই, কিন্তু ম্যাজিক বলে তাঁর মনে হচ্ছিল না। একটু ধন্দে পড়ে কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন।

এমন সময় অন্দরমহল থেকে তাঁর স্ত্রী একটা শাঁখ হাতে আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন। 'তোমার যে মহাপাপ হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান এসেছেন আর তুমি তাঁকে গালমন্দ করছ? ওরে বনমালী, শিগগির জল বাতাসা আর ফুল নিয়ে আয়, ধূপ দীপ জ্বালা...'

বেঁটে লোকটা খুব ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগল। লোহিতাক্ষর স্ত্রী ধূপ দীপ জ্বেলে জল বাতাসা আর ফুল দিয়ে ঘণ্টা নেড়ে যাবতীয় স্তবস্তুতি আউড়ে যেতে লাগলেন। লোহিতাক্ষ বেকুবের মতো চেয়ে দেখতে লাগলেন।

পুজো হয়ে গেলে লোহিতাক্ষকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে গিন্নি বললেন, 'হলটা কী তোমার? প্রণাম করো।'

লোহিতাক্ষ অগত্যা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটা প্রণামও করে ফেললেন।

বেঁটে লোকটা খুব খুশি হয়ে বলল, 'লোহিতাক্ষ গাড়ল হলেও বউমাটি ভারি লক্ষ্মীমন্ত। তা তোমরা বর-টর চাইবে না?'

বরের কথায় কর্তা-গিন্নি মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

লোকটা একটু হেসে বললেন, 'আরে লজ্জা কীসের? চেয়ে ফেলো, চেয়ে ফেলো, আমার আর বিশেষ সময় নেই।'

গিন্নি ধরা গলায় বললেন, 'আমি আর কী চাইব বাবা? স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে থাকতে পারি...'

'তথাস্তু।'

লোহিতাক্ষ করুণ গলায় বললেন, 'দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজটি...'

'তথাস্তু।'

এই বলে ভগবান উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বললেন, 'তবে বাপু, আমারও কিছু চাওয়ার আছে। ওই যে কী একটা ওষুধ বানাচ্ছ, ওটা আর বানিয়ো না, একটা-দুটো দুরারোগ্য রোগ আছে বলেই মানুষ এখনও ভগবানের ডাক খোঁজ করে। রোগভোগ লোপাট হয়ে গেলে সেটুকুর পাটও উঠে যাবে। তুমি বরং একটা দাদের মলম বা আমাশয়ের ওষুধ বানাও, তাতেই নোবেল পেয়ে যাবে। বুঝেছ?'

'যে আজ্ঞে। কিন্তু...'

'আর কিন্তু নয়। এখনই গিয়ে সব ফর্মুলা নষ্ট করে দাও গে। শুভস্য শীঘ্রম।'

'ওকে যেতে হবে না ঠাকুর, আমিই গিয়ে সব নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসছি।' বলে গিন্নিই উঠে গেলেন।

বেঁটে লোকটা একটা বাতাসা মুখে পুরে উঠে পড়ল, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বলল, 'চলি হে। অনেকটা দূর যেতে হবে। যাওয়ার আগে আসল কথাটা বলে যাই। আমি ভগবান-টগবান নই। তবে গ্রহান্তরের মানুষ। পৃথিবীতে অনেকদিন ধরেই আমাদের

আনাগোনা। বাঁদর থেকে তোমাদের মানুষ বানিয়েছি আমরাই। বিজ্ঞানে তালিম দিয়েছি, চাকা বানানো থেকে অ্যাটম বোমা তৈরি অবধি সব ব্যাপারেই আমাদের অদৃশ্য হাত ছিল। আর এসব যা দেখালুম তোমায় সবই বুজরুকি বটে, তবে আসল ভগবানও একজন আছেন। কিন্তু তত দূরে তোমাদের ধারণা পৌঁছোয় না বলে এই আমাদেরই তোমরা এতকাল ভগবান ভেবে পুজো আচ্চা করে এসেছ...'

লোহিতাক্ষ লাফিয়ে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ। তাহলে আমার দ্বিতীয় নোবেলের কী হবে?'

'তার আমি কী জানি? আমার বর ফলে কি না তা আমি জানি না।'

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? ঠিক আছে ফর্মুলা আমার মুখস্থ। আমি ক্যানসারের ওষুধ আবার বের করে ফেলব।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'না বের করবে না। বের করলে কী হবে জান?'

'কী হবে?'

'তুমি যে রোজ চুষিকাঠি ছাড়া ঘুমোতে পার না, সে-কথা সবাইকে জানিয়ে দেব।'

কথাটা ঠিক। লোহিতাক্ষ এত বড়ো বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চা ছেলের মতো একটা স্বভাব আছে তাঁর। এখনও চুষিকাঠি ছাড়া তিনি ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু সে কথা বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানে না।

লোহিতাক্ষ স্তিমিত হয়ে গিয়ে বললেন, 'যে আজ্ঞে।'

লোক দুটো বেরিয়ে গেল।

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া

১

ওই গবা পাগল .বরিয়েছে। গায়ে একটা সবুজ রঙের আলপাকার কোর্ট আর ঢোলা কালো রঙের পাতলুন। বড়ো বড়ো কটাশে চুল রোগাটে মাঝারি চেহারা। এক গাল দাড়ি, বিশাল মোচ। পায়ে খয়েরি রঙের ক্যাম্বিসের জুতো। হেঁকে বলছিল, 'কেয়াসমাস! কেয়াসমাস! বর্বর ছেলেরা দৌড়িয়া ফেরে। সরলরেখা কাকে বলে? দু-টি বিন্দুর মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বই হচ্ছে সরলরেখা। এন এ সি এল ইজ সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড ইট ইজ কমন সলট। ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষে আসে চোদ্দোশো আটানব্বই সালে . . . হেঁ হেঁ জানি বাবা, সব জানি।'

সকাল বেলা হরিহরবাবু আর গদাধরবাবু বাজার করে ফিরছিলেন। গবা পাগলাকে দেখে হরিহরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঃএ, আবার দেখি গবাটা উদয় হয়েছে! ছেলেপেলেগুলোর মাথা খাবে আবার!'

গদাধরবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনার কথাটা মানতে পারছি না হরিহরবাবু। গবা পাগলা যে একজন ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক এ কথা সবাই জানে।'

হরিহরবাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিকরা তো আজকাল গাছে ফলে কিনা! পেরেছে গবা পাগলা আপনার দেওয়াল ঘড়িটা সারাতে?'

গদাধরবাবু একটু গরম হয়ে বললেন, 'পেরেছে বই কী! আলবাত পেরেছে।'

হরিহরবাবু হো-হো করে হেসে বলেন, 'তাই বুঝি আপনার দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা উলটোদিকে ঘোরে?'

'সেইটেই তো বিস্ময়! আর কার ঘড়ির কাঁটা উলটোদিকে ঘোরে বলুন তো! বৈজ্ঞানিক ছাড়া পারে কেউ ঘড়ির কাঁটা বিপরীতগামী করতে?'

এইভাবে হরিহরবাবু আর গদাধরবাবুর মধ্যে একটা তর্কবিতর্ক পাকিয়ে উঠছিল।

আগের দিন দুধের মধ্যে একটা কুঁচো চিংড়ি পেয়েছিলেন হালদারবাড়ির বুড়ি। তাই গয়লাকে বকছিলেন। গবা পাগলার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বললেন, 'বাব্বাঃ! কতদিন পরে গবাসাধু আবার এ পোড়া শহরে ফিরেছে! এবার আমার কাঁকালের ব্যথাটার একটা হিল্লে হবে।'

গুণধরবাবু তাঁর বাগানে নেতিয়ে পড়া একটা লাউডগাকে মাচানে তুলছিলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে গবা পাগলাকে দেখে গিন্নিকে ডাক দিয়ে বললেন, 'গবা চোরটা আবার এসেছে। জিনিসপত্র সব সামলে রেখো। সেবার ও হাওয়া হওয়ার পর থেকেই আমাদের দু-দুটো কাঁসার বাটি গায়েব হল।'

দুই ভাই আন্দামান আর নিকোবর জানলার ধারে বসে অ্যানুয়্যাল পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল। আন্দামান অঙ্কে কাঁচা, নিকোবর কাঁচা ইংরেজিতে।

আন্দামান গবা পাগলাকে জানলা দিয়ে দেখেই চাপা গলায় বলল, 'আগের বারের মতো এবারেও গবাদা ঠিক পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে চেঁচিয়ে অঙ্ক বলে দেবে। বাঁচা গেল বাবা, অঙ্ক নিয়ে যা ভাবনা ছিল!'

নিকোবরও চাপা গলায় বলল, 'আমার কুড়ি নম্বরের ট্রানস্লেশনের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।'

বোধনের সকালের পড়া হয়ে গেছে। এবার নেয়ে-খেয়ে স্কুলে যাবে। হাতে খানিকটা সময় আছে দেখে সে তার মহাকাশযানে কিছু যন্ত্রপাতি লাগাচ্ছিল। তার মহাকাশযানটা দেখলে যে-কেউ অবশ্য নাক সিঁটকাবে। কারণ সেটা আসলে একটা ফুলঝাঁটা। ঝাঁটার হাতলের সঙ্গে গোটা চারেক হাউই দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। ঝাঁটার সঙ্গে একটা কৌটোও বাঁধা আছে। তার ইচ্ছে ওই কৌটোয় কয়েকটা পিঁপড়ে ছেড়ে দেবে। আজ সে মহাকাশযানের সঙ্গে মেজোকাকার সাধের পকেট-ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা চুপিচুপি লাগিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় রাস্তায় গবা পাগলার হাঁকডাক শোনা গেল, 'দেখবি যদি ভূতের নাচ, ধর বাগিয়ে ঝাঁটাগাছ, ডিং মেরে ওঠ গাধার পিঠে। নন্দখুড়োর ঘর পেরিয়ে, ঈশানকোণে যা হারিয়ে, লাগবে হাওয়া মিঠে। দেখতে পাবি তিনঠেঙে গাছ, তাহার ডালে ঝুলতেছে মাছ, নীচে গহিন ছায়া। সেই ছায়ারই কায়া ধরে ভূত-ভূতুড়ে অদ্ভুতুড়ে নাচতেছে সব মায়া . . .'

বোধন দৌড়ে রাস্তার ধারে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'ও গবাদা! মঙ্গলগ্রহ থেকে জ্যান্ত পাথর এনে দেবে বলেছিলে যে! সেইসব পাথর নাকি আপনা থেকেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, ছোটো থেকে বড়ো হয়, রেগে গেলে একটা গিয়ে আর একটাকে ঢুঁ মারে!'

হেঃ হেঃ করে হেসে গবা পাগলা বলে, 'চার দু-গুণে আট এ তো সবাই জানে। কিন্তু বলো তো বাছাধন, হ্যারিকেনকে পেনসিল দিয়ে গুণ করলে কত হয়?'

থানার দারোগা কুন্দকুসুমের নামটা যত নরম, মানুষটা ততই শক্ত। ছ-ফুট লম্বা দশাসই চেহারা। গলার স্বরে স্পষ্ট বাঘের ডাক। রোজ আড়াইশো করে বুকডন আর বৈঠক মারেন। রাগলে ভিসুভিয়াস। বাস্তবিকই নাকি রাগন্ত অবস্থায় তাঁর মাথার চারপাশে একটা লালচে মতো আভা অনেকে দেখেছে। কুন্দকুসুমের ভয়ে এই অঞ্চলের গুন্ডা বদমাস চোর বাটপাড় সব রোগা হয়ে যাচ্ছে, ভালো করে খেতে পারে না, ঘুমোতে পায় না, ঘুমোলেও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে যায়। সকাল বেলায় কুন্দকুসুম সবে থানায় এসে কোমরের বেল্ট খুলে রেখে গায়ে একটু হাওয়া লাগাচ্ছেন, এমন সময় রাস্তায় গবার চ্যাঁচানি শোনা গেল, 'সবাই জানে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু বুদ্ধি পালালে কী বাড়ে? অ্যাঁ?'

কুন্দকুসুম সিধে হয়ে বসে বললেন, 'স্পাইটা আবার এসেছে! ওরে, নজর রাখিস। নজর রাখিস!'

কিন্তু গবা কোথাকার স্পাই, কার স্পাই তা কুন্দকুসুম ঠিক জানেন না। এর আগেও তিনি গবাকে ধরে এনে বিস্তর জেরা করেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন, কোনো তথ্য আবিষ্কার করতে পারেননি। তাতে তাঁর সন্দেহটা আরও ঘোরতর হয়েছে।

'এই যে গবাঠাকুর'-বলে একপাল গেঁয়ো মেয়ে-পুরুষ রাস্তার মাঝখানেই ঢিব ঢিব করে গবা পাগলাকে প্রণাম করল। তারা সব হাটবারে আনাজপাতি, ধামাকুলো, গোরু ছাগল মুর্গি ডিম, ধান চাল, দড়িদড়া নিয়ে বেচতে যাচ্ছে শহরে। তাদের ধারণা, গবাঠাকুর আকাশে উড়তে পারে, অদৃশ্য হতে পারে, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে, যেকোনো রোগ হাতের ছোঁয়ায় সারিয়ে দিতে পারে।

গবা তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'হবে হবে, সব হবে, একবার যদি ছুঁচে সুতোটা পরাতে পারি। দেখিসখন, সব অকাল চলে যাবে, খেতে খেতে ধান আর ধরবে না, পুকুরে নদীতে মাছের গাদি লেগে যাবে। দাঁড়া একবার, ছুঁচে সুতোটা পরাই...'

বাঘা ওস্তাদগাইয়ে রাঘব ঘোষ সকালের দিকটায় গলা সাধছিলেন। রোজই সাধেন। ভারি দাপুটে গলা। সাতটা সুর একেবারে রামধনুর মতো তাঁর গলায় লেগে থাকে।

ঘণ্টা তিনেক গলার কসরত করায় এই শীতকালেও বেশ ঘেমে গেছেন রাঘব ঘোষ। একটু জিরিয়ে জর্দাপান মুখে দিয়ে তানপুরাটা সবে তাবায় জড়িয়ে ধরে পিড়িং করেছেন

মাত্র অমনি মূর্তিমান গবা ঘরে ঢুকে বলল, 'আরে সা লাগাও! সা লাগাও! একবার যদি ঠিকমতো সা-টা লাগাতে পার, তাহলেই হয়ে গেল, সুরে জগৎ ভেসে যাবে। সা লাগালে রে আসবে মা রে বাবা রে বলে তেড়ে। রে এলে কি আর গা দূরে থাকবে গা? এসে যাবে গা দোলাতে দোলাতে। গা যদি এল তবে মা-এর জন্য আর ভাবনা কী গো? মা তো মায়ের মতো কোল পেতেই আছে। আর মা-এর পা ধরেই সেধে আসবে পা! পা-এর পিছু পিছু ধেয়ে আসবে ধা। ধা ধাঁ করেই আসবে হে। আর কী বাকি থাকে? 'নি'? নির্ঝঞ্ঝাটে আসবে, নির্ঝঞ্ঝাটে আসবে। নিত্যি নিত্যি আসবে নৃত্য করতে করতে আসবে। এইভাবেই পৌঁছে যাবে তার গ্রামে। ধরো ফের চড়ায় গিয়ে সা-এর চুলের মুঠি। বুঝলে? সা লাগাও হে, ঠিকমতো সা লাগাও।'

রাঘব ঘোষ বুঝলেন না। তবে মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গবা এল, জীবনে আর শান্তি রইল না।

তবে গবা আসায় শহরে যে একটা শোরগোল পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

উদ্ধববাবু ভারি রাশভারী লোক। তাঁর সারা জীবনটাই রুটিনে বাঁধা। তেমনই রুটিনে বাঁধা তাঁর তিন ছেলে আর তিন মেয়ের চলাফেরা, লেখাপড়া, খেলাধুলো। তাঁর গিন্নিও রুটিন মেনে চলেন। চাকরবাকর ঝি তো বটেই, তাঁর বাড়ির গোরু ছাগল কুকুর বেড়াল পর্যন্ত কেউই রুটিনের বাইরে পা দেয় না। উদ্ভববাবু বলেন, ডিসিপ্লিন ইজ দি এসেনস অব সাকসেস।

মুশকিল হল মাসখানেক আগে তিনি একটা ভালো জাতের কাকাতুয়া কিনেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, কাকাতুয়াটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে এমন তৈরি করবেন যাতে সেটা তাঁর গবেট ছোটো ছেলে রামুটাকে উঠতে বসতে ডিসিপ্লিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। উদ্ধববাবুর ছোটো ছেলেটাই হয়েছে সবচেয়ে সৃষ্টিছাড়া। শাসনে থাকে, দুষ্টুমিও বেশি করতে পারে না বটে, কিন্তু সে এই বাড়ির আবহাওয়া ঠিক মেনেও চলে না। আকাশে রামধনু উঠলে রামু হয়তো বাইরে গিয়ে দু-হাত তুলে খানিক নেচে আসে। ঘুড়ি কাটা গেলে দৌড়ে যায় ধরতে। অঙ্কের খাতায় একদিন লিখে রেখেছিল, 'কে যায় রে ভোঁ-গাড়িতে উড়িয়ে ধুলো? যা না ব্যাটা . . .' দেখে শিউরে উঠেছিলেন উদ্ধববাবু। ওইটুকু ছেলে কবিতা লিখবে কী? কিন্তু কতই-বা আর একটা ছেলের পিছনে লেগে থাকবেন তিনি? তাঁর তো কাজকর্ম আছে! মস্ত উকিল, দারুণ নামডাক, ব্যস্ত মানুষ। তাই ঠিক করেছিলেন, কাকাতুয়াটাকে রামুর পিছনে লাগিয়ে দেবেন। সে বলল, 'রামু পড়তে বসো। রামু এবার স্নান করতে যাও। রামু, আজ আধ ঘণ্টা বেশি খেলেছ। রামু রামধনু দেখতে যেয়ো না। রামু, কাটাঘুড়ি ধরতে নেই . . . ইত্যাদি।'

কিন্তু মুশকিল হল, কাকাতুয়াটা প্রথম দিনই নিজে থেকে বলে উঠল, 'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। বিশু বাতিটা নিভিয়ে দাও। ঃও, কী মশা! কী মশা!'

ধৈর্য ধরে উদ্ধববাবু পরদিন তাকে আবার রামু-শাসন শেখাতে বসলেন। কাকাতুয়াটা গম্ভীরভাবে শুনল। তারপর বলল, 'বিশু, আমার খাবারে খুব ঝাল দিয়ো।' উদ্ধববাবু কটমট করে পাখির দিকে চেয়ে বললেন, 'ইয়ার্কি হচ্ছে?' কাকাতুয়াটা এ-কথায় খক খক করে হেসে বলল, 'আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। খক খক।'

উদ্ধববাবু পরদিন আবার পাখিকে পড়াতে বসালেন। পাখি তাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ লক্ষ করে বলল, 'বালিশের তলায় কী খুঁজছ বিশু? আলমারির চাবি?'

উদ্ধববাবু বললেন, 'আহা, বলো, রামু এখন ঘুম থেকে ওঠো।'

পাখি বলল, 'বিশু, আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুম পাচ্ছে। আলমারিতে টাকা নেই। অন্য জায়গায় আছে।'

উদ্ধববাবু বললেন, 'হোপলেস।'

২

কাকাতুয়াকে শেখাতে গিয়ে উদ্ধববাবু ঘেমে ওঠেন। রেগে গিয়ে চ্যাঁচাতে থাকেন, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? অ্যাঁ! ইয়ার্কি?'

কাকাতুয়াটা একথাটা খুব টক করে শিখে নেয়। ঘাড় কাত করে উদ্ধববাবুর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলে, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? অ্যাঁ! ইয়ার্কি?'

'নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। টাকাটাই জলে গেল দেখছি।' উদ্ধববাবু হতাশভাবে এই কথা বলে উঠে পড়লেন। নেয়ে-খেয়ে আদালতে যেতে হবে।

কাকাতুয়াটা পিছন থেকে বলল, 'টাকাটাই জলে গেল দেখছি।'

আড়াল থেকে কাকাতুয়া ভারসাস উদ্ধববাবুর লড়াইটা ছেলে-মেয়েরা রোজই লক্ষ করে।

সেদিন কোর্টে উদ্ধববাবু যখন মামলার কাজে ব্যস্ত, সে-সময় একজন পেয়াদা এসে তাঁকে একটা হাতচিঠি দিয়ে বলল, 'বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। জবাব নিয়ে যাবে।'

উদ্ধববাবু ভ্রূকুটি করে বললেন, 'এখন সময় নেই। পরে আসতে বলো।'

পরে ভেবে দেখলেন, মোকদ্দমার ব্যাপারে কোনো মক্কেল কোনো পয়েন্ট দিয়ে থাকতে পারে। তাই পেয়াদাকে বারণ করে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন :

মাননীয় মহাশয়,

কিছুকাল পূর্বে আমার পোষা কাকাতুয়াটি বাড়ির লোকের অসতর্কতার সুযোগে উড়িয়া যায়। পাখিটি আমার অত্যন্ত আদরের। বহু জায়গায় অনুসন্ধান করিয়া এতকাল তাহার কোনো খবর পাই নাই। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম, ওই কাকাতুয়াটিকে আপনি কোনো পাখিওলার কাছ হইতে কিনিয়াছেন। এখন আপনার নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করিয়া কাকাতুয়াটি আমার হাতে প্রত্যর্পণ করুন। আপনি টাকা খরচ করিয়া কিনিয়াছেন, তাই আপনার অর্থক্ষতি হউক ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। পত্রবাহকের সঙ্গে টাকা আছে। ন্যায্য দাম লইয়া আপনি পাখিটি তাহার হস্তে দিলেই হইবে। পত্রবাহকটি জন্ম হইতেই মূক ও বধির। তাহার সহিত বাক্যালাপ করা নিষ্প্রয়োজন। কিছু জানিবার থাকিলে আপনি তাহার হাতে পত্রও দিতে পারেন। আমার প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন। ইতি ভবদীয় শ্রীশচীলাল শর্মা।

চিঠি পড়ার পরও উদ্ধববাবু ভ্রূ কুঁচকেই ছিলেন। তিনি উকিল মানুষ, সুতরাং একটু সন্দেহবাতিক আছে। কোনো ঘটনাকেই সরলভাবে বিশ্বাস করেন না, যুক্তি দিয়ে সম্ভাব্যতা দিয়ে বিচার করে দেখেন। তিনি একটি চিরকুটে লিখলেন :

মাননীয় শচীলালবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। আমার ক্রীত কাকাতুয়াটি সাতিশয় অবাধ্য ও জেদি। আজ পর্যন্ত তাহাকে মনোমতো বুলি শিখাইতে পারি নাই। পাখিটি যদি আপনার হয় তবে ফেরত দিতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিব না, তবে দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ কাকাতুয়া আছে। এই অঞ্চলেই কয়েকশো লোকের পোষা কাকাতুয়া আছে বলিয়া জানি। এখন আমার ক্রীত কাকাতুয়াটিই যে আপনার নিরুদ্দিষ্ট কাকাতুয়া, তাহার প্রমাণ কী? যদি অকাট্য প্রমাণ দেন তাহা হইলেই বুঝিব যে, আপনার নিরুদ্দিষ্ট এবং আমার ক্রীত কাকাতুয়াটি এক ও অভিন্ন। পাখিটি কিনিতে আমার দুই শত টাকা খরচ পড়িয়াছে। মাসখানেক তাহার খোরাকিবাবদ খরচ হইয়াছে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। কাকাতুয়াটি বেশ ভালোমন্দ খাইতে পছন্দ করে। প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন। ইতি ভবদীয়-উদ্ধবচন্দ্র ভট্টাচার্য।

পেয়াদার হাত দিয়ে চিরকুটটা পাঠিয়ে উদ্ধববাবু আবার মোকদ্দমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘটনাটা আর মনেই রইল না।

উদ্ধববাবুর বাড়ির সব কাজের কাজি হল নয়নকাজল। ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়িতে আছে। ঘরের সব কাজ জানে। এমনকী, মোকদ্দমার ব্যাপারে উদ্ধববাবুকেও নাকি কখনো-সখনো পরামর্শ দেয়। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচেই। তবে তার চালচলন বুড়ো মানুষের মতো ভারিক্কি হওয়ার জন্য সে চোখে একটা চশমা পরে।

দুপুরে কাকাতুয়াটাকে ঝাঁঝরি দিয়ে ভালো করে স্নান করাল নয়ন। বাইরের বারান্দায় শীতের রোদে দাঁড়টা ঝুলিয়ে দিল। তারপর চোখে চশমা এঁটে খবরের কাগজ খুলে পড়তে বসল। ঠিক এমন সময় বিশাল এক সাধু এসে হাজির। পরনে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল, ডমরু, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মাথায় জটা, বিশাল ভুঁড়ি, পেল্লায় দাড়ি গোঁফ, হুহুংকার দিল-'হর হর ব্যোম ব্যোম . . .। হর হর ব্যোম ব্যোম . . . হর হর ব্যোম ব্যোম . ..'

সেই হুংকারে আঁতকে উঠল নয়ন। এ শহরটা ছোটো বলে সাধু ভিখিরি সবই সকলের চেনা। কিন্তু এই বিকট সাধুকে আগে কখনো দেখা যায়নি।

চশমার ভিতর দিয়ে (যদিও চশমার কাচে কোনো পাওয়ার নেই) খুব গম্ভীর ভাবে সাধুকে লক্ষ করে নয়ন বলল, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

সাধু কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে জমিয়ে বসে বলে, 'সোজা হিমালয় থেকে। দেড় হাজার মাইল হাঁটাপথ। ওফ, একটু জল খাওয়াও তো বাপু মায়াবদ্ধ জীব।'

'মায়াবদ্ধ জীব' বলে এ পর্যন্ত কেউ সম্বোধন করেনি নয়নকে। সে খানিকটা থতমত খেয়ে বলে, 'শুধু জল?'

সাধু হা-হা করে আকাশ ফাটিয়ে হেসে ওঠে হঠাৎ। বলে, 'আরে জলই তো হাতের গুণে অমৃত হয়ে যাবে। আনো দেখি ঘটিভর।'

সেই হাসি শুনে নয়নের খুব ভক্তি হল। তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল নিয়ে এল সে।

সাধু দু-হাতে ঘটি ধরে উঁচু থেকে গড়গড় করে জল ঢালল গলায়। ঘাবুত ঘাবুত করে খানিক গিলে ঘটিটা ফেরত দিয়ে বলল, 'নে, পেসাদ খা!'

নয়ন ঘটিটা মাথায় ঠেকিয়ে সেটা আলগা রেখে গলায় জল ঢেলেই চমকে ওঠে। জল কোথায়? এ যে খাঁটি কমলালেবুর রস!

ঘটি রেখে নয়ন উপুড় হয়ে সাধুকে প্রণাম করে বলল, 'আমাকে দয়া করতে হবে, বাবা।'

সাধু তার মাথায় প্রকাণ্ড হাতের একটা থাবড়া মেরে বলে, 'হবে হবে। এই যে সিকি ঘটি অমৃত খেলি, এর ঠেলাটাই আগে সামলা।'

নয়নকাজল অবাক হয়ে বলল, 'এই কি অমৃত, বাবা?'

'তাহলে কী?' সাধু কটমট করে তাকিয়ে বলে।

আমতা-আমতা করে নয়ন বলে, 'না, অমৃতই হবে। খাওয়ার পর থেকে গায়ে একটু জোরও পাচ্ছি যেন। তবে কিনা খেতে একেবারে কমলালেবুর রসের মতো।'

'দূর বেটা খণ্ডিত সত্তা, তোরা হলি সংসার-পুকুরের মাছ। অমৃতের স্বাদ কি একেবারে পাবি? তবু তো তোর কমলালেবুর রস বলে মনে হয়েছে, অনেকের আবার ডাবের জল বা এমনি জল বলে মনে হয়েছে। তারা ঘোর পাপী, ঘোর পাপী, ব্যোম ব্যোম হর হর . . .'

নয়ন আর একবার সাধুকে প্রণাম করে।

সাধু কাকাতুয়ার দাঁড়টার দিকে তাকিয়ে ফোঁত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'নিজেরা হাজারো মায়ায় আটকে ছটফট করছিস তার ওপর ওই অবোলা জীবটার পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিস। ঘোর নরকে যাবি যে!'

'আমি নই বাবা! ও হল কর্তাবাবুর পাখি। আমি সামান্য চাকর।'

'যে বেটা নিজেকে চাকর ভাবে, সে তো আগাপাশতলা চাকরই। নিজেকে চাকর ভাবিস কেন? তুই তো মুক্ত আত্মা। এ-বাড়ি এ-সংসার এ-দুনিয়ার সব কিছুর মালিক। যা বেটা ছেড়ে দে পাখিটাকে। যা যা ওঠ, দেরি করিসনি।'

নয়ন ভয়ে ভয়ে উঠে পড়ে বলে, 'কিন্তু বাবা, কর্তাবাবু রাগী লোক। ফিরে এসে পাখি না দেখলে এমন কুরুক্ষেত্র করবে!'

চোখ পাকিয়ে সাধু হুহুংকার দিয়ে ওঠে, 'হর হর ব্যোম ব্যোম . . . কে তোর কেশাগ্র স্পর্শ করবে রে বেটা? এইমাত্র অমৃত খেলি যে! যা বেটা, ছেড়ে দে, একটা মুক্ত আকাশের জীবকে আর কষ্ট দিসনে। ছেড়ে দে, উড়ে যাক।'

নয়নকাজল সাধুর হুংকারে মনস্থির করতে না পেরে দোনোমোনো হয়ে উঠে পড়ল। দাঁড়ের কাছে গিয়ে শিকলটা খুলতে সবে হাত বাড়িয়েছে এমন সময় আর একটা লোক বারান্দায় উঠে বিকট গলায় বলে উঠল, 'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, খ্যাঁকশিয়ালি পালায় ছুটি . . .।'

নয়নকাজল এই দু-নম্বর চ্যাঁচানিতে ঘাবড়ে গেল। শিকল আর খোলা হল না। তাকিয়ে দেখল, মূর্তিমান গবা পাগলা।

গবা খুব সরু চোখ করে আপাদমস্তক সাধুকে দেখে নিচ্ছিল। ভালো করে

দেখে-টেখে বলল, 'সব ঠিক আছে। তবে বাবু, তোমার একটা ভুল হয়েছে। গায়ে ছাই মাখোনি।'

সাধু একটু হতভম্ব। কথা সরছে না। তবু একবার রণহুংকার দিল, 'হর হর ব্যোম ব্যোম . . .'

গবা সেই হুংকারে একটুও না ঘাবড়ে বলে, 'পায়ে বাটা কোম্পানির চটি জোড়াও মানায়নি একদম। একজোড়া কাঠের খড়ম জোগাড় করতে পারনি হে?'

সাধু এবার একটু ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'হর হর . . .'

গবা সাধুর বাঁ হাতটা তুলে কবজিটা দেখে নিয়ে বলে, 'এ যে ঘড়ি পরার স্পষ্ট দাগ গো! রোজ ঘড়ি পরো বুঝি হাতে? সাধুরা আজকাল ঘড়িও পরছে তাহলে? তা সেটা রেখে এলে কোথায়?'

সাধু ত্রিশূলটা শক্ত করে চেপে ধরে ধমক দেয়, 'ব্যোম ব্যোম . . .'

গবা ফিক করে হেসে বলে, 'বোমা কেন? পিস্তল নেই? বোমার চেয়ে পিস্তল ভালো। বোমা অনেক সময় ঝোলার মধ্যে ফেটে-টেটে যেতে পারে।'

সাধু এক ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ঘোর পাপী, ঘোর পাপী। অন্ধকারে ডুবে আছিস।'

পাখিটা অনেকক্ষণ ধরে সাধুকে ঘাড় কাত করে করে দেখছিল আর দাঁড়ে এধার-ওধার করছিল। এখন একটা ডিগবাজি খেয়ে বলল, 'বিশু, বিশু, আমার কেন ঘুম পাচ্ছে! ঘুম পাচ্ছে! আলমারিতে টাকা নেই। টাকা আছে . . .'

সাধু হঠাৎ একটা লাফ মেরে বারান্দায় উঠে দাঁড়টাকে একটা ঝাঁকুনি মেরে বলে, 'বল বেটা কোথায় আছে! বল। নইলে গলা টিপে খুন করে ফেলব।'

পাখিটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে বুলি ভুলে ডানা ঝাপটে ভয়ের চিৎকার করতে লাগল।

৩

সাধুর কাণ্ড দেখে নয়নকাজলের বাক্যি সরে না, হাত-পা নড়ে না, শরীরে সাড় নেই। বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে আছে। মুখখানা হাঁ। পাখিটা বুলি ভুলে গাঁ গাঁ করে প্রাণভয়ে চ্যাঁচাচ্ছে আর দাঁড়ে বনবন করে ডিগবাজি খাচ্ছে। বিটকেল গলায় সাধু বলছে, 'বল বেটা বল কোথায় টাকা! বল!'

অবস্থা যখন এইরকম গুরুচরণ, তখন হঠাৎ-জলের চৌবাচ্চায় নেমে বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস আপেক্ষিক গুরুত্ব আবিষ্কার করার পর যেমন 'ইউরেকা ইউরেকা' বলে আওয়াজ ছেড়েছিলেন-তেমনি গবা পাগলা লাফিয়ে উঠে দু-হাত তুলে নাচতে নাচতে চেঁচাতে লাগল, 'চিনেছি! চিনেছি! সাধুকে চিনেছি!'

যেই-না চ্যাঁচানো সেই-না সাধু চোখের পলকে লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে হাওয়ার বেগে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

নয়নকাজল ধাতস্থ হয়ে গবাকে জিজ্ঞেস করে, 'বিটকেল সাধুটাকে চেন তাহলে! কে বলো তো?'

গবা বসে বসে ঘাম মুখের ধুলো-ময়লা মুছছিল। বিজ্ঞের মতো হেসে বলল, 'বলব কেন? ডাবল লেনস লাগিয়ে নতুন ধরনের একটা টর্চবাতি বানাব বলে তোমার কাছে যে গতকাল বাবুর মায়ের পুরোনো চশমাজোড়া চাইলাম, দিয়েছিল?'

নয়ন একটু তেড়িয়া হয়ে বলে, 'আর চোর বলে যদি আমার বদনাম রটত? তখন তুমি কোথায় থাকতে?'

'চোর!' বলে হোঃ-হোঃ করে হাসে গবা, 'চোর বুঝি এখন নও? কুন্দ দারোগাকে যদি তোমার আসল নামটা জানাই তাহলে তুমি এরকম সুখে আর থাকবে না হে!'

একথা শুনে নয়ন কেমন একধারা হয়ে গেল। মুখখানা ছাইবর্ণ, চোখে জুলজুলে চাউনি।

গবা অবশ্য আর ঘাঁটাল না। বলল, 'নাও, মেলা বেলা হয়েছে, পাচক ঠাকুরকে আমার খাবারটা বাড়তে বলো গে।'

নয়নকাজল মিনমিনে গলায় বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু কথাটা হল-'

গবা হাত তুলে বলে, 'বলতে হবে না। কথাটা আপাতত চাপা থাকবে। এখন নিশ্চিন্ত মনে যাও। আর শোনো, পাখিটাকে ভিতরের দরদালানে ঝুলিয়ে রেখো, যখন-তখন বের কোরো না, এটার ওপর কিছু লোকের চোখ আছে।'

নয়নকাজল দাঁড়টা নিয়ে ভিতরবাড়িতে চলে গেল।

এ-বাড়িতে গবা পাগলার আস্তানা বহুদিনের। মাঝেমধ্যে সে দু-চার ছ-মাসের জন্য হাওয়া হয়ে যায় বটে, কিন্তু ফিরে এসে বাইরের পাকা চণ্ডীমণ্ডপের পাশে রসুইখানার ঘরটায় বরাবরের মতো থানা গাড়ে। তাকে কেউ কিছু বলে না। শোনা যায় উদ্ধববাবু গবাকে একটা বিচ্ছিরি মামলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। বহুকাল আগেকার কথা। সত্যি-মিথ্যে কেউ বলতে পারে না।

গবা পিছনের পুকুর থেকে স্নান করে এসে এক পেট খেয়ে ঘুম লাগাল।

বিকেল হতে-না হতেই রামু এসে ঠেলে তুলল, 'ও গবাদা! বাবাকে বলে বিষ্টুপুরের সার্কাসে নিয়ে যাবে বলেছিলে যে! আজই চলো।'

গবা হাই তুলে বলে, 'দূর! ও একটা সার্কাস নাকি? মরকুটে বাঘ, রোগা হাতি, পালোয়ানের নেই বুকের ছাতি। কাল সকালে গিয়ে দেখি, সার্কাসের ম্যানেজার গুনছুঁচে পাটের ফেঁসো ভরে ছেঁড়া তাঁবু সেলাই করছে। তার চেয়ে হাবিবগঞ্জের সার্কাস অনেক ভালো।'

'কী আছে তাতে?'

'ঃও, সে মেলা জিনিস। বাঘ হাতি সিন্ধুঘোটকের কথা ছেড়েই দিলাম। একটা বেঁটে লোক আছে, সে ভারি হাসায়। বেঁটেটার বন্ধু হচ্ছে একটা তালগাছের মতো লম্বা লোক। তা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় বেঁটেটা একটা মই লাগিয়ে বন্ধুর কাঁধ বরাবর উঠে যায়। মজা না?'

'খুব মজা। কিন্তু কবে নিয়ে যাবে?'

'ব্যস্ত হয়ো না, বাবুমশাইকে বলে আগে অনুমতি নিই। তারপর একদিন যাবখন। পয়সাটয়সাও লাগবে না। হাবিবগঞ্জের সার্কাসের সেই বেঁটে লোকটা আমার খুব বন্ধু। দু-জনে একসময়ে একই দলে ছিলাম কিনা।'

রামু চোখ কপালে তুলে বলে, 'তুমি সার্কাসের দলে ছিলে গবাদা? বলোনি তো!'

গবা মৃদু মৃদু হেসে বলে, 'সার্কাসে ছিলাম, বেদের দলে ছিলাম। সে অনেক ঘটনা।'

'সার্কাসে কী কী খেলা দেখাতে?'

'সবরকম। ট্রাপিজ, দড়ির ওপর হাঁটা, একচাকার সাইকেলে উঠে রকম রকম কসরত, ক্লাউন সেজে রগড়ও করতে হয়েছে।'

'আমাকে খেলা শিখিয়ে দেবে?'

'তা আর শক্ত কী? তবে কঠিন ডিসিপ্লিন চাই, মনোযোগ চাই, অধ্যবসায় চাই।'

'আমি পারব।'

উদ্ধববাবু আজ একটু তাড়াতাড়িই কাছারি থেকে ফিরে এসেছেন। এসেই হাঁক মারলেন, 'নয়ন, ওরে নয়ন!'

নয়নকাজল ছুটে এসে বলে, 'আজ্ঞে বাবুমশাই।'

'পাখিটা কোথায়?'

'দরদালানে ঝোলানো আছে।'

'হুঁ' বলে উদ্ধববাবু পকেট থেকে শচীলাল শর্মার চিঠিটা বের করে আর একবার পড়লেন। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'পাখিটাকে খুব সাবধানে রাখা দরকার। আজ থেকে ওটাকে এ-ঘরে রাখবি। আমি না থাকলে দরজায় সবসময় তালা দেওয়া থাকবে বুঝেছিস?'

'আজ্ঞে।' নয়নকাজল খুব বিনীতভাবে বলল, তবে এসময় উদ্ধববাবু লক্ষ করলে দেখতে পেতেন যে, নয়নকাজলের চোখ দুটো চকচক করছে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে

নয়ন বলল, 'আজ এক বিটকেল সাধু এসে পাখিটার ওপর খুব হামলা করে গেছে। নিয়েই যেত, আমি গিয়ে সময়মতো আটকালাম বলে।'

'সাধু!' বলে উদ্ধববাবু হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন, 'সাধুর সঙ্গে পাখির কী সম্পর্ক?'

মাথা চুলকে নয়ন বলে, 'আজ্ঞে সে তো জানি না।'

উদ্ধববাবু রেগে গিয়ে বলেন, 'এ-বাড়িটা কি হাট নাকি? যে কেউ এসে ঢুকে পড়বে, হামলা করবে, তোরা সব করিস কী? সাধু পাখিটা নিয়ে যাচ্ছিল নাকি?'

'তাই মতলব ছিল। বিশাল চেহারা দেখলেই ভয় হয়।'

'ধরতে পারলি না?'

'ও বাবা, ধরবে কে? হাতে যা একখানা ধারালো শূল ছিল!'

উদ্ধববাবু একটু চিন্তিত মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, এখন থেকে সাবধানে থাকবি।'

বাইরের কাছারি ঘরে মক্কেলরা জড়ো হতে শুরু হয়েছে। কাজেই পাখি নিয়ে ভাববার সময় উদ্ধববাবুর নেই। তিনি তৈরি হয়ে কাছারিঘরে গিয়ে বসলেন এবং মামলামকদ্দমার মধ্যে ডুবে গেলেন।

সন্ধের সময় যখন সবাই পড়তে বসে তখনই রামুর ভীষণ ঘুম পায়। এত ঘুম যে কোথায় থাকে? কেবল হাইয়ের পর হাই উঠতে থাকে, চোখের দুটো পাতায় যেন আঠা মাখানো চুম্বক লাগিয়ে দেয় কেউ। শ্রীধর মাস্টারমশাই পড়াতে এসে ভীষণ রাগারাগি করেন রোজ। মারধরও প্রায় রোজই খেতে হয় রামুকে। কিন্তু পড়তে তার একদমই ভালো লাগে না।

আজও তিন ভাই পড়তে বসেছে। রামু ঘন ঘন দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চাইছে। ঠিক ছ-টায় শ্রীধরবাবু আসবেন। ততক্ষণ যতটা পারে ঢুলে নেওয়ার জন্য সে মুখে অ্যাটলাসটা চাপা দিয়ে চোখ বুজে রইল।

কিন্তু কে জানে কেন আজ রামুর ঘুম আসছিল না। বারবারই তার চোখে একটা সার্কাসের দৃশ্য ভেসে উঠছে। সে দেখছে, একটা ছেলে এক ট্রাপিজ থেকে আর একটায় ঝাঁপ দিয়ে চলে যাচ্ছে, দড়ির ওপর হাঁটছে, একচাকার সাইকেল চড়ে কসরত দেখাচ্ছে। ছেলেটা অবশ্য সে নিজেই। আজ তার মনে হল, সার্কাসের খেলোয়াড় হতে না পারলে জীবনের কোনো মানেই নেই।

এদিকে ছ-টা বেজে গেল। ক্রমে সাড়ে ছ-টাও বাজে। কিন্তু শ্রীধরবাবু এলেন না। এরকম অঘটন কখনোই ঘটে না। শ্রীধরবাবুর মতো নিয়মনিষ্ঠ লোক কমই আছে। কামাই

তো নেইই, এক মিনিট দেরিও করতে নারাজ। আজ তবে হল কী?

সন্ধে সাতটা নাগাদ কাছারিঘরে উদ্ধববাবুর কাছে একটা লোক এসে বলল, 'শ্রীধরবাবু সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকেছেন। ক-দিন আসতে পারবেন না।'

মামলামকদ্দমায় ডুবে-থাকা উদ্ধববাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কে শ্রীধরবাবু? কীসের মামলা?'

'মামলা নয়। শ্রীধরবাবু আপনার ছেলেদের পড়ান।'

'অ, তা কী করে পড়লেন?'

'সাইকেলে টিউশানি করতে আসছিলেন এমন সময় একটা মোটর সাইকেল এসে তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। খুব চোট হয়েছে। ডান পায়ের হাড় সরে গেছে।'

'তাই তো! খুব দুঃখের কথা।'

পরদিন সকালেই অবশ্য শ্রীধরবাবু চিঠি দিয়ে একটি লোককে পাঠালেন। চিঠিতে লেখা, 'আমার বদলে এই ভদ্রলোক ছেলেদের ক-দিন পড়াবেন। ইনি তিনটি বিষয়ে এম.এ. পাশ।'

উদ্ধববাবু আপত্তির কারণ ছিল না। শ্রীধরবাবু যাকে পাঠিয়েছেন তার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নই ওঠে না। লোকটির চেহারাও বেশ ভালোমানুষের মতো। নাম যুধিষ্ঠির রায়। আগে এঁকে কখনো দেখেননি উদ্ধববাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এই অঞ্চলের লোক?'

'এই অঞ্চলেরই। তবে পড়াশোনা করতে অনেকদিন বাইরে ছিলাম।'

'ঠিক আছে। আজ থেকেই শুরু করুন।'

রাত্রিবেলা চুপিসারে নয়নকাজল একটা লুচি খাওয়াল কাকাতুয়াটাকে। তারপর বেশ মিষ্টি করে পাখিটার গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলি! সেই টাকাটার কথা, না? কোথায় যেন আছে সেই টাকাটা? বল বাবা।'

পাখিটা ঘাড় বেঁকিয়ে নয়নকাজলকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, 'টাকা নয়, মোহর। মোহরগুলো . . . মোহরগুলো . . .।'

নয়নকাজল সাপের মতো চোখ করে চেয়ে ছিল পাখিটার দিকে। সাপের মতো গলাতেই বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ মোহর। তা সে মোহরগুলো কোথায় রে বাপ?'

'মোহর আছে . . . মোহর আছে . . . মাটির তলায় . . . কিন্তু বিশু, তুমি অমন করে তাকিয়ো না . . . আমি ভয় পাই . . . ভয় পাই।'

চাপা গলায় নয়নকাজল বলে, 'ভয় নেই রে! মাটির তলায় তো বুঝলুম, কিন্তু জায়গাটি কোথায়?'

পাখিটা দাঁড়ে দোল খেতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাঃ-হাঃ হাসির শব্দ তুলে বলল, 'জানি, কিন্তু বলব না।'

'বলবি না? বলবি না?' বলতে বলতে নয়নকাজল দুটো হাত সাঁড়াশির মতো করে পাখিটার দিকে এক-পা এগিয়ে গেল।

পেছনে কখন নিঃশব্দে রামু এসে দাঁড়িয়েছে। দৃশ্যটা দেখে সে অবাক! কিন্তু বিপদ বুঝে সে হঠাৎ বলে উঠল, 'নয়নদা। কী হচ্ছে?'

নয়নকাজল চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে একগাল হেসে বলল, 'পাখিটাকে বড়োবাবুর ঘরে রেখে আসার হুকুম হয়েছে কিনা। তাই দাঁড়টা নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

কথাটা রামুর বিশ্বাস হল না। কিন্তু আর কিছু বললও না সে। তবে পাখিটা যে মোহরের কথা বলছিল, তা সে স্পষ্ট শুনেছে।

রামু যে খুবই দুষ্টু ছেলে তা সে নিজেও জানে। একবার স্কুলের অঙ্কস্যার হেরম্ববাবু রেগে গিয়ে তাকে বলেছিলেন, 'তুই এত পাজি কেন বল তো?'

'আজ্ঞে স্যার, আমার শরীরের মধ্যে সবসময় কে যেন কাতুকুতু দেয়। যখন খুব কাতুকুতুর মতো লাগে, তখন আমার কিছু একটা না করলে চলে না।'

'বটে!' বলে হেরম্ববাবু খুব রেগে গেলেন। রামু ইয়ার্কি করছে ভেবে শপাং শপাং কয়েক ঘা বেতও বসালেন তার গায়ে। তারপর বললেন, 'এবার কাতুকুতু টের পাচ্ছিস?'

কিন্তু ইয়ার্কি রামু করেনি। বাস্তবিকই তার শরীরের মধ্যে সবসময় একটা কাতুকুতুর ভাব। কখনো বাড়ে, কখনো কমে। যখন বাড়ে তখন বেহদ্দ কোনো দুষ্টুমি না করলেই নয়। খাঁ-খাঁ দুপুরে সে তখন এলোপাথাড়ি ঢিল ছোড়ে, গাছের মগডালে ওঠে, ক্লাসে অন্য ছেলেদের বই খাতা গোপনে ছিঁড়ে রাখে, ক্লাসঘরে ছাগল ঢুকিয়ে দেয়, বাড়িতে রান্নাঘরে গিয়ে রান্না তরকারির মধ্যে নুন ছিটিয়ে দিয়ে আসে। প্রতিবেশীরা তার উৎপাতে অস্থির। রামুর মেজোদাদুর সত্তর বছর বয়সেও সটান চেহারা, দারুণ স্বাস্থ্য, সবকটা দাঁত অটুট, মাথায় কালো কুচকুচে চুল। সেবার মেজোদাদু রামুদের বাড়ি বেড়াতে এসে বললেন, 'আমার মাথা থেকে পাকা চুল বের করতে পারবি? পার পাকাচুল চার আনা করে পয়সা দেব।'

দুপুরে খাওয়ার পর মেজোদাদু যখন শুয়েছেন তখন রামু চুল বাছতে গেল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় শ-খানেক পাকা চুল বের করে ফেলল। দেখে মেজোদাদু তো

মূর্ছা যান আর কি! বাড়ি মাথায় করে চ্যাঁচাতে থাকেন, 'ভৌতিক কাণ্ড! ভৌতিক কাণ্ড! আমি কি রাতারাতি বুড়ো হয়ে গেলুম! ওরে উদ্ধব, শিগগির ডাক্তার ডাক। আমার বুকটা কেমন করছে, মাথা ঘুরছে, হাত-পা কাঁপছে!'

ঠিক সেই সময়ে প্রতিবেশী জামাল সাহেব তাঁর সাদা ধবধবে বিলিতি কুকুরটাকে চেন দিয়ে বেঁধে এনে বাড়িতে ঢুকলেন। দুঃখ করে বললেন, 'রেমোর কাণ্ড দেখুন। একটু আগে আমার বাসায় গিয়েছিল, হাতে একটা কাঁচি। কুকুরটাকে খুব আদর করছিল। তখন কি ছাই টের পেয়েছি! এখন দেখি পিঠের লম্বা চুলগুলো কেটে একেবারে টাক ফেলে দিয়ে এসেছে।'

বাস্তবিকই তাই। সুন্দর, বড়ো বড়ো লোমওয়ালা কুকুরটার পিঠ প্রায় ফাঁকা। উদ্ধববাবু হান্টার বের করলেন, মেজোদাদু তখন গিয়ে তাঁকে আটকে দিয়ে বললেন, 'যাই হোক বাবা, মাপ করে দাও। ছেলেমানুষ।'

মেজোদাদু যে বাস্তবিকই বুড়ো হননি সেটা জেনেই তিনি তখন খুশি। তবে তার পরেও দিন-দুই তাঁর চুল থেকে কুকুরের সাদা লোম ঝরে পড়ত।

শরীরের এই কাতুকুতুটা নিয়ে রামু মাঝেমাঝে ভাবে। কে যে তাকে কাতুকুতু দেয়! বেটাকে ধরতে না পারলে কিছুতেই আর ভালো ছেলে হওয়া যাবে না।

অবশ্য ভালো ছেলে হওয়ার তেমন কোনো ইচ্ছেও তার হয় না। তার ইচ্ছে করে সার্কাসের রিং-মাস্টার বা ম্যাজিশিয়ান বা প্রেতসিদ্ধ তান্ত্রিক বা নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় বা রেলের গার্ড বা মহাকাশচারী বা বহুরূপী বা বিশ্বভ্রমণকারী বা ট্রাক ড্রাইভার বা পাইলট বা ডুবুরি হবে। শুধু লেখাপড়া করে আর নিয়মমতো চলে এর কোনোটাই হওয়া যাবে না। সুতরাং সে ঠিক করেছে, একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। কুমোরপাড়ার গান্টুরও পালানোর ইচ্ছে। দু-জনে প্রায়ই শলাপরামর্শ করে। গান্টুর ইচ্ছে পালিয়ে প্রথমেই উত্তরমেরুতে যাবে। রামুর ইচ্ছে, আফ্রিকা। দু-জনে এখনও একমত হতে পারেনি। হলেই গলা জড়াজড়ি করে একদিন বেরিয়ে পড়বে।

তবে রামু দুষ্টু হলেও সে গাছপালা আর পশুপাখি খুব ভালোবাসে। এমনকী, নিজেদের বাগানের সব কটা গাছের সঙ্গেই তার আলাদা আলাদা রকমের সম্পর্ক আছে। বুড়ো তেঁতুল গাছটার সঙ্গে তার সম্পর্ক দিদিমা আর নাতির। তেঁতুল গাছটাকে সে তিন্তিড়ি দিদিমা বলে ডাকেও। গাছটা যে তাতে সাড়া দেয়, তাও সে টের পায়।

কলমের আম গাছটা ভালো ছেলে ধরনের। প্রতি বছর ঝাঁকা ঝাঁকা আম ফলে তাতে। কাজের লোক, কিছু গম্ভীরও। তাকে রামু গোপালদা বলে ডাকে। রামুর ক্লাসের ফার্স্টবয়ের নামও গোপাল, আর গাছটাও গোলাপখাস আমের। তবে ফার্স্টবয়ের সঙ্গে রামুর ভাব নেই,

গাছটার সঙ্গে আছে। একটু বর্ণ বিপর্যয় করে নিয়ে গোলাপখাসকে গোপালদা বানিয়ে নিতে রামুর অসুবিধে হয়নি।

এ ছাড়া কাক, শালিখ, চড়াই, বেড়াল, কুকুর, ইঁদুর-এমনকী কাঠবেড়ালিদের সঙ্গেও রামুর কোনো শত্রুতা নেই। তারা রামুকে পছন্দই করে। বাড়ির পোষা পায়রাগুলো রামুর মাথায়, কাঁধে নির্ভয়ে এসে বসে। কাঠবেড়ালি তার থেকেই চীনেবাদাম খেয়ে যায়। গোটা চারেক চেনা শালিখ রোজ সকালে পড়ার ঘরে ঢুকে কিচিরমিচির করে তাদের পড়া ভন্ডুল করে রামুকে সাহায্য করার চেষ্টা করে।

নয়ন পাখির দাঁড়টা বাবার ঘরে দিতে চলে যাওয়ার পর রামুর মনে হল, এই কাকাতুয়াটাকে হাত করা দরকার। বাবা এটাকে কিনেছে রামুকে ঢিট করার জন্যই। পাখিটাকে হাত না করলে বেটা তাকে বিস্তর জ্বালাবে।

উদ্ধববাবু মক্কেলদের বিদায় করে খাওয়াদাওয়া সেরে যখন ঘরে এলেন তখন অনেক রাত। পাখির দাঁড়টা সিলিং ফ্যান থেকে ঝোলানো একটা দড়িতে বাঁধা। কাকাতুয়া ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে। উদ্ধববাবু নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু মাঝরাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। না, দুঃস্বপ্নটা ঠিক দেখেননি তিনি। বরং বলা যায় একটা দুঃস্বপ্ন তিনি শুনলেন। কে যেন বলছে, 'ওরে বাবা! কী ভয়ংকর! কী সাংঘাতিক রক্ত! রক্ত!'

এইসব বিদঘুটে কথা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। উদ্ধববাবু উঠে বসলেন। তাঁর শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। তবু চেঁচিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে? ডাকাত পড়ল নাকি?'

না, ডাকাত পড়েনি। হতচ্ছাড়া সেই পাখিটা। চালের এধারে-ওধারে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। পায়ের সরু শিকলের শব্দ হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, ঘোর শীতকালেও সিলিং ফ্যানটা বাঁই বাঁই করে ঘুরছে। সেই সঙ্গে পাখির দাঁড়টাও।

কে পাখা খুলল? কেন খুলল? পাখিটাই বা ওরকম চ্যাঁচাল কেন? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না।

উদ্ধববাবু উঠে পাখাটা বন্ধ করলেন। পাখিটা খুব কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকে একবার দেখল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'সাবধান!'

উদ্ধববাবু আর বাকি রাতটা ঘুমোতে পারলেন না। ঠিক করলেন, পাখিটাকে শচীলাল শর্মার কাছে বেচেই দেবেন। না হয় তো অন্য কাউকে। বড্ড ঝামেলা।

দুপুর বেলা বহু দূর থেকে একটা লোক পশ্চিমের চষা খেতের মস্ত মাঠটা পেরিয়ে শহরের উপকণ্ঠে শালবনটার ভিতরে ঢুকল। ঝরা পাতার বনটায় আলোছায়ার চিকরিমিকরি। গোঁ-গোঁ করে উত্তরে শীতের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো শুকনো পাতা খসে পড়ছে। লোকটা কাঁধ থেকে তার খাকি রঙের ব্যাগটা নামিয়ে গাছতলায় রাখল।

তার ব্যাগটা দেখেই বোঝা যায়, লোকটা পর্যটক। তার গালে বেশ ঘন দাড়ি আর গোঁফ। খুব লম্বা নয়, কিন্তু শক্ত মজবুত চেহারা, পরনে মালকোচা-মারা ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া আর মোটা সুতির চাদর। কাঁধে একটা ভাঁজ করা কুটকুটে কম্বলও আছে। পায়ে খুব পুরু সোলের নাগরা জুতো। হাতে বেতের একটা লাঠি। বয়স বাইশ-তেইশ বা বড়োজোর পঁচিশ পর্যন্ত হতে পারে। চোখ দু-খানায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রোদে-জলে ঘুরে ঘুরে গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে বটে, তবে একসময় সে খুব ফর্সা ছিল তা বোঝা যায়।

লোকটা খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল। তারপর ব্যাগ থেকে চিঁড়ে আর গুড় বের করে কয়েকটা শালপাতা বিছিয়ে তার ওপর ঢালল। সামনেই মটরখেত। উঠে গিয়ে খেত থেকে তাজা মটরশুঁটি তুলে আনল এক কোঁচড়। জলও জুটে গেল কাছেই এক চাষিবাড়ির কুয়ো থেকে। কোথায় কী জোটে তা লোকটা ভালোই জানে।

খাওয়ার পর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে লোকটা অঘোরে ঘুমোতে লাগল। জঙ্গলে সাপখোপ, পাগলা শেয়াল থাকতে পারে। শীতকালে এই অঞ্চলে চিতাবাঘও হানা দেয়। লোকটা সবই জানে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই।

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে পশ্চিমের মাঠে সূর্য টুক করে মেঘলা মতো একটা কুয়াশার স্তরের মধ্যে ডুবে গেল। শালবনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠল অন্ধকার। আর হাড়-কাঁপানো হিম একটা হাওয়া হু-হু করে বইতে লাগল।

লোকটা চোখ মেলে তাকায়। সে দিনের বেলায় বড়ো একটা লোকালয়ে ঢুকতে চায় না। চারদিকটা বেশ আঁধারমতো হয়ে এসেছে দেখে লোকটা তার ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

বন পার হয়ে লোকটা কিন্তু শহরে ঢুকল না। শহরের বাইরে মস্ত সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। ডিম ডিম করে বাজনা বাজছে। বাঘ সিংহের হুংকার শোনা যাচ্ছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। চারিদিকে আলো ঝলমল দোকানপাট, বেলুনওয়ালা, ভেঁপুওয়ালা, বাঁশিওয়ালা মিলে এক মেলা বসে গেছে।

লোকটা মোটা চাদরে নাক পর্যন্ত ঢেকে আর মাথায় একটা কপাল-ঢাকা বাঁদুরে টুপি চাপিয়ে একটু সন্তর্পণে তাঁবুর পিছন দিকে এগোতে লাগল।

এ-পাশটা অন্ধকার। বাঘ-সিংহের খাঁচা, রসুইখানা, খেলোয়াড়দের তাঁবু আর মেলা দড়িদড়া, বাঁশ-কাঠ, প্যাকিং বাক্সের গাদা। লোকটার কোনো অসুবিধে হল না, অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেল।

খেলোয়াড়দের ঢুকবার দরজায় কড়া পাহারা, খুব কম করেও পাঁচ-সাতজন মুশকো লোক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। খেলা শুরু হতে আর দেরি নেই। দরজার কাছে একটা আলোর চৌখুপি। মুখঢাকা লোকটা এগিয়ে যেতেই পাহারাদাররা পথ আটকাল, 'এই এধারে যাওয়া বারণ। হঠো, হঠো।'

লোকটা তাঁর বাঁদুরে টুপিটা খুলে চাদর-ঢাকা মুখটা একটু ফাঁক করে আলোয় তুলে ধরে বলে, 'আমি রে আমি। গোবিন্দ ওস্তাদ।'

লোকগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে আছে। লোকটা বলে কী? গোবিন্দ ওস্তাদ! তার তো আজ বাদে কাল ফাঁসি হওয়ার কথা।

গোবিন্দ আবার টপ করে টুপিটা কপালে টেনে, চাদরে মুখ ঢেকে ফেলল।

একজন তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'গোবিন্দদা। তোমার না ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল! ভূত হয়ে আসনি তো?'

আর একজন রাম-নাম করতে করতে কাঁপা গলায় বলে, 'সব ভুলে গেলে নাকি গোবিন্দদা?'

একজন একটু সাহসী। সে বলল, 'ব্যাপারটা কী? পালিয়ে-টালিয়ে এসেছ নাকি? ভূত-টুত বলে তো মনে হচ্ছে না।'

গোবিন্দ জবাব দিচ্ছিল না। খোলা দরজা দিয়ে তাঁবুর ভিতরে গোল জায়গাটা দেখছিল এক মনে। এই সার্কাসে সে বহু খেলা দেখিয়েছে। আপনা থেকেই তার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল।

জোয়ান জোয়ান লোকগুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে, কী করবে বুঝতে পারছে না। জেলে যাওয়ার আগে গোবিন্দ যখন সার্কাসে খেলা দেখাত তখনও সবাই তাকে ভয় খেত। মাথায় গোবিন্দ লম্বা নয় বটে, তবে তার গায়ে প্রচণ্ড জোরের কথা সবাই জানে। তার ওপর গোবিন্দর হাত-পা চলত বিদ্যুৎ গতিতে। তেমনই ছিল তার প্রচণ্ড রাগ। অমন খুনে রাগও দেখা যায় না বড়ো একটা। গোবিন্দকে তাই কেউ কখনো চটাতে সাহস করত না। আজও তাকে দেখে লোকগুলো ভয়ে ভাবনায় সিঁটিয়ে আছে।

গোবিন্দ মৃদুস্বরে একটা লোককে ডেকে আড়ালে নিয়ে বলল, 'সামন্তমশাইয়ের তাঁবুটা কোন দিকে রে?'

'দেখা করবে গোবিন্দদা?'

'করেই যাই।'

'চলো তাহলে।' লোকটা খুশি হয়ে বলে, 'সামন্তমশাই তোমার কথা খুব বলে। বলে, গোবিন্দটা খুন করল বটে, কিন্তু ওরকম খেলোয়াড় হয় না।'

গোবিন্দ এ-কথার জবাব দিল না। বারো-তেরো বছর বয়সে সে সামন্তমশাইয়ের সার্কাসে চলে এসেছিল। এই সার্কাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই ছোটো থেকে বড়ো হয়েছে। সে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সামন্তমশায়ের তাঁবুটা একটু পিছনের দিকে, আলাদা জায়গায়। তাঁবুর এমনিতে কোনো চাকচিক্য নেই, তবে ভিতরটা বেশ বৈঠকি ঢঙে সাজানো। সেজবাতি জ্বলছে। নীচু একটা তক্তপোষে পুরু গদির বিছানা। তার ওপর বেশ কয়েকটা পুরুষ্টু তাকিয়া। বুড়ো সামন্তমশাই বসে ভালো গন্ধওয়ালা তামাক খাচ্ছে গড়গড়ায়। সামন্তর চেহারা রোগার দিকেই, তবে রুগণ নয়। মাথার চুল কাঁচাপাকায় মেশানো। মস্ত পাকানো গোঁফ। চোখের দিকে চাইলে বুক গুড়গুড় করে। ভয়ডর বলতে কিছু নেই সেই চোখে। তবে লোকে তাকে ভয় খায়, আবার ভালোও বাসে। চিরকুমার সামন্তমশাই সারা জীবন তিলে তিলে এই সার্কাসখানা তৈরি করেছে। সার্কাসটাই তার ধ্যানজ্ঞান। এটা থেকে তার বেশ মোটা লাভও হয়। কিন্তু সেই টাকা কে খাবে তার ঠিক নেই। সামন্ত তাই ইদানীং একটু চিন্তিত।

দু-জনে ঘরে ঢুকতেই সামন্ত মুখ থেকে তামাকের নলটা সরিয়ে অল্প আলোয় ঠাহর করে দেখতে দেখতে বলে, 'কে রে? কী চায়?'

গোবিন্দ এগিয়ে গিয়ে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। মুখের ঢাকা সরিয়ে বলে, 'আমি গোবিন্দ, সামন্তমশাই।'

সামন্ত যেন ছ্যাঁকা খেয়ে সোজা হয়ে বসে। বলে, 'কে বললি?'

'গোবিন্দ। মনে পড়ছে না?'

'গোবিন্দ।' বলে সামন্ত হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, 'তোর না ফাঁসি হয়ে গেছে?'

'হলে আর আসতাম কী করে?'

'আয় তো, এগিয়ে আয়, আলোতে ভালো করে দেখি।'

গোবিন্দ হাসিমুখে এগিয়ে গেল। দাড়িগোঁফওয়ালা মুখে সেজবাতির আলো পড়ল।

* * *

রামু ট্রাপিজের খেলা দেখে তাজ্জব। কী সাহস। অন্য সব সার্কাসের মতো এরা নীচে কোনো জালও খাটায়নি। পড়ে গেলে মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাবে। হাত-পা ভেঙে 'দ' হয়ে যাওয়ার কথা

'ঃউ, কী খেলা গবাদা। আমি ট্রাপিজ শিখব।'

গবা হেসে বলে, 'আরও আছে। দেখই না।'

ট্রাপিজ শেষ হতে-না-হতেই সাহেবি পোশাক পরা সার্কাসের ম্যানেজার এসে ঘোষণা করল, 'আজ আপনাদের আমরা একটা নতুন খেলা দেখাব। লখিন্দর আর কালনাগিনীর খেলা। জীবন ও মৃত্যুর খেলা। এই খেলায় একদিকে থাকবে আমাদের নতুন এক ওস্তাদ মাস্টার লখিন্দর অন্যদিকে থাকবে একটি বিষাক্ত রাজগোখরো। সাপটার বিষদাঁত আমরা কামাইনি। যে-কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সদ্য জঙ্গল থেকে ধরা বুনো সাপ। এ খেলা সবার শেষে।'

রামু রোমাঞ্চিত হল। আজ নতুন খেলা। বাঃ, কপালটা ভালো।

এরপর সাইকেল, দড়ি, বাঘ, সিংহ, চোখ বেঁধে ছোরা নিক্ষেপ-একের পর এক হয়ে যেতে লাগল। রামুর আর পলক পড়ে না। বাঘ-সিংহের খেলা দেখে গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল তার। লম্বা আর বেঁটে জোকার দুটোও খুব হাসাল।

সবার শেষে নতুন খেলা।

সব আলো জ্বেলে গোল এরেনাটাকে একেবারে ফাঁকা করে দেওয়া হল। বাজনা বাজতে লাগল অত্যন্ত মৃদু শব্দে। একটা সুরেলা বাঁশির স্বর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

কয়েকজন লোক একটা মস্ত খাচা টেনে আনল মাঝখানে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, খাঁচার মধ্যে একটা বিশাল ভয়ংকর সাপ বিড়ে পাকিয়ে আছে।

খাঁচার মাথায় একটা লোক বসে আছে।

ম্যানেজার একটা পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'এবার আসছেন মাস্টার লখিন্দর। কিন্তু আগেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, মাস্টার লখিন্দরের মুখ আপনারা দেখতে পাবেন না। কয়েক বছর আগে এক দুর্ঘটনায় ওর মুখটি পুড়ে বীভৎস হয়ে যায়। তার ফলে উনি সব সময়েই মুখোশ পরে প্রকাশ্যে আসেন।'

ঘোষণা শেষ হল। বাজনা মৃদু তরঙ্গে বাজতে লাগল। খাঁচার ওপরের লোকটা ছাড়া বাকি সবাই সরে গেল এরেনা থেকে।

আগাগোড়া কালো পোশাক এবং কালো মুখোশ পরা মাস্টার লখিন্দর এসে ঢুকল। ভারি চটপটে তার হাঁটার ভঙ্গি। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, আঁট পোশাকের ভিতর দিয়ে শরীরের

শক্ত বাঁধুনি দেখা যাচ্ছে।

খাঁচার ওপরের লোকটা দরজাটা ওপর দিয়ে টেনে তুলতে না তুলতে বিশাল সাপটা বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এল বাইরে। লখিন্দর তখনও দর্শকদের অভিবাদন শেষ করেনি। ঠিক এই অপ্রস্তুত মুহূর্তে বিশাল গোখরো লখিন্দরের পিঠ সমান উঁচু ফণা তুলে সাঁই করে চাবুকের মতো ছোবল দিল।

সেই দৃশ্য দেখে আর সকলের মতো চোখ বুজে ফেলল রামু। একটা মৃদু 'গেল গেল, এই রে, সব শেষ' গোছের আওয়াজও বেজে গেল চারদিকে।

৫

সবাই চোখ বুজলেও কুন্দকুসুম চোখ বোঝেননি। বরং তাঁর চোখের পলক পড়ছিল না। তাঁবুর চারদিকে যে 'হায় হায়' ধ্বনি ভেসে গেল, তিনি তাতেও যোগ দিলেন না।

বিশাল রাজগোখরো যখন ছোবল দিল, তখন তার দিকে মাস্টার লখিন্দর পেছন ফিরে আছে। আর যে চাবুকের মতো গতিতে ছোবলটা এল, তা থেকে নিজেকে বাঁচানো খুব শক্ত কাজ।

কিন্তু তবু দেখা গেল, সাপটা যেখানে ছোবলটা চালাল সেখানে লখিন্দর নেই। লখিন্দর লাট্টুর মতো একটা পাক খেয়ে কী করে যে সরে গেল এরেনার অন্য ধারে, সেটাই চোখ চেয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলেন কুন্দকুসুম।

ছোবল ফসকে যাওয়ায় সাপটাও বুঝি হতভম্ব। আবার বিশাল ফণা তুলে কুটিল চোখে সাপটা দেখে লখিন্দরকে। কিন্তু ওস্তাদ লখিন্দর তখনও সাপটার দিকে পিছন ফিরে দর্শকদের হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। যেন সে জানেই না যে তার পিছনে কালান্তক যমের মতো গোখরো।

আবার এরেনার ওপর বিদ্যুৎ খেলিয়ে সাপটা এগিয়ে গেল এবং শপাং করে ছোবল বসাল! এবার বাঁ পায়ের ডিমে।

সেই দৃশ্য দেখে দর্শকরা পাগলের মতো চ্যাঁচাতে থাকে, 'মরে গেল মরে গেল!'

লখিন্দর এবার সরেওনি ভালো করে। শুধু বাঁ-পা-টা একটু ছড়িয়ে দিয়েছিল। এক চুলের জন্য ছোবলটা পায়ে না লেগে মাটি ছুঁয়ে উঠে গেল আবার।

'বন্ধ করো! এ সর্বনেশে খেলা বন্ধ করো!' বলে মহিলারা চ্যাঁচাতে লাগলেন। চ্যাঁচানোই স্বাভাবিক। লখিন্দর যে সাপটার দিকে তাকাচ্ছেই না।

সাপটা যখন তৃতীয় বার ছোবল তুলেছে, তখন লখিন্দর উবু হয়ে তার ডান পায়ের জুতোর ঢিলে হয়ে যাওয়া ফিতে বাঁধছে মুখ নীচু করে। সুতরাং তার মাথাটা এবার একেবারে সাপের দোল-দোলন্ত ফণার সামনে।

'আর রক্ষে নেই গবাদা!' বলে রামু হাঁটু খিমচে ধরে।

এবার কুন্দকুসুমেরও চোখ বন্ধ করে ফেলতে ইচ্ছে হল। চোখের সামনে একটা নির্ঘাত মৃত্যু কার দেখতে ভালো লাগে!

সাপটা ফোঁস করে একটা ক্রুদ্ধ আওয়াজ ছেড়ে সটান লখিন্দরের মাথা লক্ষ্য করে হাতুড়ির মতো নেমে এল।

কিন্তু আশ্চর্য এই, বসা অবস্থাতেই লখিন্দর একটা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে সরে গেল পিছনে। একবারও সাপটার দিকে না তাকিয়ে বসে বসে সে জুতোর ফিতেটা শক্ত করে বেঁধে নিল ভারি নিশ্চিন্তভাবে।

পুলিশের একজন ইনফরমার বৈরাগীর ছদ্মবেশে কুন্দকুসুমের পিছনের বেঞ্চে বসে ছিল। কুন্দকুসুম একবার তার দিকে ফিরে ভ্রূ কুঁচকে মাথাটা একটু ওপরে তুললেন। অর্থাৎ লোকটা কে?

ইনফরমার চারদিকে চেয়ে দেখে নিল, কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না। কিন্তু এরেনায় যে খেলা চলছে, তার দিকে রুদ্ধশ্বাস চেয়ে মানুষ কেউ কারও দিকে তাকাতে ভুলেই গেছে। ইনফরমার মুখটা এগিয়ে এনে মৃদু স্বরে বলল, 'জানি না। তবে এ ধরনের খেলা একসময় দেখাত গোবিন্দ ওস্তাদ। কিন্তু কাশিমের চরের সেই মার্ডার কেসে গতকাল তার ফাঁসি হয়ে গেছে।'

'হয়ে গেছে?'

'হয়ে গেছে। গোবিন্দর ভাই জেলখানায় গিয়ে মড়া নিয়ে শ্মশানে দাহ পর্যন্ত করেছে বলে খবর পেয়েছি।'

'মুখোশের আড়ালে লোকটা তাহলে কে একটু খবর নিয়ো।'

'যে আজ্ঞে।'

ওদিকে এরেনায় মুখোশাবৃত লখিন্দর বারবার অবহেলায়, আনমনে ছোবল এড়িয়ে এড়িয়ে সাপটাকে হয়রান করে তুলল। অবশেষে সেই রাজগোখরো যখন ক্লান্তিতে ছোবল মারা মুলতুবি রেখে একেবারে বিড়ে পাকিয়ে বিশ্রাম নিতে বসল তখন শেষ হল খেলা। জীবন ও মৃত্যুর এই বিপজ্জনক খেলা দেখে দর্শকরা এত জোর হাততালি দিল যা অন্য কোনো খেলায় দেয়নি।

লখিন্দর একবার হাত তুলে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এরেনা থেকে।

* * *

রাত গভীর। সার্কাসের চত্বরে যে যার তাঁবুতে ঘুমোচ্ছে। জেগে আছে শুধু কয়েকজন চৌকিদার। আর জেগে আছে বুড়ো সামন্তর তাঁবুতে সামন্ত আর গোবিন্দ ওস্তাদ।

সামন্ত মৃদু স্বরে বলে, 'এবার ঘটনাটা খুলে বল।'

গোবিন্দ একটু হাসল। বলল, 'কাল আমার ফাঁসি হয়ে গেছে। এমনকী দাহকাজ পর্যন্ত সারা।'

সামন্ত তামাকের নলটা মুখ থেকে সরিয়ে বলে, 'আর একটু খোলসা করে বল। তোকে ফাঁসি দেয়নি তো দিল কাকে?'

গোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তা আমি জানি না। ফাঁসি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছিল আমাকে। আমিও তার জন্য তৈরি ছিলাম। কিন্তু মাসখানেক আগে একদিন সকালে আমাকে যখন জেলখানার চত্বরে পায়চারি করাচ্ছিল, তখন দেখি কয়েকজন রাজমিস্ত্রি ভারা বেঁধে জেলখানার উঁচু ঘেরা দেওয়ালে মেরামতির কাজ করছে।'

'তুই তখন কী করলি?'

'আজ্ঞে মাথায় তখন মতলবটা খেলে গেল। ভাবলাম, এই সুযোগ পরে আর পাব না। আমাকে দু-জন বিশাল চেহারার সেপাই পাহারা দিচ্ছিল। আমি তাদের ঠাট্টা করে বললাম ওই যে রাজমিস্ত্রি ভারা বেঁধেছে ওটায় উঠে যদি কোনো কয়েদি পালায় তবে কী করবে? ওরা বলল, অত সহজ নয়। তুই পারবি? আমি হেসে বললাম, চেষ্টা করতে পারি। ওরাও হাসল, বলল, কর না দেখি।'

'বলল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিও ইয়ার্কির ভাব দেখিয়ে হেঁটে গিয়ে ভারার পয়লা বাঁশটায় উঠে পড়লাম। তারা দেখি তখনও মোচে তা দিচ্ছে আর ফিড়িক ফিড়িক করে হাসছে। আমি আর এক ধাপ উঠলাম। কেউ কিছু বলল না। রাজমিস্ত্রিরাও একমনে কাজ করে যাচ্ছে, আমার দিকে তাকাচ্ছে না। এক ধাপ দু-ধাপ করে আমি একদম দেওয়ালের মাথায় পৌঁছে দেখি, তখনও সেপাই দুটো হাসছে আর মোচে তা দিচ্ছে।'

'বলিস কী?'

'যা হয়েছিল তা বলছি। দেওয়ালের মাথায় উঠে আমার মনে হল, কোনো কারণে জেলখানার কর্তৃপক্ষ আমাকে পালানোর সুযোগ ইচ্ছে করেই দিচ্ছে। নইলে ততক্ষণে

পাগলা ঘণ্টি বেজে ওঠার কথা। বাজল না দেখে আমি দেওয়ালের ওপর থেকে ঠাকুরের নাম করে বাইরের দিকে ঝাঁপ মারলাম। ট্রাপিজের খেলা দেখাতে গিয়ে অনেক উঁচু থেকে লাফ মারার অভ্যাস থাকায় হাড়গোড় ভাঙেনি। পড়েই কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে সামলে নিলাম। তারপর দৌড়।'

'তাহলে ফাঁসিটা হল কার?'

'তার আর খোঁজ নিইনি। পালিয়ে সোজা গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। একটা ব্যাগে জামাকাপড় আর কিছু টাকা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুনি। বাড়ির লোককে বলে এলাম, যেন কাউকে কিছু না বলে। নিজের বাড়ি ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর একটা মাত্র আশ্রয় আছে। তা হল এই সার্কাস। সার্কাসের জন্য জেলখানাতেও প্রাণটা কাঁদত। তাই ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়ে পড়েছি।'

'বেশ করেছিস। ভালো করেছিস। তবে কিনা . . .' সামন্তকে একটু চিন্তিত দেখায়।

'আমি এসে কি আপনাকে বিপদে ফেললাম সামন্তমশাই?'

সামন্ত গম্ভীর হয়ে বলে, 'তুই আমার ছেলের মতো। ছেলে যদি বিপদে পড়ে আসে, তাহলে কি নিজের বিপদের চিন্তা থাকে রে গাধা! আমি ভাবছি তুই আজ খেলা দেখিয়ে ভুল করলি কি না। কুন্দ-দারোগা আজ খেলা দেখতে এসেছিল। লোকটা খুবই বুদ্ধিমান। সে যদি গন্ধ পায় তবে তোর পক্ষে এ-জায়গা আর নিরাপদ নয়।'

'খেলা না দেখিয়ে যে হাঁফিয়ে পড়েছিলাম সামন্তমশাই। জেলখানায় তো ধরেই নিয়েছিলাম এই জীবনে আর সার্কাসের খেলা দেখানো হবে না। ঠাকুরের কাছে রোজ বলতাম, পরের জন্মে যেন আবার সার্কাসের খেলোয়াড় হতে পারি।'

সামন্ত মাথা নেড়ে বলে, 'এই সার্কাসকে তুই যে বুক দিয়ে ভালোবাসিস তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? আমারও ইচ্ছে ছিল, মরার সময় এই সার্কাসের সব ভার তোকেই দিয়ে যাব। কিন্তু কাশিমের চরের সেই খুনটাই সব গোলমাল করে দিল।'

এবার গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, 'হরিহর পাড়ুই লোক খুব ভালো ছিল না। কিন্তু তাকে যে আমি খুনি করিনি, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'করি। আমি জানি তুই রাগী বটে, কিন্তু কখনো পিঁপড়েটাকেও মারতে চাস না। খুন তোর দ্বারা হওয়ার নয়।'

* * *

রাত নিশুত হলেই যে সবাই লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ে তা নয়।

উদ্ধববাবুর চণ্ডীমণ্ডপের পাশে একটা ছোট্ট খুপরিতে খাটিয়ায় বিছানো খড়ের বিছানায় কুটকুটে এক কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামসে ঘুমোচ্ছিল গবা পাগলা। কিন্তু ঘুম তার খুব সজাগ। হঠাৎ চটকা ভেঙে সে উঠে বসল।

দুর্দান্ত হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে আজকে। বাইরেটা কুয়াশা আর অন্ধকারে মাখা। খুপরিটার দরজা একটা কাঠের খিল দিয়ে আটকানো ছিল। সেটা খুলে দরজাটা অনেকখানি ফাঁক হয়ে আছে, এটা অন্ধকারেও দেখতে পেল গবা। দেখে মৃদু একটু হাসল। তারপর বেশ হেঁকে বলে উঠল, 'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি। পালা পালা পালা রে বাপ, নইলে হয়ে যাবি যে সাফ। পাগলা গবা ধরবে এসে টুঁটি!'

হয়তো আরও বলত গবা, কিন্তু তার আগেই দরজা নিঃশব্দে আর একটু ফাঁক হল। একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল চৌকাঠে।

'গবা,' একটা ভারী গলার গম্ভীর আওয়াজ হল।

'ও!' গবা জবাব দেয়।

'তুমি আসলে কে তা আমি জানি।'

গবা চোখ পিটপিট করতে থাকে।

লোকটা আবার বলে, 'যদি বেঁচে থাকতে চাও তবে আমি যা বলছি ঠিক তাই করবে। পাগলামির ভান কোরো না। আমি জানি, তুমি কস্মিনকালেও পাগল নও।'

গবা নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে?'

৬

উদ্ধববাবু ওঠেন একেবারে কাকভোরে। তখনও আকাশে চাঁদ তারা থাকে। উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ঠাকুর পুজো সেরে বেড়াতে বেরোন। আর বেরিয়েই বেশ গলা ছেড়ে গান ধরেন।

আসল কথা হল, ছেলেবেলা থেকেই উদ্ধববাবুর খুব গাইয়ে হওয়ার শখ। শখটা খুব তীব্র, কিন্তু তাঁর গলায় সুর নেই। সুরটা এমন জিনিস যে, জন্ম থেকে যার আছে তার আছে। যার নেই, সে গলা সেধে মুখে রক্ত তুলে ফেললেও হবে না।

উদ্ধববাবুর গলা নেই। তবু সেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গলা সেধেছেন, গানের মাস্টারমশাই রেখেছেন, বড়ো বড়ো ওস্তাদের জলসায় গেছেন। তাঁর ধারণা ছিল সাধনায় সব হয়। কিন্তু গানের সাধনা করতে গিয়ে লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি হচ্ছে দেখে বাবা খুব রাগারাগি করতেন। তারপর গান গাইতে বসলে পাড়াপ্রতিবেশীরা কাঁসর-

ঘণ্টা বাজাত, শাঁখে ফুঁ দিত। একবার নতুন এক বউদি তাঁকে বলেছিলেন, 'উদ্ধব ঠাকুরপো, চার আনা পয়সা দেব, আজ আর গান গেয়ো না।'

এইসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর উদ্ধবাবু আর প্রকাশ্যে গান গায় না। তবে তাঁর এখনও ধারণা, চেষ্টা করলে এবং লোকে বাগড়া না দিলে তাঁর গলা একদিন খুলে যেত ঠিকই।

যেত কেন, গেছেই। প্রকাশ্যে গান না গাইলেও রোজ সকালে বেড়াতে বেরিয়ে শহরের নির্জন প্রান্তে এসে উদ্ধববাবু নিয়মিত গলা সাধেন। দীর্ঘদিনের এই গোপন সাধনার ফলে তিনি ইদানীং লক্ষ করছেন, তাঁর গলায় সাতটা সুর চমৎকার খেলা করছে। হাঁ করলেই যেন গলা থেকে সাতটা পাখি বেরিয়ে চারদিকে উড়ে বেড়ায়।

উদ্ধববাবুর খুব ইচ্ছে, এবার একদিন লোকজন ডেকে সকলের সামনে গান গেয়ে তাক লাগিয়ে দেন। কিন্তু মুশকিল হল, ওস্তাদ রাঘব ঘোষকে নিয়ে। উদ্ধববাবু রাঘবকে দু-চোখে দেখতে পারেন না। সারা তল্লাটের লোক রাঘবকে বড়ো ওস্তাদ বলে কেন যে অত খাতির করে, তাও তাঁর বোধের অগম্য।

সে যাই হোক, একদিন তিনি পুবের মাঠে এক শিশিরভোরে খুব আবেগ দিয়ে ভৈরবী ধরেছিলেন। চোখ বুজে গাইছেন। হঠাৎ একটা ফোঁপানির শব্দে গান থামিয়ে চোখ মেলে দেখেন, সামনেই রাঘব। ধুতির খুঁটে চোখ মুছে রাঘব বললেন, 'এমন অনৈসর্গিক গান কখনো শুনিনি উকিলবাবু। তবে বলি এ গান সকলকে শোনানোর নয়। বিশেষ করে আপনার মক্কেলরা যদি শোনে, তবে তাদের ধারণা হবে, ইনি যখন এত ভালো গায়ক, তখন নিশ্চয়ই ভালো উকিল নন। কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে একজন মানুষ সাধারণত একটা বিষয়েই পারফেকশন লাভ করতে পারে।'

সেই থেকে উদ্ধববাবুর রাগ। ইচ্ছে করেই তিনি রোজ সকালে একবার রাঘব ঘোষের বাড়ির কাছাকাছি এসে খানিকক্ষণ গান ধরেন। অভদ্র লোকটা বুঝুক গান কাকে বলে। আজও উদ্ধববাবু পুবের মাঠে এসে রাঘবের বাড়ির দিকে মুখ করে চমৎকার তান লাগালেন ভৈরবীতে। গাইতে গাইতে তাঁর নিজের পিঠ নিজেরই চাপড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, শাব্বাশ।

আশ্চর্য, এই চোখ বুজে গাইতে গাইতেই হঠাৎ টের পেলেন, কে যেন সত্যিই তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠল, 'শাব্বাশ।'

উদ্ধববাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন গবা পাগলা!

গবাও বেকুবের মতো চেয়ে চেয়ে খানিকক্ষণ তাঁকে দেখে বলে উঠল, 'উদ্ধবকর্তার যে আবার গান-বাজনাও আসে, তা তো জানতাম না।'

উদ্ধববাবু একটু রাগের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কী করছিস?'

গবা মাথা চুলকে বলল, 'আজ্ঞে কিছু করছিলাম না। কাল রাতে একটি লোক আমাকে এখানে খুন করে রেখে গেল। সেই থেকে মরে পড়েছিলাম। হঠাৎ এই সকাল বেলায় আপনার গানে প্রাণ ফিরে এল। ঃও, কী গান। মড়া পর্যন্ত উঠে বসে।'

'কী যা-তা বলছিস। কে তোকে মেরে রেখে গেল?'

'আজ্ঞে, তাকে তো চিনি না। কালো পোশাক পরা, মুখ ঢাকা। রাতে গিয়ে আমার ঘরে হাজির। বলল, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, অনেক টাকা দেব। রাজি না হলে প্রাণ যাবে।'

'বলিস কী?'

'আজ্ঞে, যা ঘটেছিল, বলছি। লোকটা বেশি ধানাইপানাই না করে বলল, উদ্ধববাবু যে কাকাতুয়াটা কিনেছেন সেটা আসলে আমার। কিন্তু প্রমাণ করার উপায় নেই। আমি পাখিটাকে কিনতে চাই, কিন্তু উদ্ধববাবু বেচতে তেমন গা করছেন না। আইন দেখাচ্ছেন। আমার বড়ো আদরের কাকাতুয়া। তা তুমি যদি পাখিটা উদ্ধার করে দিতে পার, তবে দু-শো টাকা পাবে। নইলে . . .'

'নইলে মেরে ফেলবে?'

'ওর নইলে কথাটায় আমার খটকা লাগল। পাখিটা ফেরত চায় কেন? অত গরজ কীসের? তা আমি সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতেই লোকটা অ্যাই বড়ো একটা ভোজালি বের করে আর এক হাতে আমার টুঁটি ধরে টানতে টানতে মাঠের মধ্যে নিয়ে এল।'

'অ্যাটেমপট অব মার্ডার।' উদ্ধববাবু ওকালতি-মাথা কাজ করছে। বিড়বিড় করে বললেন, 'অ্যাটেমপট অব থেপট, থ্রেটেনিং অ্যান্ড অ্যাসল্ট। তা লোকটা হঠাৎ ভোজালি বের করলই-বা কেন? তুই তাকে কী বলেছিলি?'

'আজ্ঞে আমি তাঁকে বলেছিলাম, যুধিষ্ঠিরবাবু, আপনার পাখিটার জন্য এত গরজ কীসের?'

'যুধিষ্ঠিরবাবু! সে আবার কে?'

'আপনি চেনেন তাঁকে! বাচ্চাদের বাড়িতে পড়ান যে নতুন মাস্টারমশাই, তিনি-'

'বলিস কী! লোকটা কি সত্যিই যুধিষ্ঠির?'

'আজ্ঞে না। সত্যিকারের যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্তুর। ইনি তিনি নন।'

'আরে দূর গাধা! আমি বলছি আমাদের যুধিষ্ঠির কি না।'

'তাই বা বলি কী করে? তবে যুধিষ্ঠিরবাবু খুব পান আর জর্দা খান। আমিও রাত্রিবেলায় যমদূতটার মুখ থেকে সেই জর্দার গন্ধ পেয়েছিলাম। তাই-'

'তারপর?'

'তারপর মাঠের মধ্যে এনে লোকটা ছোরা রেখে দু-হাতে আমার গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলল।'

'ফেলল? তবে বেঁচে রইলি কী করে?'

'কে বলল বেঁচে ছিলাম? সেই কখন থেকে মরে পড়ে আছি। সকাল বেলা আপনার গান শুনে মরা দেহও জেগে উঠল। তাই ভাবলাম, এমন যার গান, তাকে একটা শাবাশ জানিয়ে আসি। তা এসে দেখি আপনি স্বয়ং।'

উদ্ধববাবু গানের কথায় একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, 'গানের কথাটা অত বলার দরকার নেই।'

গবা অবাক হয়ে বলে, 'বলেন কী? এমন উপকারী গান আমি জন্মে শুনিনি! আপনার গান শুনতে তেমন ভালো নয় বটে। মাথা ঘোরে, গা বমি বমি করে, ভিতরটা কেমন চমকে চমকে ওঠে। কিন্তু মরা শরীরে প্রাণও ফিরে আসে। পারবে রাঘব ঘোষ এমন গান গাইতে? রাঘবের তা-না-না কেবল লোক ভোলানোর জন্য। এখনও সা লাগাতে পারল না ঠিকমতো।'

এ কথায় উদ্ধব খুশি হলেন। বললেন, 'হুঁ।'

গবা বলল, 'এ গান অবহেলার বস্তু নয়। কবরখানার কাছে বসে গাইলে কবর ফুঁড়ে অনেক মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠে আসবে। শ্মশানের কাছে বসে গাইলে অনেক মড়া চিতা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে।'

'ঃআ! বাজে বকিস না তো! আমি ভাবছি কাকাতুয়াটার কথা। ওটাকে নিয়ে চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। খোঁজ নিয়ে বের কর যে কাকাতুয়াটা আসলে কার! পাখিটা মাঝে মাঝে টাকার কথা বলে। মনে হয় কোনো গুপ্ত টাকার খোঁজ জানে, কিন্তু স্পষ্ট করে বলে না।'

'আমারও তাই মনে হয়। দেখবখন খোঁজ নিয়ে।'

শেষরাতে যখন গোটা সার্কাসের চত্বরটা ঘুমে অচেতন, তখন হঠাৎ নিঃশব্দে একটা ছায়ামূর্তি বাঘের খাঁচার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার চেহারা বিশাল দশাসই। কিন্তু হাঁটাচলা বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র এবং নিঃশব্দ।

ছায়ামূর্তি সবচেয়ে কাছের ছোট্ট একটা তাঁবুর দরজার পর্দা তুলে ঢুকে যায়। তার হাতে খোলা রিভলবার এবং টর্চ। টর্চটা জ্বেলে সে ঘুমন্ত লোক দুটোকে দেখে। এরা নয়।

আবার ক্ষিপ্র ও নিঃশব্দ গতিতে বেরিয়ে আসে ছায়ামূর্তি, আর একটা তাঁবুতে ঢোকে। এখানে চার জন লোক ঘুমিয়ে আছে। টর্চ জ্বেলে ছায়ামূর্তি তাদের ভালো করে দেখে নেয়। না, এরাও নয়।

ছায়ামূর্তি একের পর এক তাঁবুতে হানা দেয়। কিন্তু যে লোকটাকে দেখবে বলে আশা করছে তাকে কোথাও দেখতে পায় না।

শেষ তাঁবুটা একটু দূরে। খুব ছোট্ট। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। এমনকী ফটকটায় তালা লাগানো।

ছায়ামূর্তি একটু দাঁড়ায়। তারপর চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে টপ করে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে যায়।

রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে লোকটা খুব সতর্কতার সঙ্গে চারদিক দেখে নেয়। তারপর খুব সাবধানে পর্দাটা ফাঁক করে টর্চ জ্বালে। অস্ফুটস্বরে বলে, 'আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য!'

আশ্চর্য হওয়ারই কথা। তাঁবুটার মধ্যে কিছুই নেই। এমনকী, অন্যান্য তাঁবুর মতো একটা খাটিয়াও না, মানুষ তো দূরের কথা।

ছায়ামূর্তি টর্চটা জ্বেলে চারদিকে ঘুরে ঘুরে খুব ভালো করে দেখে। না, এই তাঁবুটা এখানে কেউ ব্যবহার করেনি। কিন্তু এই ফাঁকা তাঁবুটার জন্য এত সতর্কতা কেন তা সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ ছায়ামূর্তি চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাইরে একটা ঢিল পড়ার শব্দ হল না? বেশ বড়ো একটা ঢিল।

ছায়ামূর্তি খুব সতর্কতার সঙ্গে দরজার কাছে আসে এবং বাইরে উঁকি মারে। চারদিকে আজ বেশ কুয়াশা আছে। ভীষণ ঠান্ডা। শেষরাতের একটু জ্যোৎস্নায় চারদিক খুব আবছা দেখা যায়।

ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসার জন্য বাইরে পা দিতেই ঘটনাটা ঘটল।

পিছন থেকে হঠাৎ কে যেন বজ্রকঠোর হাতে পেঁচিয়ে ধরল তার গলা। তারপর হাঁটু দিয়ে কোমর ঠেসে ধরল। ছায়ামূর্তি নিজে প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক। গায়ের জোরে তার জুড়ি নেই। সুতরাং সে এক ঝটকায় হাতের বাঁধনটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। যে তাকে ধরেছে সে শুধু তার চেয়ে বেশি শক্তিশালীই নয়, অনেক বেশি ক্ষিপ্রও। এক হাতে ছায়ামূর্তির গলাটা ধরে রেখেই অন্য হাতে রিভলবার-ধরা হাতের ওপর একটা কারাটে চড় বসাল।

রিভলবারটা ছিটকে গেল হাত থেকে। ছায়ামূর্তি যন্ত্রণায় ওফ বলে আবার লোকটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু জোঁকের চেয়েও ছিনে লোকটার হাত আরও বজ্রবাঁধনে চেপে ধরল তাকে। ছায়ামূর্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

৭

সামন্তমশাইয়ের তাঁবুতে কুন্দকুসুম চোখ মেলে চাইলেন। তার জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞানবয়সে এর আগে আর কখনো কোনো অবস্থাতেই তিনি জ্ঞান হারাননি। অজ্ঞান হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম। কারও সঙ্গে গায়ের জোরে হেরে যাওয়াও এই প্রথম।

প্রবল শীতের মধ্যে একটা লোক তাঁর মুখে অনবরত জলের ঝাপটা দিচ্ছিল। কুন্দকুসুম জলদগম্ভীর স্বরে তাকে বললেন, 'আর না।'

তারপর উঠে বসলেন। লোকটা বিনীতভাবে একটা গামছা এগিয়ে দিল। তিনি মুখ মুছতে মুছতে দেখলেন, সামনেই একটা ফোল্ডিং চেয়ারে সামন্তমশাই উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। চোখে চোখ পড়তেই বলে, 'এখন একটু ভালো বোধ করছেন তো?'

কুন্দকুসুম নিজের গলায় হাত বোলালেন। ব্যথা। কোমরেও যেন কুমির কামড়ে ধরে আছে। কবজিটাও বেশ কাবু। ঝিনঝিন করছে। কিন্তু সেই বলবান লোকটার রাক্ষুসে আলিঙ্গনে তার এতক্ষণে মরে লাশ হয়ে যাওয়ারই কথা। বেঁচে যে আছেন সেই ঢের। জলদগম্ভীর গলাতে বললেন, 'বেশ ভালো বোধ করছি। এ-যাত্রায় মরছি না। মরলে আপনার পোষা হারকিউলিসটির ফাঁসি হত।'

সামন্তমশাই শশব্যস্তে বলে, 'আগে একটু গরম দুধ খান। গায়ে বল হোক, তারপর সব কথা।'

তার ইশারায় মুহূর্তের মধ্যে একটা আধসেরি গ্লাস ভরতি ঈষদুষ্ণ দুধ এসে গেল।

কুন্দকুসুম দুধটায় চুমুক দিয়ে বলেন, 'বাঃ, বেশ দুধ। তা এ নিশ্চয়ই গোরুমোষের দুধ নয়।'

'কেন বলুন তো!'

'আপনার হারকিউলিসটির গায়ে যা জোর, তাতে মনে হয় সে হাতির দুধ খায়। কিংবা বাঘের। আপনার সার্কাসে বাঘ আর হাতির তো অভাব নেই।'

সামন্ত বিনীতভাবে হাসে। তবে তার চাউনিতে উদবেগটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কুন্দকুসুমের এই দুধটুকুর দরকার ছিল। চোঁ করে দুধটুকু খেয়ে গ্লাস নামিয়ে রেখে বললেন, 'বিনা নোটিশে কাল রাতে আপনার তাঁবুতে হানা দেওয়া আমার উচিত হয়নি এটা মানছি। আমার সার্চ ওয়ারেন্টও ছিল না।'

সামন্তমশাই গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, 'আজ্ঞে একটা নোটিশ দিয়ে এলে এই বিপদে পড়তেন না। অন্ধকারে আপনাকে চিনতে না পেরে চোর-ছ্যাঁচড় ভেবে আমাদের ওয়েটলিফটার ছেলেটা ওই কাণ্ড করে ফেলেছে।'

কুন্দকুসুম একটা শ্বাস ফেলে বললেন, 'ওর দোষ নেই। আমার আচরণটা চোরের মতোই হয়েছিল। আপনার পাহারাদাররা আমাকে ধরতে পারেনি, কিন্তু এই ছোকরা-কী নাম ছোকরার?'

'আজ্ঞে ভবতোষ। খুব ভালো ছেলে। ধার্মিক। মাঝরাতে উঠে নামধ্যান করে। কাল রাতেও তাই করছিল।'

'হ্যাঁ ভবতোষ। তা এই ভবতোষ তো দিব্যি কারাটেও জানে। যা একখানা ঝেড়েছিল আমার কবজিতে। ভালো কথা, পিস্তলটা আছে তো?'

সামন্ত মাথা নেড়ে বলে, 'আছে। চিন্তা করবেন না।'

কুন্দকুসুম বলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমার এই আচরণের অর্থ কী! বলতে বাধা নেই, সেদিন সেই সাপের খেলা দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। কোনো মানুষের অত অ্যাজিলিটি থাকতে পারে তা জানতাম না। কিন্তু মনে হয়েছিল মাস্টার লখিন্দরের আসল নাম মাস্টার লখিন্দর নয়। মুখোশের আড়ালে লোকটি কে সেটা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।'

সামন্তের চোখে উদবেগটা বাড়ল। বলল, 'আজ্ঞে সে আর বেশি কথা কী? হুকুম করলেই তাকে সামনে এনে হাজির করতাম। খামোখা এত কষ্ট করতে গেলেন।'

কুন্দকুসুমের আচরণটা যে অদ্ভুত ঠেকছে লোকের চোখে, তা তিনি জানেন। কিন্তু তার জন্য লজ্জা পেলেন না। লজ্জা পাবার অভ্যাস তাঁর নেই।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পুলিশের কাজ একটু অন্যরকম হয়। সবসময় সোজা পথে চললে আমাদের চলে না। ঠিক আছে, লখিন্দরকে একবার ডাকুন।'

আবার সামন্তর ইঙ্গিতে একজন বেরিয়ে যায়। মিনিটখানেকের মধ্যেই বেশ ছমছমে চেহারার এক ছোকরা তাঁবুতে ঢুকে কুন্দকুসুমকে নমস্কার করে দাঁড়ায়।

কুন্দকুসুম চোখ দিয়ে লোকটাকে মেপে নিচ্ছিলেন। আড়েদিঘে লোকটা অবিকল লখিন্দরের মাপসই বটে সন্দেহ নেই। কিন্তু কুন্দকুসুমের চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।

বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা আসল লখিন্দরের একটু বেশি মাত্রায় ছোটো ছিল। তিনি একটু বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'এই কি সেই?'

'আজ্ঞে। দলছুট হয়ে গিয়েছিল। ওর ঠাকুমার খুব অসুখ। তাঁকে দেখতে দেশের বাড়িতে যাওয়ায় এখানে প্রথমে খেলা দেখাতে পারেনি। অদ্য ফিরেছে।'

'হুঁ।' বলে কুন্দকুসুম ছেলেটার দিকে চেয়ে বলেন, 'তোমার নাম কী?'

'লখিন্দর। লখিন্দর কর্মকার।'

'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

কুন্দকুসুম যে সন্তুষ্ট হননি, তা টের পেল সামন্ত। মুখে উদবেগটা বাড়ল। বলল, 'লুচি ভাজা হচ্ছে। একটু বসে যান দারোগাবাবু।'

'নাঃ, কাজ আছে।' বলে কুন্দকুসুম উঠলেন।

বাড়িতে ফিরে সেদিন কুন্দকুসুম তাঁর দুই ছেলে আন্দামান আর নিকোবরকে খুব পেটালেন, পড়ার টেবিলে বসে কাটাকুটি খেলছিল বলে। আসলে সেটা কারণ নয়। খুব রেগে গেলে কুন্দকুসুমের রাগ পড়ে একমাত্র কাউকে ধরে বেধড়ক পেটালে।

বাসায় এসে তিনি আড়কাঠিকে ডেকে পাঠালেন। সুড়ুঙ্গে চেহারার ধূর্ত লোকটা এসে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর খবর ঠিক তো?'

'আজ্ঞে একদম পাকা।'

'সামন্ত কিন্তু অন্য এক ছোকরাকে দেখাল।'

'সামন্ত খুনিটাকে আড়াল করছে।'

'আচ্ছা যা। চোখ-কান খোলা রাখিস।'

* * *

যুধিষ্ঠির রায় সকাল বেলায় যথারীতি পড়াতে এসেছেন। নিপাট ভালোমানুষ। সাদা ধুতি আর সাদা শার্ট পরনে। অল্পবয়সি। চোখেমুখে লেখাপড়া এবং বুদ্ধির ছাপ আছে। তবে দোষের মধ্যে জর্দা দেওয়া পান খান।

উদ্ধববাবু তক্কে তক্কে ছিলেন। কাছারিঘরে মক্কেলদের ভিড় ছিল খুবই। তবু এক ফাঁকে এসে ছেলেদের পড়ার ঘরে হানা দিলেন। উদ্ধববাবু কোনোরকম নেশা পছন্দ করেন না। তিনি নিজে সুপুরিটা পর্যন্ত খান না। বাচ্চাদের পড়ার ঘর জর্দার গন্ধে ম-ম করছে। তিনি একটু নাক কোঁচকালেন। গন্ধটা খারাপ নয়। বরং বেশ ভালো দামি আতরের গন্ধই। কিন্তু

বাচ্চাদের শিক্ষকরা যদি নেশা-টেশা করেন, তাহলে শিশু-মস্তিষ্কে তার প্রভাব পড়তে পারে।

উদ্ধববাবু গলা খাঁকারি দিলেন। যুধিষ্ঠির খুব নিবিষ্ট মনে রামুকে অঙ্ক করাচ্ছিলেন। শব্দ শুনে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কিছু বলবেন?'

উদ্ধববাবু ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষকদের সম্মান করতে শিখেছেন। তাঁর মতে দেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন শিক্ষকরা। রাষ্ট্রের উচিত প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির চেয়ে শিক্ষকদের বেশি সম্মান দেওয়া। নইলে শিক্ষকের ওপর ছাত্রদের শ্রদ্ধা আসে না। আর শ্রদ্ধা ছাড়া জ্ঞান আসবে কী করে?

উদ্ধববাবু খুব বিনীতভাবে হাতজোড় করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আজ্ঞে কথা সামান্যই। আপনার ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। বসুন।'

যুধিষ্ঠির বসলেন। কিন্তু উদ্ধববাবু কথাটা কীভাবে শুরু করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। তিনি উকিল মানুষ। পাজি-বদমাশ-খুনে দেখে দেখে চোখ পেকে গেছে। সেই অভিজ্ঞ চোখে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কোনো খুনির লক্ষণ দেখলেন না।

উদ্ধববাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'ইয়ে, আপনার পান খাওয়ার অভ্যাস আছে দেখছি।'

'আজ্ঞে। পান খেলে আমার কনসেনট্রেশনটা ভালো হয়।'

'তা ভালোই। ইয়ে, বলছিলাম কী, আপনি কি রাত্রি বেলায় পান-জর্দা খান?'

যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়ে বলেন, 'আজ্ঞে না! সারাদিনে এই সকাল বেলাই একটা। ব্যস।'

উদ্ধব মাথা চুলকে বললেন, 'গবাটা যে কী সব আবোল-তাবোল বকে তার ঠিক নেই।'

'গবা কে?'

'ওই একটা পাগল আছে। এ-বাড়িতেই থাকে।'

যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে বলেন, 'গবা পাগলা? ঃও হোঃ, তার কথা সব শুনেছি। লোকে বলে লোকটা নাকি ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক। তার সঙ্গে একবার দেখা করার খুব ইচ্ছে আছে।'

উদ্ধববাবু দুম করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের বাড়িতে একটা কাকাতুয়া আছে তা কি আপনি জানেন?'

যুধিষ্ঠির আরও একটু অবাক হয়ে বললেন, 'জানি বই কী। রামুর মুখে শুনেছিলাম আপনাদের কাকাতুয়াটা নাকি গুপ্তধনের কথা বলে।'

উদ্ধববাবু একটু রাগত চোখে রামুর দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন, 'কাল রাতে আপনার ভালো ঘুম হয়েছিল তো?'

উদ্ধববাবুর ছেলে-মেয়েরাও পড়া ভুলে বাবার দিকে চেয়েছিল। এবার তারা নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করতে লাগল। যুধিষ্ঠিরও খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। পান, কাকাতুয়া, ঘুম এসব অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে তারা সবাই অবাক।

উদ্ধববাবু বুঝতে পারছেন, আদালতে দাঁড়িয়ে যত ভালো সওয়ালই করুন না কেন আজ ছেলে-মেয়েদের সামনে তাদের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সওয়াল-জবাব করতে গিয়ে তিনি নিতান্ত আহাম্মক বা পাগল বলে প্রমাণ হচ্ছেন।

যুধিষ্ঠির অবাক হলেও কথায় তা প্রকাশ করলেন না। বিনীত ভাবেই বললেন, 'আজ্ঞে আমার বরাবরই ভালো ঘুম হয়। কাল রাতেও মড়ার মতো ঘুমিয়েছি।'

'বেশ বেশ।' বলে উদ্ধববাবু তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। গবাটাকে হাতের কাছে পেলে মাথায় কষে একটা গাঁট্টা লাগাতেন।

কিন্তু গবা হাতের কাছে ছিল না।

৮

সকাল বেলায় সার্কাসের খেলোয়াড়রা ট্রেনারের নির্দেশে কসরত করছিল। আসল যে-সব খেলা তারা দেখায়, তার চেয়েও এই কসরত বেশি কঠিন।

কসরতের সময় ট্রাপিজের জন্য নীচে জাল টাঙানো হয়েছে। জালের ওপর অনেক উঁচুতে, শূন্যে ট্রাপিজ-শিল্পীরা দোল খাচ্ছে। জালের নীচে চলছে সাইকেল, বিম ব্যালান্স ইত্যাদি। এক ধারে শক্ত করে দুটো খুঁটিতে বাঁধা তারের ওপর চলছে শীর্ষাসন। এক চাকার সাইকেলে একজনকে কাঁধে নিয়ে আর একজন এপার-ওপার হচ্ছে। আগু-পিছু করে। জোকাররা নানারকম ডিগবাজির ভেলকি লাগাচ্ছে এরেনার অন্য ধারে। দামি সিটের একটা চেয়ারে বিমর্ষ মুখে বসে দেখছে সামন্ত। পুলিশ পিছনে লেগেছে, এখানকার ডেরাডান্ডা শিগগিরই তুলতে হবে। কিন্তু তুললেই যে রেহাই মিলবে এমন নয়। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হওয়ার পর কিছুদিন পুলিশের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। গোবিন্দকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর ঝামেলা মিটেছিল বটে, কিন্তু গোবিন্দের শোকে সামন্তর আহার-নিদ্রা ঘুচে গিয়েছিল। গোবিন্দ ফিরেছে, সেই সঙ্গে ঝামেলাও। মেরে ফেললেও অবশ্য সার্কাসের কেউ পুলিশের কাছে স্বীকার করবে না যে, গোবিন্দ এখানে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাতে আর কতটুকু কী ভালো হবে? ভেবে ভেবে সামন্তর মাথা গরম, মন উচাটন।

একটা উটকো লোক হঠাৎ তাঁবুতে ঢুকে পড়ায় একটা শোরগোল পড়ে গেল। সামন্ত চোখ তুলে দেখে, একটা পাগল। গায়ে আলপাকার কোট, গালে দাড়ি, ময়লা পাতলুন। লম্বা লম্বা চুলে জট পড়েছে। বেঁটে জোকার বক্রেশ্বর রে-রে করে তেড়ে গেল তার দিকে। লোকটা বক্রেশ্বরকে লক্ষই করল না। চারদিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, 'ছোঃ, এইসব খেলা দেখিয়ে লোক ঠকাও নাকি তোমরা?'

বক্রেশ্বর যখন খেলা দেখায় তখন তার হাতে একটা চুষিকাঠি থাকে। সেইটেই সে লাঠির মতো ব্যবহার করে। এখনও সেইটে বাগিয়ে ধরে বলল, 'দেব নাকি কয়েক ঘা?'

লোকটা বক্রেশ্বরকে ভালো করে দেখার জন্য কোটের পকেট থেকে একটা দূরবিন বের করে চোখে লাগায়। ভালো করে দেখে নিয়ে বলে, 'তোমার চেয়ে ঢের বেঁটে লোক দেখেছি। অত কায়দা দেখিয়ো না।'

বক্রেশ্বর বুক ফুলিয়ে বলে, 'আমি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেঁটে মানুষ। নইলে আমাকে ঠাহর করতে তোমার দূরবিন লাগল কেন হে?'

লোকটা হেসে বলে, 'অ্যায়সা বেঁটে মানুষও আছে, যাকে দেখতে মাইক্রোস্কোপ লাগে। যাও, যাও মেলা বোকো না।'

বক্রেশ্বর চুষিকাঠিটা তুলে মারতে গেল। কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে থমকে গিয়ে খানিকক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'আরে! চেনা চেনা লাগছে যে।'

'আমাকে সবাই চেনে। আমি হচ্ছি গবা পাগলা।'

'সাজা পাগল? না হওয়া পাগল?'

'আসল পাগল হে, আসল পাগল?'

'বেশি বোকো না, তোমার চেয়ে ঢের বেশি পাগল লোক আমি দেখেছি।'

'দেখেছ? সত্যি?'

'সেইসব পাগলকে দেখলেই বোঝা যায়, এই হচ্ছে খাঁটি পাগল। তাকে বলতে হয় না, আমি অমুক পাগলা।'

গবা মুখ বিকৃত করে বলল, 'এমন পাগলামি দেখাতে পারি যা দেখলে তোমার পিণ্ডি চটকে যাবে। কিন্তু এখন কাজে আসা, পাগলামির সময় নেই। সামন্তমশাইকে দুটো কাজের কথা জিজ্ঞেস করে যাব। তিনি কোথায়?'

বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে লোকটাকে দেখে হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, 'বলি ও ভাই পাগলা গবা! আর কতকাল পাগলা রবা? গোল ছেড়ে কও আসল কথা। পা নেই তার পায়ে ব্যথা।'

লোকটা মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'ভূতের যদি সর্দি সারে, রাবণ যদি রামকে মারে, ঈশ্বর যদি বক্র তবে, গবা পাগল কেন হবে?'

বক্রেশ্বর আর গবার এই তকরারে কেউ মনোযোগ দিচ্ছিল না। যে যার কাজে ব্যস্ত। বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে আবার ফিক করে হেসে বলল, 'চাঁদ বদনখানা দাড়িগোঁফে বড়োই ঢাকা, তবু চেনা চেনা ঠেকছে হে। গলার স্বরটা লুকোতে পারনি। তা চেনা যখন দিতে চাও না, আমারই বা কী এমন দায় ঠেকেছে চিনবার। ওই হোথা সামন্তমশাই বসে আছেন। চলে যাও সিধে।'

হাত তুলে বক্রেশ্বর সামন্তকে দেখিয়ে দেয়।

গবা গিয়ে সামন্তর পাশের চেয়ারে বেশ জুত করে বসে বলে, 'এবার ঠান্ডাটাও পড়েছে মশাই।'

সামন্ত লোকটাকে বিরক্তির চোখে দেখে বলে, 'কী চাই?'

গবা একটু অপমান বোধ করে বলে, 'ভালো লোকেদের একটা দোষ কী জানেন? তারা পাগল-ছাগলকে পাত্তা দিতে চায় না। তারা ভাবে, পাগলগুলো সত্যিই পাগল। তা পাগলগুলো কি আর পাগল নয়? তারা তো পাগলই। কিন্তু ভালো লোকগুলো এমন পাগল না মশাই, কী বলব আপনাকে . . . হিঃ হিঃ . . . পাগলগুলো যদি ভালো লোক হত তাহলে দেখতে পেত, আসলে ভালো লোকগুলোই এমন পাগল যে পাগলকেই কেবল পাগল ভাবে।'

সামন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, 'বুঝলাম, কিন্তু কথাটা কী?'

'কথা কি একটা? কথা অনেক।'

'সংক্ষেপে বলে ফেলো।'

'বলছিলাম কী, এসব কি খেলা নাকি? বিষ্টুপুরের ওরিয়েন্ট সার্কাস কী দেখাচ্ছে জানেন?'

'কী দেখাচ্ছে?'

'ট্রাপিজ-ফাপিজ নেই স্রেফ শূন্যে কিছু লোক উড়ে বেড়াচ্ছে। আপনি তারের খেলা দেখাচ্ছেন, তাঁরা দেখাচ্ছে বেতারের খেলা। এ-খুঁটো থেকে ও-খুঁটো কেবল একটা বাতাসের দড়ি টাঙানো, তারই ওপর দিয়ে লোকে সাইকেল চালাচ্ছে, হেঁটমুণ্ড হয়ে কসরত করছে। তা ছাড়া, আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, আপনাদের বামনবীর মাত্র আড়াই ফুট লম্বা, আর ওরা কী দিয়েছে জানেন? ওরা বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আমাদের বামনবীর মাত্র তিন ফুট বেঁটে।'

'তাই নাকি?'

'আলবাত তাই। লম্বাই যদি হবে, তবে আর বেঁটে বলবেন কী করে? বলতে হলে এরকমই বলতে হয়, আমাদের বামনবীর তিন ফুট বেঁটে বা চার ফুট বেঁটে বা পাঁচ ফুট বেঁটে বা ছয় ফুট বেঁটে বা-'

'থাক থাক। আর বলতে হবে না।'

'বুঝেছেন তো?'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝলেন?'

'বুঝলাম তুমি খাঁটি পাগল।'

গবা মাথা নেড়ে বলে, ভালো মানুষদের তো ওই একটাই দোষ। তারা পাগলকে ভাবে পাগল। পাগলরা যে সত্যিই পাগল তা কি পাগলরা জানে না? আর তারা যে পাগল সেইটে বোঝানোর জন্য কোনো পাগল কি পাগল ছাড়া অন্য কোনো পাগলের কাছে যায়? বলুন!'

সামন্ত জ্বালাতন হয়ে বলে, 'তাও বুঝলাম। কিন্তু বাপু হে, আজ আমার মনটা ভালো নেই।'

'মন ভালো করার ওষুধ আমি জানি।'

'বটে! কী ওষুধ?'

'একদম পাগল হয়ে যান। ভালো মানুষরা যদি পাগল না হয়, তাহলে পাগলরা যে পাগল তা বুঝবে কী করে? আর একবার যদি পাগল হয়ে পাগলামির মজা টের পায়, তবে কি আর মন খারাপ থাকে?'

'ঃও!' বলে সামন্ত নিজের মাথা চেপে ধরল।

গবা বলল, 'এই কথাটাই বলতে আসা মশাই। তবে যাওয়ার আগে, দু-চারটে আজেবাজে কথাও বলে যাই। কথাটা হল, গোবিন্দ মাস্টার খড়ের গাদায় পৌঁছেছে। রাত্রে স্পাই আসবে। রামু নামে একটা ছেলে আসতে পারে খেয়াল রাখবেন।'

বলে গবা উঠে পড়ল।

সামন্ত মুখ তুলে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

গবা এরেনাটা পার হওয়ার সময় তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে খেলোয়াড়দের কসরত দেখে বক্রেশ্বরের দিকে চেয়ে বলে, 'আড়াই ফুট লম্বা! হুঁ! লম্বাই যদি হলে তবে বেঁটে বলে অত বড়াই কেন?'

বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে বলে, 'তুমিও যেমন পাগল, আমিও তেমনি লম্বা।'

গবা আর কথা বাড়ায় না। বেরিয়ে সোজা হাঁটতে থাকে।

রবিবার বলে আজ একটু বেলায় বাজার করে হরিহরবাবু আর গদাধরবাবু ফিরছিলেন। গবার সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

গদাধরবাবু গদগদ হয়ে বললেন, 'এই যে বৈজ্ঞানিক গবা, তোমার সারানো ঘড়িটা অদ্ভুত চলছে হে। একেবারে ঘণ্টায় মিনিটে সেকেন্ডে।'

হরিহরবাবু সঙ্গেসঙ্গে বললেন, 'তবে উলটো দিকে।'

গদাধরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দেখুন হরিহরবাবু-'

হরিহরবাবুও সঙ্গেসঙ্গে বললেন, 'কী বলবেন তা জানি গদাধরবাবু। তবে বলে লাভ নেই, গবা বিজ্ঞানের ব-ও জানে না। ও গবা, বল তো, কাইনেটিক এনার্জি কাকে বলে!'

গবা একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে বলে, 'আপনিই তো বলে দিলেন।'

'তার মানে?'

'কাইনেটিক এনার্জিকেই কাইনেটিক এনার্জি বলে। খুব সোজা কথা।'

হরিহরবাবু একগাল হেসে বলেন, 'দেখলেন তো গদাধরবাবু, গবা কাইনেটিক এনার্জি কাকে বলে জানে না।'

গদাধরবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কে বলল জানে না? এই তো বলল শুনলেন না? কাইনেটিক এনার্জিকেই কাইনেটিক এনার্জি বলে?'

দু-জনের মধ্যে আবার একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠল।

কিন্তু গবার সময় নেই। সে দ্রুত পায়ে চলেছে শহরের আর এক প্রান্তে। একটা খড়ের গাদায়।

৯

পাখিদের মুশকিল হল তারা পুরোনো কথা বেশিদিন মনে রাখতে পারে না। মস্তিষ্কের ততখানি ক্ষমতা তাদের নেই, স্মৃতিশক্তিও নেই। কিছুদিনের মধ্যেই তারা পুরোনো বুলি ভুলে নতুন বুলি শিখতে শুরু করে।

আজ সকালে রামুর ঘুম ভেঙেছে পাখিটার ডাকে। কাকভোরে পাখিটা হঠাৎ বিকট স্বরে ডাকতে শুরু করে, 'রামু ওঠো, রামু ওঠো, রামু ওঠো। মুখ ধুয়ে নাও। পড়তে বসো।'

রামু তো অবাক। সে ধরে নিয়েছিল, পাখিটা নতুন বুলি কিছুতেই শিখবে না। তাই নিশ্চিন্ত ছিল। একটা পাখি তার ওপর খবরদারি করবে এটা কি সহ্য হয়? কিন্তু আজ সকালে এই অদ্ভুত কাণ্ডে সে হতবাক। পাখিটা যে শুধু ডাকছে তা নয়, বেশ রাগের গলায় ধমকাচ্ছে। যেমনটা তার বাবা উদ্ধববাবু করে থাকেন, হুবহু সেই স্বর। ডাকছেও পাশে বাবার ঘর থেকেই। পাখির দাঁড়টা আজকাল উদ্ধববাবুর ঘরেই ঝোলানো থাকে।

শীতের ভোরে এখনও চারিদিক বেশ অন্ধকার। তার ওপর হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। এই শীতে লেপের ওম থেকে বেরোবার সময় মনে হয় কেউ বুঝি গা থেকে চামড়াটা টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে।

রামু হয়তো পাখির ডাককে উপেক্ষা করে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকত। কিন্তু পাখিটার বিকট চ্যাঁচামেচিতে উদ্ধববাবুরও ঘুম ভেঙেছে। তিনিও উঠে গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, 'এই রেমো! ওঠ!'

রামু মনে মনে রাগ চেপে রেখে ওঠে এবং শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মেজে পাথুরে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নেয়। তারপর ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করার নিয়ম।

একটা খদ্দরের চাদর মুড়ি দিয়ে সে যখন পড়ার ঘরে এল তখন উদ্ধববাবু প্রাঃতভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন। রামু বাবার ঘরে ঢুকে কটমট করে পাখিটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুই ভেবেছিসটা কী শুনি!'

পাখিটা দাঁড়ের একদিকে সরে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে বলে, 'বিশু! আমাকে মেরো না বিশু! আমি বুড়ো মানুষ। মরার সময় সব মোহর তোমাকে দিয়ে যাব।'

রামু রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'আমার মোহরের দরকার নেই। তুই চ্যাঁচানি বন্ধ করবি কি না বল।'

পাখিটা হঠাৎ ডানা ঝাপটে, পায়ের শিকলের শব্দ করে ঠিক উদ্ধববাবুর মতো একটু কাশে। তারপর গম্ভীর গলায় বলে, 'পড়তে বসো। পড়তে বসো। সময় নষ্ট কোরো না।'

পাখিটা পুরোনো বুলি সব ভুলে যায়নি এখনও। নতুন বুলি শিখেছে। তবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই পাখিটা নতুন বুলিই বলতে থাকবে ক্রমাগত। রামুর তখন ভারি বিপদ হবে। সুতরাং পাখিটাকে না ভাগানো পর্যন্ত রামুর শান্তি নেই।

কাকাতুয়া যে সব নিরীহ প্রাণী নয় তা রামু বুঝল শিকলটা খুলতে গিয়ে। যেই না দাঁড়ে হাত দিয়েছে, অমনি পাখিটা খচ করে ঠুকরে দিল হাতে। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের পিছন দিকটা কেটে গেল একটু।

কাটাকুটিকে অবশ্য রামু ভয় পায় না। প্রতিদিনই তার হাত কাটছে, মাথা ফাটছে, পা মচকাচ্ছে। ওসব গা-সওয়া। সে বাইরে গিয়ে একটু দুব্বোঘাস তুলে হাতে ডলে নিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়।

যারা লেখাপড়ায় ভালো হয় না তারা হয়তো-বা খেলাধুলো, গানবাজনা, ছবি আঁকা বা অন্য কোনোদিকে ভালো হয়। রামুর ভাই-বোনরা লেখাপড়ায় সবাই ভালো। বোনরা ভালো গায়, বড়দা দারুণ তবলা বাজায়, ছোড়দা দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান। রামু কোনোটাতেই ভালো নয়। ক্লাসে টেনেটুনে পাশ করে যায়। বার্ষিক স্পোর্টসে বড়োজোর হাইজাম্প বা দৌড়ে একটা বা দুটো থার্ড প্রাইজ পায়। গান জানে না, ছবি আঁকতে পারে না। কিন্তু শরীরের সেই অদ্ভুত কাতুকুতুটার জ্বালায় সে সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব দুষ্টুমি করে বেড়ায়। দুষ্টু ছেলেরা সাধারণত মায়ের আদর একটু বেশিই পায়। কিন্তু রামুর কপালটা সেদিক দিয়েও খারাপ। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তার আদরই বাড়িতে সবচেয়ে কম। আসল কথা হচ্ছে তার দিকে কারও তেমন নজর নেই। রামু বলে একটা ছেলে এ বাড়িতে থাকে মাত্র। যেমন নয়নকাজল থাকে, যেমন মাঝে মাঝে গবা পাগলা থাকে। রামুর সন্দেহ হয়, সে নিরুদ্দেশ হলে এ-বাড়ির লোকে ঘটনাটা লক্ষ করবে কি না।

বাইরের সিঁড়িতে বসে রামু আজ সকালে এইসব ভাবছিল। তার জীবনে শান্তি নেই।

রোদ উঠল। দাদা-দিদিরা পড়ার ঘরে পড়তে বসল। আর যুধিষ্ঠির মাস্টারমশাইও দেখা দিলেন।

যুধিষ্ঠিরবাবুকে রামুর বড়ো ভালো লাগে। ভারি অমায়িক মানুষ। কথায় কথায় মারধর নেই, ধমক-ধামক নেই। মিষ্টি হেসে নরম সুরে বোঝান, না পারলে রাগ করেন না। আজও রামুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুখখানা ভার দেখছি যে। বকুনি খেয়েছ নাকি?'

'আজ কিছু ভালো লাগছে না মাস্টারমশাই।'

'সকাল বেলায় কিছু ভালো না লাগলে সারা দিনটাই খারাপ যায়। সকালটাই তো মানুষের সবচেয়ে সুন্দর সময়।'

যুধিষ্ঠিরবাবুর পরনে ধপধপে ধুতি। গরম কাপড়ের নস্যি রঙের পাঞ্জাবির ওপর শাল। তাঁর চেহারাখানাও বেশ লম্বা-চওড়া। বয়স বেশি নয়। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার আর তীক্ষ্ণ। অগাধ জ্ঞান। রামু শুনেছে যুধিষ্ঠিরবাবু খুব বড়োলোকের ছেলে। বাবার সঙ্গে রাগারাগি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নইলে তাঁর যা অবস্থা তাতে রোজগার না করলেও চলে।

রামু গম্ভীর হয়ে বলে, 'আজ যদি না পড়ি তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?'

'না না। রোজ কি পড়তে ভালো লাগে?'

'কিন্তু বাবা তো বকবে।'

'না, তাও বকবেন না। চলো, তোমার দাদা আর দিদিদের পড়া দিয়ে তোমার সঙ্গে বসে আমি কাটাকুটি খেলব।'

'সত্যি খেলবেন?'

'কেন খেলব না? চলো।'

বাস্তবিকই যুধিষ্ঠির মাস্টারমশাই আর সকলকে শক্ত শক্ত টাস্ক করতে দিয়ে একটা রাফ খাতা খুলে রামুর সঙ্গে কাটাকুটি খেলতে লাগলেন। কিন্তু কাটাকুটিও উনি এত ভালো খেলেন যে, রামু বারবার হেরে যেতে লাগল।

যুধিষ্ঠিরবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার হাত কাটল কী করে?'

'আমাদের পাখিটা কামড়ে দিয়েছে।'

'সেই কাকাতুয়াটা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কী করেছিলে?'

'ছেড়ে দিচ্ছিলাম।'

'পাখিটাকে?'

'হাঁ। আমাকে বড্ড জ্বালাতন করে।'

যুধিষ্ঠিরবাবু একটু চমকে উঠে বলেন, 'ছেড়ে দিয়েছ?'

'না, শিকলটা খুলতে পারিনি।'

এরপর আর কোনো কথা হল না বটে কিন্তু যুধিষ্ঠিরবাবু বারবার কাটাকুটি খেলায় হেরে যেতে লাগলেন। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কাটাকুটি খেলার ঘটনা এবং পাখিটাকে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টার কথা রামুর দাদা আর দিদিরা বাড়িতে বলে দিল। উদ্ধববাবু কাছারিতে যাওয়ার আগে রামুকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে আনলেন।

গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পাখিটা তোর সঙ্গে কোনো শত্রুতা করেছে?'

রামু ভয়ে কাঠ। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

উদ্ধববাবু তাঁর বেতের ছড়িটা দিয়ে শপাং করে এক ঘা মেরে বললেন, 'দুনিয়ার সবাইকে শত্রু মনে করতে কে তোমাকে শেখাল?'

রামু যন্ত্রণায় ছটফট করে বাঁ-হাতের কবজি চেপে ধরল। বেতটা লেগেছিল সেইখানেই।

'বলো!' আবার শপাং। এবার লাগল কোমরে।

রামু বেঁকে গিয়ে বলল, 'পাখিটা আমাকে ধমকাচ্ছিল।'

'বটে! পাখির ধমকে তোমার এমন অপমান হয়েছে যে, শিকলি কেটে তাকে উড়িয়ে দিতে হবে?'

আবার শপাং। এবার পিঠের চামড়াই বুঝি কেটে গেল রামুর। সে একটা চিৎকার করতে গিয়েও দাঁত চেপে রইল। বাবার সামনে কান্না বারণ। তবে সে চাপা কান্নায় থরথর করে কাঁপছিল। রাগেও।

উদ্ধববাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, 'পাখিটা আমার প্রতিনিধি হয়ে তোমাকে শাসন করবে। কথাটা মনে রেখো। যদি কখনো ফের এরকম কিছু করো তবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব। আর শুনলাম পড়ার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কাটাকুটি খেলছিলে আজ! সত্যি?'

'মাস্টারমশাই নিজেই তো খেললেন।'

'সেক্ষেত্রে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু মাস্টারমশাইরা কোন ধরনের ছাত্রের সঙ্গে কাটাকুটি খেলেন তা জানো? যাদের কিছু হবে না বলে ওঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে যান। তোমারও কিছু হবে না। এখন যাও।'

চোখ মুছতে মুছতে রামু বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

উদ্ধববাবুর কড়া হুকুম আছে কোনো ছেলেকে তিনি যেদিন শাসন করবেন সেদিন সেই ছেলের খাওয়াও বারণ। তাতে নাকি ফল ভালো হয়। সুতরাং রামুকে আজ খালি পেটে ইস্কুল যেতে হল।

ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চে বসে গান্টু কাঁচা কুল খাচ্ছিল নুন দিয়ে। স্যার এখনও আসেননি।

রামু গিয়ে পাশে বসতেই গান্টু চাপা গলায় বলে, 'খুব ধোলাই খেয়েছিস তো!'

রামু আবার চোখের জল মোছে।

'দূর আমি তো কত মার খেয়েছি। কাকা এখনও মারে। তবে এখন আর লাগে না।'

রামু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'শোন গান্টু, আমি ঠিক করেছি সার্কাসের দলে নাম লেখাব।'

'সার্কাস!'

'আমার লেখাপড়া হবে না। কিছু হবে না।'

'সার্কাসে গেলে নেবে কেন? ঝাঁট দেওয়ার কাজ করবি?'

'না। খেলা দেখাব।'

'পারবি?'

'শিখব।'

১০

অনেক ভেবেচিন্তে গান্টু বলল 'আমি সার্কাসে যাব না। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে চাকরি নিয়ে দুনিয়া ঘুরে বেড়াব।'

রামু বলে, 'জাহাজে চাকরি পাওয়া অত সোজা নয়। তোকে নেবে কেন? তুই সাঁতার জানিস?'

'শিখে নেব। তোকে সার্কাসে নিলে আমাকেও জাহাজে নেবে।'

'তাহলে পালাবি?'

'পালাব। কিন্তু গাড়িভাড়ার কী হবে? রাস্তায় খাব কী?'

'সে হয়ে যাবে। আমি তো সার্কাসের দলের সঙ্গে যাচ্ছি আমাকে ওরাই খেতে-টেতে দেবে।'

'আমি যদি তোর সঙ্গে থাকি তো আমাকেও নেবে?'

'সেটা এখুনি বলতে পারছি না। কথা বলতে হবে।'

ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে গান্টুর সঙ্গে নানারকম পরামর্শ করে রামু বাসায় ফিরল। সারাদিন খাওয়া নেই। টিফিনে গান্টু একটু চীনেবাদামের ভাগ দিয়েছিল মাত্র। তাতে খিদেটা আরও চাগিয়ে উঠেছে। পেটের আগুনটা রাগের হলকা হয়ে মাথায় উঠে আসছে। বই-টই রেখে রামু নিঃসাড়ে গিয়ে বাগানে ঢুকল। বাগানের এক কোণে একটা কুলগাছ আছে। তাতে মস্ত মস্ত টোপাকুল খেয়ে খিদেটা চাপা দেবে।

কিন্তু গিয়ে দেখে, কুন্দ দারোগার দুই ছেলে আন্দামান আর নিকোবর চুরি করে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকে গাছে উঠে কুল সব সাফ করছে। একজনের হাতে আবার একটা বাঁশের চ্যাঙাড়ি। সেটা টোপাকুলে টপটপে ভরতি।

রামু হাঁক মারল, 'অ্যাই! আমাদের গাছে উঠে কুল পাড়ছিস যে বড়ো!'

কুন্দকুসুমের শাসন বড্ড কড়া। কুল চুরির কথা জানাজানি হলে আস্ত রাখবেন না। ভয়ের ব্যাপার আরও আছে। রামুর ঢিল ছোড়ার হাত দারুণ পাকা। এখন নীচ থেকে সে যদি ঢিল ছুড়তে শুরু করে তবে গাছের ওপর দুই ভাইয়ের বড়োই বিপদ। রামুর ঢিল বড়ো একটা ফসকায় না। তাই দুই ভাই ওপর থেকে কাকুতিমিনতি করতে লাগল, 'বলিস

না, ভাই বলিস না। অন্যায় হয়ে গেছে। তোকে অর্ধেক দিচ্ছি। পায়ে পড়ছি, ঢিল মারিস না।'

খিদে-পেটে রামুর গাছে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তা ছাড়া এ-বাড়ির ওপর এখন এমন রাগ যে, এই বাড়ির কোনো ক্ষতি হলে তার কিছু যায় আসে না। সে গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, নেমে আয়।'

আন্দামান আর নিকোবর পকেটে করে কাগজের পুরিয়ায় অনেকটা ঝাল নুন এনেছে। তাই দিয়ে গাছতলায় তিন জনে কুলের ভোজে বসে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে তিন জন কুল খেয়ে গেল। পাকা, আধপাকা, ডাঁসা কুল আর দুর্দান্ত ঝাল নুন খেতে খেতে চকাস-টকাস শব্দ আর ঝালের শোঁসানি শোনা যাচ্ছিল কেবল। তারপর নিকোবর বলল, 'তুই নাকি সার্কাসের দলে ভিড়ছিস?'

রামু কথাটা আর কাউকে বলেনি, গান্টু ছাড়া। তাই চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে বলেছে?'

'গান্টু। স্কুল থেকে ফেরার পথে বলল, রামু সার্কাসের দলে চলে যাচ্ছে।'

আন্দামান মুখ থেকে একটা কুলের বিচি ফুড়ুক করে ফেলে বলল, 'ওই সার্কাসে একটা সাংঘাতিক খুনি লোক আছে। দিনে-দুপুরে মানুষ খুন করে।'

রামু বলে, 'কে বল তো!'

'যে লোকটা আজকাল সাপের খেলা দেখায়। মাস্টার লখিন্দর।'

'লোকটা খুনি কী করে জানলি?'

'বাবা গতকাল ফন্তুবাবুকে বলছিল, আমি আড়াল থেকে শুনেছি।'

'ফন্তুবাবুটা কে?'

'পুলিশের ইনফর্মার।'

'কী বলছিল?'

'বলছিল লখিন্দরের নাম নাকি আসলে লখিন্দর নয়। এ হচ্ছে মাস্টার গোবিন্দ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই বলে একটা লোককে খুন করে জেলে যায়। তার ফাঁসির হুকুমও হয়েছিল। কিন্তু লোকটা জেল থেকে পালিয়ে এসেছে।'

'তবে তোর বাবা তাকে ধরছে না কেন?'

'ধরা যাচ্ছে না। লোকটা মুখোশ পরে থাকে তো। আসল চেহারাটা কেউ দেখেনি। সার্কাসওয়ালারা অন্য একটা লোককে দেখিয়ে বলছে, এই হচ্ছে মাস্টার লখিন্দর।'

'তাহলে তোর বাবা এখন কী করবে?'

'কিছু করবে না। শুধু ওয়াচ করা হবে। মাস্টার গোবিন্দর সব খোঁজখবর চেয়ে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ফোর্সও আসছে। শহরটা ঘিরে ফেলা হবে। এখন ইনফর্মার আর সেপাইরা চারদিকে নজর রাখছে। গতকাল থেকে সার্কাসে সাপের খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। বিরাট নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে-মাস্টার লখিন্দর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। সাপের খেলা বন্ধ রইল। সব প্ল্যান করা।'

আর কয়েকটা কুল খেয়ে রামু উঠে পড়ল। আন্দামান আর নিকোবর তাকে অর্ধেক কুলের ভাগ দিতে চাইলে রামু ঠোঁট উলটে বলল, 'তোরা নিগে যা।'

সন্ধে বেলা গবা পাগলার ঘরে গিয়ে তাকে ধরল রামু, 'গবাদা! শুনেছ হবিবগঞ্জের সার্কাসের সেই সাপ-খেলোয়াড় লখিন্দর নাকি আসলে খুনি?'

অন্যমনস্ক গবা বলল, 'হ্যাঁ, খুব গুণী।'

'গুণী নয় গো, সে নাকি খুনি।'

গবা অবাক হয়ে বলে, 'তোমাকে কে বলল?'

'আন্দামান আর নিকোবর। কুন্দ দারোগার যমজ ছেলেরা।'

'বটে!' বলে গবা আঙুল দিয়ে তার দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, 'খুন একটা হয়েছিল বটে। সেই কাশিমের চরে। গেলবারের আগের বারে শীতকালে। জায়গাটা এখান থেকে খুব দূরেও নয়। বিশ-পঁচিশ ক্রোশ হবে। খুব জ্যোৎস্না ছিল সেই রাতে।

'তুমি সেখানে ছিলে?'

'খানিকটা ছিলাম বই কী। কাশিমের চরেই যে সেই রাতে তেনাদের নামবার কথা।'

'কাদের?'

'আলফা সেনটরি হল সৌরলোকের সবচেয়ে কাছাকাছি নক্ষত্র। দূরত্ব হবে চার আলোবছর। সেখানকার একটা উন্নত গ্রহের সঙ্গে আমার অনেকদিনের যোগাযোগ। বহুকাল খবর-বার্তা দিইনি বলে চিন্তা করছিল তারা। আমাকে একদিন একটা ভাবসংকেত পাঠাল। যন্ত্রপাতি দিয়ে নয়, স্রেফ জোরালো মানসিক প্রক্রিয়ায়। জানান দিল, দিন-দুইয়ের মধ্যেই তারা এক পূর্ণিমার রাতে কাশিমের চরে নামবে। আমি যেন সেখানে হাজির থাকি।'

'গুল মারছ গবাদা!'

'গবা তো কেবল গুলই মারে। আর বলব না, যাও।'

'আচ্ছা আচ্ছা, গুল নয়। বলো।'

'শেষ পর্যন্ত অবশ্য সময়মতো তারা আসতে পারেনি। পরে শুনলাম ওদের মহাকাশযানের একটা মাস্তুল নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'মাস্তুল তো নৌকোয় থাকে।'

'আরে বাবা এ কি আর সাধারণ মাস্তুল! এই মাস্তুল হল আসলে একটা সুপারসেনসিটিভ স্ক্যানার।'

'যাকগে, তারপর কী হল?'

'সে এক কাণ্ড। আমি তো কাশিমের চরে জ্যোৎস্নায় একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমে ঢুলে পড়েছি। কখন তেনারা আসবেন। কাশিমের চর জায়গাটা বড়ো ভালো নয়। একধারে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে নদী। শীতকাল বলে জল প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। দু-ধার দিয়ে তিরতির করে নালার মতো দুটো স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে মস্ত চর। তা সেই চরেও আবার কাশফুলের ঘন ঝোপ সব। মাঝখানে অবশ্য অনেকটা জায়গা ফাঁকা। সন্ধের পরই সোনার থালার মতো চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় একেবারে মাখামাখি। আর যা শীত পড়েছিল সেবার তা আর বলার নয়।'

'ঃউ, প্রকৃতি-বর্ণনা রেখে আসল গল্পটা বলবে তো!'

'তোমার বাপু বড্ড ধৈর্য কম। গল্পের আসল প্রাণই তো ওই প্রকৃতি আর পরিবেশের ওপর। ওটা না হলে গল্পটা বড়ো ন্যাড়া ন্যাড়া হয়ে যায় যে। সত্যি বলে মনে হয় না।'

'তারপর কী হল?'

'সে এক কাণ্ড। আমি তো সেই শীতে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে ঠান্ডা মেরে বসে আছি। চারদিকে বেশ কুয়াশা। কুয়াশার মধ্যে জ্যোৎস্নার একটা আলাদা রূপ আছে। গোটা জায়গাটাকে মনে হচ্ছিল পরির রাজ্য। দেখতে দেখতে রাত বেড়ে উঠল। ঘুমে ঢুলে পড়ছি। এমন সময় মনে হল একটা লোক যেন দূর থেকে দৌড়ে আসছে। বালির ওপর তো পায়ের শব্দ হয় না। কিন্তু আমি সেই মহাকাশের লোকগুলোর ভাবসংকেত পাওয়ার জন্য মনটাকে এমন চনমনে রেখেছিলাম যে, ছুঁচ পড়লেও শব্দ শুনতে পাব।'

'তবে এই যে বললে ঘুমে ঢুলে পড়ছিলে!'

'তা বটে। তবে কিনা সে-ঘুমও ভাবের ঘুম। চোখ বোজা থাকে বটে, কিন্তু কান, গায়ের চামড়া, নাক, চারদিকের খবর পায়।'

'লোকটা দৌড়ে কোথায় গেল?'

'গেল না। লোকটা আসছিল। আমি চোখ চেয়ে কুয়াশায় কাউকে দেখতে পেলাম না। তবে কয়েক সেকেন্ড পরেই আরও চার-পাঁচজনের দৌড়ে আসার আওয়াজ পেলাম।

তারপর বুঝলাম প্রথম লোকটা পালাচ্ছে, পরের লোকেরা তাকে তাড়া করছে। প্রথম পায়ের শব্দটা ঝোপের আড়ালে-আবডালে বেড়ালের মতো চুপিচুপি ঘুরে বেড়াচ্ছে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্য লোকগুলো তাকে খুঁজছে।'

'তুমি কী করলে?'

'আমি একটা হাই তুললাম তখন।'

'মাত্রই হাই তুললে?'

'না, দুটো তুড়িও দিয়েছিলাম মনে আছে।'

'ধুস, তারপর কী হল!'

'ঃও, সে এক কাণ্ড।'

১১

বিরক্ত হয়ে রামু বলে, 'ঃআ, বলোই না!'

'ভাবলে আজও গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়। দেখো না, আমার গা দেখো!' বলে গবা হাতে দাঁড়ানো রোঁয়া দেখাল রামুকে। তারপর বলল, 'কুয়াশা আর জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝোপেঝাড়ে সেই লুকোচুরি খেলা চলছে, আর আমি বসে আছি। ব্যাপারটা কী তা বুঝতে পারছি না। একবার হঠাৎ একটা শেয়াল এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফ মেরে সাঁ করে ছুটে পালাল।'

'তারপর?'

তারপর সেই ঝোপের আড়াল থেকে ধুতি পরা একটা লোক র্যাপারে মুখ ঢেকে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে এসে অবিকল শেয়ালের মতোই দৌড়ে পালাচ্ছিল। তার চেহারাটা বিশাল। ছ-ফুটের ওপরে লম্বা, ইয়া কাঁধ, ইয়া বুকের ছাতি। সেই ঝুমকো আলোয় মুখঢাকা লোকটাকেও কিন্তু আমি চোখের পলকে চিনে ফেললাম।'

'লোকটা কে?'

'সেই লোকটাই পাড়ুই। ওরকম লোক আমি জন্মে দুটো দেখিনি। হরিহর পাড়ুই না-পারে এমন কোনো খারাপ কাজ নেই। লোকের ছেলে-মেয়ে চুরি করে আড়কাঠিদের কাছে বেচে দিত, নয়তো মা-বাপের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। ডাকাতি করত। চুরি করত। আর খুন করা ছিল তার জলভাত। ওই তল্লাটে তার দাপটে সবাই কাঁপত।'

'লোকটা কী করল?'

'লোকটা তখন পালাচ্ছিল। খুব অদ্ভুত দৃশ্য। হরিহর পাড়ুইকে পালাতে দেখাটাও ভাগ্যের ব্যাপার। কারণ সাধারণত তাকে দেখেই অন্যেরা পালায়। তাই তাকে পালাতে দেখে ভারি অবাক লাগল। কাশিমের চরে এমনিতে ঘরবাড়ি নেই, তবে বহুকাল আগেকার একটা ভাঙা বাড়ি আছে। সাপখোপ শেয়াল তক্ষক বাদুড় আর প্যাঁচার আড্ডা। চোর-ডাকাতেও বড়ো একটা কেউ সেই বাড়িতে ঢোকে না। আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে একটু ডাইনে কোনাকুনি একটা ঝাউবন। তার আড়াল থেকে সেই ভাঙা বাড়িটার একটা গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল। নিকষ্যি অন্ধকার। হরিহর পাড়ুই কোলকুঁজো হয়ে সেই ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে বাড়িটার দিকে যাচ্ছে বলে মনে হল। এমন সময়ে দেখি, গম্বুজে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। কে যেন উঁচু থেকে একটা টর্চবাতি জ্বালছে আর নেভাচ্ছে। আমার মনে হল, ব্যাপারটা একটু দেখা দরকার।'

'তোমার ভয় করল না?'

'না, ভয়ের কী? দুনিয়াটাই তো নানা খারাপ জিনিসে ভরা। ভয় পেতে শুরু করলে তার আর শেষ নেই।'

'তুমি কী করলে?'

'উঠে হরিহরের পিছু পিছু এগোতে লাগলাম। সেটাও দুঃসাহসের কাজ। হরিহর যদি টের পায় তাহলে চোখের পলকে আমার ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দেবে কসাই-ছুরি দিয়ে। তার কাছে সব সময় অস্ত্রশস্ত্র থাকে। স্বভাবটাও কেমন পাগলা খুনির। তাই খুব ঠাহর করে দেখে-শুনে সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। কিন্তু ঝাউবনের মধ্যে আলো আঁধারিতে আর তাকে দেখতে পেলাম না। গম্বুজের আলোটাও আর জ্বলছে না তখন।'

রামু চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'তখন কী করলে?'

'কিছু করার নেই। চারদিকে ঠাহর করছি। লোকটা তো আর নেই হয়ে যেতে পারে না। ঝাউবনে প্রথম দিকটায় বেশ পরিষ্কার। ঝোপজঙ্গল তেমন নেই। কিন্তু ভিতর দিকটায় মেলা আগাছা হয়েছে। লুকিয়ে থাকার পক্ষে তোফা জায়গা। আমি একটা কাঁটাঝোপের কাছাকাছি ঘাপটি মেরে বসে চারদিকে দেখছি, এমন সময়-'

'এমন সময়? ঃউ, বলো না!'

'বলছি দাঁড়াও। হাঁ করতেই গলায় একটা মশা চলে গেল যে!' খক খক করে কেশে গলা সাফ করে গবা বলে, 'বেশ নিঝুম। আলোর চিকড়িমিকড়ি। শীত। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা লম্বা হাত কোত্থেকে বেরিয়ে এসে ঘপাত করে আমার ঘাড়টা ধরল।'

'বলো কী?'

'ওরে বাবা, সে-কথা ভাবতে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। এই দেখো ফের গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'

'তারপর কী হল?'

'আমি তো কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। আর হাতটাও পেল্লায়। এই মোটা মোটা আঙুল, কুলোর মতো মস্ত পাঞ্জা। সেই হাতে একটু বেকায়দা বেশি চাপ পড়লে আমাদের মতো সাধারণ ঘাড় মট করে ভেঙে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, হাতটা আমার ঘাড় ধরল কিন্তু তেমন আঁট করে ধরল না। বরং মনে হচ্ছিল, মস্ত হাতটা আমার কাঁধে বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু আমি সেই ভারেই তখন কুঁই কুঁই করছি। টের পেলাম হাতটা সামনের কাঁটাঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরেছে। হাতটা মানুষের না অন্য কিছুর তা তখনও বুঝতে পারছি না।'

'মানুষ নয়?'

'তখন তা বুঝবার মতো মনের অবস্থা নয়। তবে হঠাৎ ঝোপের ভিতর থেকে একটা খসখসে শ্বাস টানার শব্দ পেলাম। আমি তখন ভয়ে একেবারে পাথর। হঠাৎ সেই পেল্লায় হাত আমার ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, আস্তে আস্তে ঝোপটার মধ্যে টেনে নিতে লাগল। সাংঘাতিক কাঁটাঝোঁপে আমার গাল নাক কান ছড়ে যাচ্ছে, চোখেও কাঁটা ঢুকে যেতে পারে। আমি দু-হাত দিয়ে চোখটা আড়াল করলাম। তারপর ডালপালা সমেত মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে। দেখি কী, কাঁটাঝোপের মধ্যে একটা লোক শুয়ে আছে। চারদিক রক্তে ভেজা।'

'ঃও বাবা!'

'বাবা বলে বাবা! আমি তো তখন বাবা ছেড়ে ঠাকুরদাকে ডাকতে লেগেছি।'

'হল কী বলো না!'

'তেমন কিছু নয়। লোকটার তখন প্রায় হয়ে গেছে। বুকে মস্ত ক্ষত। তা থেকে বগবগ করে রক্ত পড়ছে। লোকটার গলায় ঘড়ঘড়ানি উঠে গেছে। লোকটা কোনোক্রমে বলল, পাখি জানে। পাখি সব জানে। এইটুকু বলেই লোকটা ঢলে পড়ল।'

'লোকটা কে?'

'আর কে? সেই হরিহর পাড়ুই। তখনও মরেনি, কিন্তু মরছে। কিন্তু আমার অবস্থা তখন সাংঘাতিক। মরার সময় কী করে জানি না পাড়ুইয়ের হাতটা আমার ঘাড়কে শক্ত করে ধরল। কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। ওদিকে কাছাকাছি অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কারা যেন এগিয়ে আসছে। চারদিকে টর্চের বাতি ঝলসাচ্ছে ফটাফট। যারাই হোক,

তারা লোক ভালো নয়। আমার পালানো দরকার। কিন্তু হরিহরের হাতখানা আমাকে অষ্টপাশে বেঁধে ফেলেছে। কার সাধ্য ছাড়ায়! তার ওপর আঙুলগুলো ক্রমে বেঁকে গলায় গজালের মতো ঢুকে যাচ্ছে। মরন্ত মানুষের গায়ে যে অত শক্তি হয় কে জানত বলো।'

'তারপর কী হল? তাড়াতাড়ি বলো।'

'ওদিকে সেই বদমাশগুলোও তেড়ে আসছে। চারদিকে টর্চের আলো ঝলসাচ্ছে। একটা লোক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, সাতনা, ঠিকমতো বল্লম চালিয়েছিলি তো! অন্য একজন রাশভারী গলায় বলল, আমার বল্লম এদিক-ওদিক হয় না। ঝাউবনে ঢুকবার মুখেই লোকটাকে গেঁথেছি। তবে দানোটার গায়ে খুব জোর। বল্লমটা ধাঁ করে টেনে খুলেই দৌড়ে পালাল। কিন্তু মনে হয় না বেশি দূর যেতে পারবে। চারদিকে রক্তের ছড়া দেখছ না!'

'তখন তুমি কী করলে?'

'আমি? আমি তখন কিছু করাকরির বাইরে। হরিহরের কব্জায় আমার পুঁটিমাছের পরান ধড়ফড় করছে। আস্তে আস্তে চেতন ভাবটা চলে যাচ্ছে। শ্বাস প্রায় বন্ধ। ঠিক এই সময়ে লোকগুলো 'ওই যে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই সবাই এসে ঘিরে ধরল আমাদের।'

'তুমি বেঁচে গেলে বুঝি!'

'আরে দূর! অত সহজ নাকি? লোকগুলো টর্চ জ্বেলে দৃশ্যটা দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল, এখনও বেঁচে আছে! সর্বনাশ। শেষ করে দে। শেষ করে দে। বলতে বলতে একটা লোক মস্ত দা বের করে প্রথম কোপটায় হরিহরের গলা নামিয়ে দিল।'

'বলো কী? আর তুমি?'

'আর যারা ছিল তারা বলল, এ লোকটা কে রে? আর একজন বলল, যেই হোক, সাক্ষী রেখে লাভ নেই। লোকটা বেঁচে আছে। গলাটা নামিয়ে দে। সঙ্গেসঙ্গে আর একটা লোক ঘচাত করে আমার গলাটাও নামিয়ে দিল।'

'যাঃ, কী যে বলো।'

'যা বলছি শুনে যাও। একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনা, দুনিয়ায় আর কোনো মানুষের এমন অভিজ্ঞতা নেই। স্পষ্ট নিজের কাটামুণ্ডু প্রত্যক্ষ করলাম। বুঝলে! গলা দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত পড়ছে। ধড়টা একটু ছটফট করছে। কিন্তু মুখখানা দিব্যি হাসি হাসি।'

'গুল মারছ গবাদা।'

'সত্যি না। তারপর হল কী শোনো। সে এক কাণ্ড।'

'বলো।'

'ওরা তো আমাদের কবন্ধ করে রেখে পালিয়ে গেল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসলাম। বারবার গলায় হাত বোলাচ্ছি। কিন্তু সেটা তো আমার গলা নয়। শরীরটা তখন বাতাসের মতো হালকা পাতলা জিনিস হয়ে গেছে। দেখি ঝোপের ওপাশ থেকে হরিহর পাড়ুইও উঠে পড়ে চারদিকে কটমট করে চাইছে। তার চাউনি দেখে ভয় খেয়ে পালাতে গিয়ে মনে হল, এখন আর ওকে ভয় কী? আমিও একটু ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। হরিহর আমাকে পছন্দ করছিল না। কাছে যেতেই একটা হুংকার দিল, খবরদার! আমি খিক করে হেসে বললাম, তোমার আর সেই দিন নেই হে হরিহর। মাথা গরম কোরো না বাবা। তার চেয়ে চলো চাঁদের আলোয় চরে বেড়াতে বেড়াতে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কই। হরিহর প্রথমটায় একটু গোঁ ধরে বসে ছিল। তারপর যখন সত্যিই বুঝল যে, সে মরে গেছে, তখন আমার সঙ্গে মিশতে আপত্তি করল না তেমন।'

'মরে গিয়ে তুমি ফের বেঁচে উঠলে কী করে?'

'সে তো আর এক গল্প। আলফা সেনটরির গ্রহ থেকে যাদের আসবার কথা ছিল, তারা ভোররাত্রে এসে আমার দশা দেখে চটপট মাথাটা জুড়ে দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলল যে।'

'যত সব গুল। কিন্তু পাখি কী জানে তা তো বললে না?'

'হ্যাঁ। সেইটেই তো আসল গল্প। আর একদিন হবেখন।'

১২

রামু সঙ্গেসঙ্গে গবার হাত ধরে বলল, 'না, না, বলো। বলতেই হবে।'

গবা মাথা চুলকে বলে, 'আসলে কী জান, বেশ কিছুদিন আগেকার কথা কিনা, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তার ওপর আমার মাথাটা কাটা গিয়েছিল তো, তাতেও বুদ্ধি একটু ঘুলিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় কাশিমের চরে হরিহরের প্রেতাত্মার সঙ্গে আমার যে-সব কথা হয়েছিল তার মধ্যে পাখির কথাটা আসেনি। মনে আছে আমরা সেই গলা কাটনেওলা লোকগুলোর আক্কেল নিয়ে কথা বলছিলাম। হরিহর একবার ভুল করে একটা মশা মারতে গিয়েছিল তাও মনে আছে। হাওয়ার হাত দিয়ে কি আর মশা মারা যায়? দু-জনে খুব হেসেছিলাম। কী হয় জান, মরলে পর আর পুরোনো শত্রুতা, রাগ, হিংসা এসব থাকে না। বেঁচে থেকে মানুষ যে-কাণ্ডমাণ্ড করে সেগুলোকে ভারি ছেলেমানুষি মনে হয় তখন। বাঁচা অবস্থায় তো আমি হরিহরকে কতই না সমঝে চলছিলাম, মরার পর আবার সেই হরিহরের সঙ্গে চাঁদের আলোয় গলা ধরাধরি করে বালির ওপর কত ঘুরলাম।'

'পাখির কথাটা তুললে না?'

'ওই যে বললাম, বাঁচা অবস্থার কৌতূহলগুলো পর্যন্ত মরার সঙ্গেসঙ্গে মরে যায়।'

'পাখিটা তবে কী জানত?'

'সেটা ভেবে দেখতে হবে!'

'আর হরিহরকে সেদিন খুনই-বা করল কারা? তাদের তুমি চেন?'

'কস্মিনকালে না।'

'মাস্টার গোবিন্দকে তাহলে পুলিশ ধরল কেন?'

'এমনি এমনি ধরেনি। গোবিন্দরও দোষ আছে।'

'কী দোষ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গবা বলে, 'সে আবার আর এক গল্প।'

'তাহলে গল্পটা বলে ফেল।'

'সেটা একদিন গোবিন্দর কাছেই শুনে নিয়ো। আজ মেলা বকবক করে ফেলেছি।'

'গোবিন্দর কাছে কবে আমাকে নিয়ে যাবে?'

'আমি এখন তার কাছেই যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পার। তবে খবরদার, ঘুণাক্ষরেও কাউকে বোলো না যেন। জানাজানি হলেই পুলিশ গোবিন্দকে ধরে নিয়ে গারদে পুরবে।'

শহর ছাড়িয়ে মাইলটাক মেঠোপথে হাঁটলে একটা বেশ সমৃদ্ধ গাঁ। সন্ধের একটু আগে সেই গাঁয়ের এক সম্পন্ন গেরস্তবাড়িতে রামুকে নিয়ে হানা দিল গবা।

গবাকে দেখে বাড়ির সবাই তটস্থ। 'আসুন, আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক।'

নিকোনো উঠোনে জলচৌকি পেতে দেওয়া হল। ঘটির জলে হাতমুখ ধুয়ে এসে রামু আর গবা পাশাপাশি দুটো জলচৌকিতে বসতে-না-বসতেই দুটো ছোটো ধামায় টাটকা ভাজা মুড়ি, বাতাসা, নারকেল আর দুধ খেতে দেওয়া হল তাদের। সারা দিনে রামুর এই প্রথম সত্যিকারের কিছু খাওয়া। সে যখন হালুমহুলুম করে খাচ্ছে তখন গবা খুব মুরুব্বির চালে গেরস্তকে জিজ্ঞেস করল, 'গোরু রাখার জন্য যে বোবা কালা লোকটাকে দিয়েছিলাম সে কেমন কাজ-টাজ করছে?'

'আজ্ঞে কাজ ভালোই করে। খায়ও কম। কিন্তু লোকটা ভারি রাগী।'

'খুব চোটপাট করে বুঝি?'

গেরস্ত একটু অবাক হয়ে বলে, 'বোবা লোক চোটপাট করবে কেমন করে? তা নয়, তবে চোখ দু-খান দিয়ে মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকায় যে, পেটের মধ্যে গুড়গুড়নি উঠে

যায়।'

'তা লোকটা কোথায়?'

'একটু আগে গোরু নিয়ে ফিরল। এখন গোয়ালে সাঁজাল দিচ্ছে। ডাকাচ্ছি।'

গেরস্তর ছেলে গিয়ে রাখালটাকে ডেকে আনল। পরনে আধময়লা হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা মোটা কাপড়ের পিরান, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটির দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, তাকালে বুকের মধ্যে একটু ধুকুরপুকুর হয় বটে।

গবা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস রে!'

লোকটা 'ব ব ওয়াঁ' গোছের কিছু দুর্বোধ শব্দ করল।

গবা মাথা নেড়ে বলে, 'বেশ বেশ বেশ। তুই তো আবার কানেও শুনিস না। তবু বলি, এরা ভালো লোক। এদের কাছে ভালো হয়ে থাকবি। চল, একটু এগিয়ে দিবি আমাদের। আঁধার হয়ে এসেছে, লণ্ঠনটা নিয়ে সঙ্গে আয়।'

শুনে গেরস্তর ছেলেপুলেরা হইহই করে উঠল। 'এখুনি যাবে কি গবাজ্যাঠা! আমরা যে তোমার সেই মেছোভূতের গল্পটার শেষটুকু শুনব বলে কতদিন ধরে হা-পিত্যেশ করছি। সেই যে গো আন্নাপুরের বড়ো ঝিলে সেবার মাছ ধরতে গিয়ে জলে একটা বড়ো কড়াই ভাসতে দেখেছিলে। তারপর সেই ভাসন্ত কড়াইটা যেই কাছে এসেছে অমনি সেটাকে ধরতে গিয়ে হাতে গরম ছ্যাঁকা খেলে! তারপর দেখলে, কড়াইটা জলে ভাসছে বটে কিন্তু তাতে গরম তেল ফুটছে। তারপর কী হল?'

গবা উঠে পড়ে বলল, 'সে আর একদিন হবে। বাবুর বাড়ির ছেলেকে নিয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি না ফিরলে রক্ষে থাকবে না।'

রাখালটা লণ্ঠন আর লাঠি হাতে তাদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে এল। মেঠোপথে পা দিয়েই বোবা রাখাল কথা কয়ে উঠল, 'গবাদা, ওদিকে কী হচ্ছে?'

'ধুন্ধুমার। পুলিশ চারদিকে তোমায় খুঁজছে।'

১৩

একটা শক্ত মামলায় মক্কেলকে জিতিয়ে দিয়েছেন উদ্ধববাবু। বড়োলোক মক্কেল সকালেই বিরাট ভেট নিয়ে হাজির। ফলের ঝুড়ি, মিষ্টির চ্যাঙাড়ি, দইয়ের হাঁড়ি, বারকোশে মস্ত রুইমাছ, ধামাভরতি শীতের সবজি। এলাহি কাণ্ড।

মামলায় জিতে উদ্ধববাবুর মনটা আজ ভালো। অন্য একটা মামলার সওয়ালের ফাঁকে গুনগুন করে ভৈরবী ভেঁজে নিচ্ছিলেন। আদালতে গান গাওয়া নিষিদ্ধ। হাকিমসাহেব

গুনগুনানি শুনে বারবার এধার-ওধার তাকান, কিন্তু কোত্থেকে গানটা আসছে তা বুঝতে পারেন না। বার দুই-তিন হাতুড়ি ঠুকে 'অর্ডার অর্ডার' হাঁক দিলেন। প্রতিবারই উদ্ধববাবু রুমালে মুখ ঢেকে জিব কাটলেন। কিন্তু গান জিনিসটা ভারি অবাধ্য। ভিতরে গানের ফোয়ারা খুলে গেলে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য।

অবশেষে বিপক্ষের উকিল উঠে হাকিমকে বললেন, 'আমাদের লার্নেড ফ্রেন্ড উদ্ধববাবুর স্বভাব অনেকটা কোকিলের মতো। বসন্ত সমাসন্ন দেখে ওঁর কণ্ঠ কুহু কুহু রবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারপর কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, উনিও তেমনি ওঁর গানের ডিম এই আদালতে পেড়ে রেখে যাচ্ছেন।'

এই অদ্ভুত সওয়ালে হাকিম ভ্রূ কোঁচকালেন, লজ্জিত উদ্ধববাবু ঘাড় চুলকোচ্ছেন। আর একবার হাতুড়ি মেরে আদালতকে চুপ করিয়ে উদ্ধববাবুকে বলেন, 'আপনার হিয়ারিংয়ের জন্য আর একটা ডেট নিন। আজ বাড়ি চলে যান।'

হাঁফ ছেড়ে উদ্ধববাবু বেরিয়ে এলেন। বাস্তবিক এতক্ষণ তাঁর হাঁফ ধরে আসছিল, আইঢাই করছিল। পাকা ফোঁড়ার মতো ভিতরে টনটন করছে গান। একটু টুসকি দিলেই বোমার মতো ফেটে পড়বে। সেই টুসকিটা এতক্ষণ দিতে পারছিলেন না।

এজলাসের চৌহদ্দি পার হয়ে রাস্তায় পড়েই গানের ফোঁড়াটায় টুসকি দিলেন উদ্ধববাবু। আর বাস্তবিক সেটা বোমার মতোই ফাটল। হাঁ করে প্রথম তানটা লাগাতেই এত জোর শব্দ হল যে, উদ্ধববাবু নিজেই হকচকিয়ে গেলেন।

শুধু তাই নয়। সেই শব্দে রাস্তার লোকজনও পালাতে লাগল। কাক কা-কা করে উড়ে উড়ে ঘুরতে লাগল। উদ্ধববাবু তাজ্জব হয়ে দেখলেন, তাঁর গানের ফোঁড়াটা বোমার মতো ফেটে চারদিকে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে যেতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তারপর উদ্ধববাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন শব্দটা তাঁর গলা থেকে বেরোয়নি। অমন বোমার মতো আওয়াজ খুব বড়ো ওস্তাদের গলা থেকে বেরোবার কথা নয়। যুক্তি অনুসরণ করলে সন্দেহ থাকে না, বোমার মতো আওয়াজটা একটা বোমারই কাজ। আর সেটা ফেটেছে উদ্ধববাবুর মাত্র হাত দশেকের মধ্যে।

রাস্তার আর পাঁচজনের মতো উদ্ধববাবুও দৌড়োতে লাগলেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সময় নেই। গলায় গানটাও আর ঠেলাঠেলি করছে না।

বাড়িতে এসে নিজের ঘরে শুয়ে চোখ বুজে অনেকক্ষণ হাঁফ ছাড়লেন উদ্ধববাবু। ব্যাপারটা কী হল তা বুঝতে পারছিলেন না। বোমাটা এত কাছাকাছি ফেটেছে যে, সেই

শব্দে তাঁর মাথাটা এখনও ভোম্বল হয়ে আছে। এমনকী শুয়ে শুয়ে কয়েকবার ভৈরবীতে তান লাগানোর চেষ্টাও করলেন উদ্ধববাবু। কিন্তু গলার স্বর ফুটল না।

ভিতরের বারান্দা থেকে কাকাতুয়াটা বলে উঠল, 'দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি। দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।'

উদ্ধববাবু কাকাতুয়ার কথা শুনে উঠে বসলেন। মক্কেল যে অঢেল ভেট দিয়ে গেছে, তা ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েও শেষ হওয়ার কথা নয়। তাই উঠে ভিতরবাড়ি থেকে একটা রসগোল্লার হাঁড়ি এনে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াতে লেগে গেলেন।

কাকাতুয়াটা বেশ চেখেচুখেই খাচ্ছিল। কয়দিনে পাখিটা উদ্ধববাবুকে খুব চিনেছে। খেতে খেতে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উদ্ধববাবুকে দেখছিল। হঠাৎ একটু চাপা গলায় বলল, 'কাউকে বোলো না। কাশিমের চরে অনেক মোহর আছে।'

উদ্ধববাবু হাঁ করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'বলিস কী রে?'

'বিশু জানে না। বিশু জানে না।'

'বিশুটা কে বলবি তো।'

পাখি তখন অন্য কথা বলতে লাগল, 'রামু, তুমি ভীষণ দুষ্টু। পড়তে যাও। নইলে গোল্লা পাবে।' তারপর আবার স্বর পালটে বলে, 'দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।'

চারদিক চেয়ে উদ্ধববাবু পাখির দাঁড়টা বারান্দা থেকে নিজের ঘরে এনে রাখলেন।

উদ্ধববাবু বিস্তর মামলামোকদ্দমা করেছেন। তিনি জানেন, যার কাছে কোনো গোপন খবর থাকে, তার জীবন সর্বদাই বিপদসংকুল। এই পাখিটা নিশ্চিত লুকোনো সম্পদের খবর জানে। এ পর্যন্ত পাখিটার ওপর হামলাও কিছু কম হয়নি। কিন্তু এতকাল কাকাতুয়াটা কাশিমের চরের কথা বলেনি! কেউ যদি কথাটা শুনতে পায়, তবে যেমন করেই হোক হন্যে হয়ে পাখিটাকে হাত করার চেষ্টা করবে। তার জন্য খুন পর্যন্ত করতে পিছপা হবে না।

উদ্ধববাবু আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বিছানায় গা ঢালতেই পিঠের নীচে কী একটা খচমচ করে উঠল। উঠে দেখলেন একটা খাম, তাতে ওঁর নাম লেখা।

খাম খুলতেই একটা চিঠি।

মহাশয়, কাকাতুয়াটা ফেরত পাইবার জন্য যে প্রস্তাব দিয়াছিলাম তাহা আপনি কার্যত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বুঝিতেছি সহজ পথে আপনি পাখিটিকে ফেরত দিবেন না। তাহাতে অবশ্য আমাদের কিছুই না, বিপদ আপনারই। আজ আদালতের বাহিরে যাহা ঘটিল, তাহা একটি নমুনা মাত্র। বোমাটিতে কেবল আওয়াজের মশলা ছিল, ক্ষতিকারক কোনোকিছু

ছিল না। আপনাকে আমাদের সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতেই এই কাজ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর যদি কখনো আমাদের বোমা প্রয়োগ করিতে হয়, তবে এবার তাহার মধ্যে মারাত্মক বস্তু সকলই থাকিবে। মনুষ্যজীবন অতীব মহার্ঘ বিবেচনা করিয়া ভালোয় ভালোয় পাখিটিকে আমাদের হাতে তুলিয়া দিবেন। বেশি কিছু করিতে হইবে না। আপনাদের বাহিরের বারান্দায় আজ রাতে পাখির দাঁড়টা (পাখি সমেত) ঝুলাইয়া রাখিবেন। কোনো পাহারা রাখিবেন না। আমরা যথাসময়ে তাহা হস্তগত করিব। ক্ষতিপূরণ বাবদ যথেষ্ট অর্থও আপনি পাইবেন। ইতি।

এর আগের চিঠিতে 'আমি আমি' করে লেখা ছিল। এই চিঠিতে বহুবচনে 'আমরা'।

উদ্ধববাবু চার দিকে চেয়ে দেখলেন শোয়ার ঘরের তিন দিকেই বড়ো বড়ো জানলা। দক্ষিণ দিকে বাগান, পূর্ব দিকেও বাগান, উত্তরদিকে কলতলা। পত্রবাহক কোন দিক দিয়ে এসে টুক করে এই অল্প সময়ের মধ্যে জানলা গলিয়ে চিঠিটা বিছানায় ফেলে গেছে, তা অনুমান করা শক্ত। তবে এরা যে বেশ সংগঠিত দল তাতে সন্দেহ নেই।

উদ্ধববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'হুঁ।'

পাখিটাও তার হুঁ শিখে গেছে। সেও বলল, 'হুঁ।'

উদ্ধববাবু কাকাতুয়ার দিকে চেয়ে দেখলেন পাখিটাও তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। বড়ো মায়া পড়ে গেছে উদ্ধববাবুর। উঠে গিয়ে কাকাতুয়ার পালকে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কেন যে বাবা গোপন কথাগুলো শিখতে গেলি। এখন তোরও বিপদ, আমারও বিপদ।'

পাখিটা হঠাৎ আর্তস্বরে বলে উঠল, 'বিশু, আমাকে মেরো না! মেরো না!'

উদ্ধববাবু চমকে চারদিকে চেয়ে দেখলেন, না, কেউ কোথাও নেই। পাখিটা পুরোনো মুখস্থ বুলিটা বলছে।

আলমারি খুলে উদ্ধববাবু তাঁর বাবার আমলের দোনলা বন্দুকটা বের করলেন। বহুকাল কেউ বন্দুকটা চালায়নি। উদ্ধববাবু বন্দুকটা পরিষ্কার করতে বসে গেলেন।

ভয়ের চেয়ে ভালোবাসা অনেক বড়ো। উদ্ধববাবু ভয়ের কাছে হার মানতে রাজি নন।

১৪

এমনিতে দেখতে গেলে মাস্টার গোবিন্দ বেশ সুখেই আছে। সারাটা দিন গোরু চরায়, গেরস্ত বাড়ির অজস্র কাজ মুখ বুজে করে, পেট ভরে খায় আর সন্ধের পর খড়ের গাদায় ঢুকে ঘুমোয়। বোবা কালা হয়ে থাকতে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেটা সইয়ে নিচ্ছে।

মাঝে মাঝে বেমক্কা মুখ ফুটে এক-আধটা শব্দ বেরিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু ততটা ক্ষতি কিছু হয়নি।

সেদিন গেরস্তর ছেলের বউ এক গামলা ফুটন্ত ভাতের ফ্যান উঠোনের কোনে রেখে খার কাচতে গেছে, এমন সময় গেরস্তর ছোট্ট নাতি হামা টানতে টানতে গিয়ে সেই গামলার কানা ধরে উঠতে গিয়েছে। গোবিন্দ গোরুগুলোকে মাঠ থেকে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল দুপুর বেলা। এই দৃশ্য দেখে বেখেয়ালে 'ইশ, গেল, ছেলেটা গেল' বলে চেঁচিয়ে দৌড়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। ভাগ্যিস কেউ শোনেনি।

আর একদিন গেরস্তর মেজো ছেলে সকালে তাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে এসেছিল। তখন একেবারে কাকভোর। আগের রাত্রে যাত্রা শুনেছে বলে ঘুমটা ভোরে খুব গাঢ় হয়েছিল গোবিন্দর। ছেলেটার ডাকাডাকিতে উঠে বসে বলে ফেলেছিল, 'দুত্তোর, এমন ষাঁড়ের মতো কেন চ্যাঁচায় লোকে!' ছেলেটা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, 'এ কী! তুমি যে বড়ো কথা বলতে পার।' গোবিন্দ ফ্যাসাদে পড়ে অনেকক্ষণ বু-বু করল বটে, কিন্তু ছেলেটার যেন প্রত্যয় হল না। পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তখন ছেলেটাকে কিছু কিছু কথা খুলে বলল গোবিন্দ। রাজি করাল যাতে কাউকে না বলে।

বেশ কাটছিল। কিন্তু একদিন সকাল বেলা গোবিন্দ দেখল, একটা রোগা শুঁটকো মতো লোক গেরস্তর সঙ্গে উঠোনে বসে কথা বলছে। লোকটার চাউনি-টাউনিগুলো ভালো নয়। কথা বলতে বলতে চারদিকে নজর রাখছে। বোঝা যায় কিছু বা কাউকে খুঁজছে।

লোকটা চলে যাওয়ার পর গোবিন্দ গেরস্তর মেজো ছেলেকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'যে লোকটা এসেছিল, সে কে বলো তো!'

'ও হল ফন্তুবাবু।'

'সে আবার কে?'

'দালালি-ফালালি করে। জমি বেচাকেনার কারবার আছে।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু তো জানি না।'

'মানুষটা কেমন?'

'তা কে জানে! তবে বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসে।'

'আজ কেন এসেছিল একটু খোঁজ নেবে? যাও, তোমার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো।'

ছেলেটা একটু বাদে ঘুরে এসে বলল, 'কে একটা লোক জেলখানা থেকে পালিয়ে এদিকে এসেছে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল।'

গোবিন্দ জেল পালানোর কথাটা ছেলেটাকে বলেনি। শুধু বদমাশ লোক তার পিছনে লেগেছে বলে সে লুকিয়ে আছে। গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা আমার কথা কিছু বলেননি তো!'

কিছু লোকের স্বভাব হল, বুদ্ধি থাকলেও তা খাটাবে না। ছেলেটা বলল, 'দাঁড়াও গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসি।'

গোবিন্দ তাকে থামিয়ে বলল, 'এখন ফের জিজ্ঞেস করলে তোমার বাবার সন্দেহ হবে। থাকগে।'

রামু মাঝে মাঝে ছুটির দিনে গোরু চরানোর মাঠে খেলা শিখতে আসে। গোবিন্দ লক্ষ করেছে, ছেলেটা যেদিকে মন দেয় সেদিকটায় বেশ ধাঁ করে উন্নতি করে ফেলতে পারে। খালি মাঠে যন্ত্রপাতি ছাড়া রামুকে আর কী-ই-বা শেখাতে পারে গোবিন্দ? তবু যে কয়েকটা মামুলি একসারসাইজ শিখিয়েছিল, তা চটপট শিখে নিল রামু। খেলা শেখার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা খবরও দিত। সামন্ত বলে দিয়েছে, পুলিশ সার্কাসের ওপর নজর রাখছে তো বটেই, কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হল পুলিশ ছাড়া অন্য-কিছু লোকও সার্কাসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। আর একদিন এসে রামু জানিয়ে গেল, খুব শিগগিরই সার্কাস এখান থেকে উঠে যাবে। গোবিন্দ যেন সার্কাসের দলের সঙ্গে না যায়। এবার সার্কাস যাবে অযোধ্যার দিকে। পারলে গোবিন্দ যেন সেখানে গিয়ে দলে ভিড়ে যায়।

সার্কাসের জন্য প্রাণটা বড়ো কাঁদে গোবিন্দর। চারদিক থেকে আলো এসে পড়ে, শূন্যে মাটিতে তার বা দড়ির ওপর হরেকরকম খেলা চলে, সঙ্গে অদ্ভুত ব্যান্ডের আওয়াজ-সে যেন এক স্বপ্নের জগৎ। তা ছাড়া সার্কাস হল এক বৃহৎ পরিবার। সকলের জন্য সকলে। সেই সার্কাসে আর ফিরে যাওয়া হবে কি না কে জানে!

গোরু চরাতে চরাতে এইসব ভাবে গোবিন্দ।

একদিন গোরু নিয়ে বিকেল বেলা ফিরছে, হঠাৎ দেখে গেরস্তর বাড়ির সামনে খুব লম্বা আর জোয়ান একটা লোক দাঁড়িয়ে গাঁয়ের আর একটা লোকের সঙ্গে কী কথা বলছে। গোবিন্দ পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে শুনতে পেল গাঁয়ের লোকটা বলছে, 'না, এ-গাঁয়ে খুনি গুণ্ডা বদমাশ আসবে কোত্থেকে? সে সব শহরে থাকে।'

লম্বা লোকটা বলল, 'হয়তো পালিয়ে আছে।'

'পালানোর জায়গা কোথায়?'

'আচ্ছা, গবা বলে কাউকে চেনো?'

'খুব চিনি। গবা পাগলা হলেন স্বয়ং শিব।'

'তিনি কি এ-গাঁয়ে আসেন?'

'প্রায়ই আসেন। এই তো সেদিন আমার কেলে গোরুটার কলেরার মতো হল। গবা পাগলটাকে ডেকে আনতে তিনি এসে এমন এক ভস্ম খাইয়ে দিলেন যে, পরদিন থেকে গোবর একেবারে ইটের মতো এঁটে গেল।'

এই পর্যন্ত শুনে গোবিন্দ বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু মুশকিল হল, এ-লোকটা পুলিশের লোক নয়। লম্বা এবং বিশাল চেহারার এই দানবকে গোবিন্দ চেনে। রয়্যাল সার্কাসে লোকটা পাঁচ মন ভার তুলে রোজ সকলকে তাক লাগিয়ে দিত। তারপর সে হঠাৎ একদিন সার্কাস ছেড়ে উধাও হয়। গোবিন্দ কানাঘুসো শুনেছে, এই লোকটা অর্থাৎ সাতনা একটা বাজে সঙ্গে পড়ে খুনখারাপি করে বেড়ায়। কেন সাতনা খারাপ লোকদের দলে ভিড়ল তাও খানিকটা জানে গোবিন্দ। সাতনার সাত বছর বয়সের একটা মা-মরা মেয়ে ছিল। কে বা কারা সেই মেয়েটাকে চুরি করে সার্কাস থেকে নিয়ে যায়, তারপর দশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। সাতনার অত টাকা ছিল না। আদরের মেয়েকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য সে রয়্যাল সার্কাসের মালিকের হাতে পায়ে ধরে টাকাটা ধার হিসেবে চায়। কিন্তু সার্কাসের মালিক টাকাটা দেয়নি। কিছুদিন পর মেয়েটাকে নাকি কাশীতে ভিক্ষে করতে দেখা গিয়েছিল। তখন তার জিভ কাটা, একটা চোখ কানা। সাতনা কাশীতে যায়, কিন্তু মেয়েকে পায়নি। সেই থেকে পাগলের মতো হয়ে যায়। কাশিমের চরের কাছে সুলতানপুরে মেয়েটি চুরি যায়। সাতনা নিজের সঙ্গে মেয়েটাকে নিয়ে সার্কাসের দলে ঘুরে বেড়াত। মেয়েকে খেলা শেখাত। সেই মেয়ে নিখোঁজ হওয়ায় সে আবার সুলতানপুরে ফিরে আসে। তারপর কী হয়েছে তা আর গোবিন্দ স্পষ্ট জানে না।

এখন সাতনা তার খোঁজ করছে জেনে সে খুব অবাক হল। সাতনার সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই। অবশ্য বন্ধুত্বও নেই। সাতনার সঙ্গে খুব সামান্য একটু চেনাজানা মাত্র ছিল তার।

রাতে খড়ের গাদায় শুয়ে অনেক ভেবেও সে কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। তবে সাতনার সঙ্গে হরিহর পাড়ুইয়ের খুব বন্ধুত্ব ছিল একসময়। হরিহর ছিল সুলতানপুরের সুলতান। তার কথায় গোটা গঞ্জ উঠত বসত। কিন্তু সেটা করত ভয়ে। ওই রকম ভয়ংকর লোক দুটো দেখা যায় না।

গোবিন্দ ঘুমিয়ে পড়েছিল, মাঝ রাতে আচমকা ধোঁয়ার গন্ধে উঠে বসল। চোখ কচলে চেয়ে কিছু বুঝবার আগেই হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল পুরো খড়ের গাদাটার চারপাশ দিয়ে

বেড়াজালের মতো আগুনের শিখা উঠে আসছে। ভালো করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই আগুনের শিখা দাপিয়ে উঠল আকাশে। চারদিকে রক্তাভ লেলিহান ভয়ংকর আগুন। গেরস্তবাড়ি থেকে বিকট চ্যাঁচামেচি আসছিল। লোকজন দৌড়ে আসছে।

গোবিন্দ কী করবে বুঝতে পারছিল না। চারদিক দিয়ে আগুন যেভাবে ঘিরে ধরেছে তাতে পালানোর কোনো স্বাভাবিক পথ নেই। কিন্তু আর কয়েক সেকেন্ড থাকলেও আগুনে বেগুন-পোড়া হতে হবে।

গোবিন্দ উঠল। পায়ের নীচে নরম খড়। তার জন্য শরীরের ভারসাম্য রাখাই দায়। লাফ দেওয়ার জন্য পায়ের নীচে শক্ত মাটি দরকার।

গোবিন্দ কিছু না ভেবেই মাথার ওপর থেকে টেনে এক পাঁজা খড় সরিয়ে ফেলল। মাঝখানে শক্ত খুঁটিটা দেখতে পেয়ে কাঠবেড়ালির মতো সেটা বেয়ে উঠে এল একদম ওপরে। খুঁটিটার মাথায় দাঁড়ানোর জায়গা নেই। কোনোক্রমে পায়ের পাতা রাখা যায় মাত্র। কিন্তু সার্কাসের খেলোয়াড়ের কাছে তাই যথেষ্ট।

গোবিন্দ প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু খুঁটির মাথায় দাঁড়িয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করে জীবনের সবচেয়ে বড়ো লাফটা মারল।

১৫

লাফের চোটে গোবিন্দ তিরিশ ফুট খুঁটির ওপরে আরও চার ফুট উঁচুতে উঠে গেল। ধনুকের মতো বাঁকা পথে আগুনের বেড়াজাল টপকে গিয়ে পড়ল আরও অন্তত ষোলো-সতেরো ফুট দূরে। অন্য কেউ হলে এই বিশাল লাফের পর মাটিতে আছড়ে পড়ে হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে থাকত। কিন্তু গোবিন্দ পড়ল বেড়ালের মতো প্রায় নিঃশব্দে, এবং বিনা দুর্ঘটনায়।

পড়ে সে আগুনের দিকে চেয়ে দেখছিল। এত বড়ো আগুন সে বহুকাল দেখেনি। গেরস্তর খড়ের গাদাগুলো সবই বিশাল। আগুনটাও তেমনি বিকট হয়ে আকাশ ছুঁয়ে চলেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, একটু দূরে দূরে আরও দুটো খড়ের গাদা আছে। আগুনটা যেরকম ফুলকি ছড়াচ্ছে, আর শিখা যেমন উত্তুরে বাতাসে দক্ষিণমুখো বেঁকে যাচ্ছে, তাতে আর দুটো গাদা আর গেরস্তর বাড়িতেও আগুন ধরল বলে।

গেরস্ত তার বাড়ির মেয়ে-পুরুষ মিলে পরিত্রাহি চ্যাঁচাচ্ছে 'গেল, গেল সব গেল! জল দে, জল দে শিগগির।'

কিন্তু এই শীতে টানের সময় খালবিল শুকিয়ে দড়ি। কুয়োর জল পাতালে। এই বিশাল আগুন নেভানো সহজ কর্ম নয়। মুনিষরা লাঠি দিয়ে খড়ের গাদায় পেটাপেটি করছিল বটে,

কিন্তু আগুনের তাতে ঝলসে সবাই হটে এল।

অত আগুনের আলোয় চোখ ঝলসে গেছে বলে গোবিন্দর হনুমান লাফটা কেউ লক্ষ করেনি। গেরস্ত বুক চাপড়ে চিৎকার করে বলছিল, 'বোবা-কালা অবোধ লোকটা সেদ্ধ হয়ে গেল রে। আহা বেচারি চ্যাঁচানোরও সময় পায়নি।'

গোবিন্দ পড়েছিল বেগুন-খেতের মধ্যে। সামনে ডালপালার বেশ উঁচু বেড়া। সুতরাং তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এই সময়ে হঠাৎ গোবিন্দর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। খড়ের গাদায় আগুন লেগে সে মরেছে, একথাটা প্রচার হয়ে গেলে কেমন হয়? যারা তাকে মারতে চেয়েছিল তারা অন্তত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

গাঁ-সুদ্ধ লোক আগুন দেখতে ধেয়ে আসছে। গোবিন্দর উচিত ছিল এই অবস্থায় গেরস্তকে কিছু সাহায্য করা। কিন্তু সে দেখল, এই আগুনকে কবজায় আনা তার অসাধ্য। গেরস্তর কপাল ভালো থাকলে বাঁচবে।

এই ভেবে গোবিন্দ হামাগুড়ি দিয়ে বেগুন-খেতের পিছনে বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে বাঁশবনে পড়ল। জিনিসপত্র কিছু পড়ে রইল বটে গেরস্তর বাড়িতে, কিন্তু সে তেমন কিছু নয়।

ঘুরপথে হেঁটে সে শহরের রাস্তায় উঠে পড়ল। খুবই অন্ধকার আর ঠান্ডা রাত। চারদিকে হিম কুয়াশা। গোবিন্দ তার গায়ের কাঁথাটা পর্যন্ত আনেনি। শীতে একেবারে জমে যাচ্ছে। এই ঠান্ডা থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় খুব জোরে জোরে হাঁটা। গোবিন্দ হাঁটতে লাগল।

এতকাল ফাঁসির দড়ির ভয় ছিল। পুলিশের ভয় ছিল। এবার তার সঙ্গে এ আর এক অচেনা বিপদ এসে জুটল। সাতনা। কিন্তু আগুন যে সাতনাই দিয়েছে, তার কোনো মানে নেই।

তবে কে? গোবিন্দকে মেরে তার কী লাভ?

ভাবতে ভাবতে কূলকিনারা পায় না গোবিন্দ। সে বুদ্ধিমান বটে কিন্তু আজকের আচমকা সব ঘটনায় বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা মাথায় সবটা বিশ্লেষণ করতে পারছে না।

গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে যখন খোলা মাঠে পা দেবে গোবিন্দ, তখন হঠাৎ পিছনে শুনল কে যেন দৌড়ে আসছে। তবে এক জোড়া পায়ের আওয়াজ।

গোবিন্দ একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা শত্রু হলেও যদি একা হয় তবে গোবিন্দর ভয় নেই। যে-কোনো একজন লোকের সঙ্গে সে অনায়াসে পাল্লা টানতে পারবে।

কে যেন ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে ডাকল, 'রাখালদা! ও রাখালদা!'

গেরস্তর মেজো ছেলে। গোবিন্দ চাপা স্বরে বলল, 'এখানে!'

কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে সে জিজ্ঞেস করল, 'পালাচ্ছ কেন?'

'না পালিয়ে উপায় নেই। তোমাদের বাড়িতে কি আগুনটা ছড়িয়েছে।'

'না। গাঁয়ের লোকেরা বড়ো বড়ো বাঁশ দিয়ে গাদার আগুন প্রায় ঠান্ডা করে এনেছে। খড়ের আগুন বেশিক্ষণ তো থাকে না। আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম যে। মনে হচ্ছিল, তুমি অত সহজে মরবার পাত্র নও। ঠিক বেঁচে যাবে। তোমাকে লাফ দিয়ে বেগুন-খেতে পড়তেও দেখেছি।'

'আর কেউ দেখেনি তো?'

'আমাদের বাড়ির কেউই দেখেনি। তবে তুমি পালানোর পর লম্বা আর জোয়ান একটা লোক বেগুন-খেতে গিয়ে টর্চ জ্বেলে কী যেন দেখছিল। সে এই গাঁয়ের লোক নয়।'

গোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সাতনা।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে রাখালদা?'

'একটা দুঃখী লোক। দুঃখ অনেক সময় মানুষের ভালো করে। কখনো কখনো খারাপও করে। এ-লোকটার খারাপ করেছে।'

'তার মানে?'

'গল্পটা বলার তো সময় নেই। লোকটা কী করল বলো।'

'কিছু করল না। খানিকক্ষণ চারদিক দেখে খুব গম্ভীর মুখে একদিকে চলে গেল।'

'সঙ্গে কাউকে দেখলে?'

'কাউকে না।'

'তাহলে ওই লোকটাও জানে যে, আমি মরিনি!'

'তা জানতে পারে। কিন্তু আগুনটা দিল কে বলো তো। বাবার ধারণা তুমি বিড়ি খেতে গিয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছ। সত্যি নাকি?'

ম্লান হেসে গোবিন্দ বলে, 'খেলোয়াড়দের বিড়ি সিগারেট খাওয়া বারণ জানো না?'

ছেলেটা অবাক হয়ে বলে, 'তুমি খেলোয়াড় নাকি? কীসের।'

'সার্কাসের। কিন্তু সে-গল্পও আর একদিন শুনো।'

'বাঃ রে, এসব কথা আমাকে বলনি কেন?'

'তুমি ছেলেমানুষ। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইনি।'

'কীসের বিপদ?'

'এখন বলার সময় নেই।'

গেরস্তর মেজো ছেলে অভিমানভরে বলল, 'কিছুই তো আমাকে বলছ না। কিন্তু আমি যে তোমাকে খুব ভালোবাসতাম।'

গোবিন্দ একটু ভাবল। তারপর বলল, 'বেশ কিছুদিন আগে কাশিমের চরে একটা লোক খুন হয়েছিল। তার নাম হরিহর পাড়ুই। জানো?'

'জানি। সার্কাসের খেলোয়াড় মাস্টার গোবিন্দর তো সেই জন্যই ফাঁসি হয়।'

'হয়নি। কারণ আমিই সেই গোবিন্দ মাস্টার।'

'তুমি?' বলে ভূত দেখার মতো আঁতকে ওঠে ছেলেটা।

গোবিন্দ তার কাঁধে হাত রেখে বলে, 'খুনটা যে আমি করিনি সেটা অনেকেই বিশ্বাস করে না। তবে হরিহরের সঙ্গে সেই রাতে কাশিমের চরে আমি গিয়েছিলাম বটে।'

'তবে কে খুনটা করল?'

'তা জানি না। কিন্তু জানতেই হবে। যেমন করেই হোক খুনিকে ধরতে না পারলে পুলিশ শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরবেই।'

'তাহলে তুমি পালাও।'

'তাই পালাচ্ছি।'

১৬

উদ্ধববাবু ঠিক করলেন আজকের রাতটা জেগে পাহারা দেবেন। বাড়ির লোকেরা খুব একটা রাত জাগাতে আগ্রহী নয়। চাকরবাকরেরা দায়ে পড়ে জাগবে বটে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস নেই! উদ্ধববাবু একাই জাগবেন বলে ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর দু-জন সঙ্গী জুটে গেল। একজন তাঁর ছোটো ছেলে রামু। বাচ্চাদের রাত জাগা উদ্ধববাবু পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু রামুটা বেশ ডাকাবুকো আছে, গুলতির হাতটাও বেশ পাকা। লেখাপড়ায় বুদ্ধি না খুললেও অন্যান্য ব্যাপারে যে রামুর বুদ্ধি খুব চটজলদি খেলে তা উদ্ধববাবু জানেন। কাজেই রামু যখন বাবার সঙ্গে পাহারা দেওয়ার প্রস্তাব করল তখন তিনি খুব একটা আপত্তি করলেন না। কটমট করে ছেলের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, 'ফুলহাতা সোয়েটার পরে, মাথায় কানে বেশ করে কমফর্টার জড়িয়ে নেবে। পায়ে জুতো মোজা থাকে যেন।' দ্বিতীয় সঙ্গী জুটল নব্বই বছরের জাফর মিয়া। বয়স নব্বই হলেও জাফর মিয়ার শরীরটি মেদহীন, দীর্ঘ এবং খুবই কর্মক্ষম। তিনি সামান্য দুধ আর ফল ছাড়া অন্য কোনো খাবার খান না। দিনে পাঁচ বার নমাজ পড়েন। তাঁর মাথাটি ঠান্ডা, মেজাজটি ঠান্ডা, মুখে সর্বদা হাসি। তবে জাফর মিয়া কানে কম শোনেন। উদ্ধববাবুকে সেই ছোটো

অবস্থা থেকে দেখে আসছেন। সেই উদ্ধববাবুর বাড়ি ডাকাত পড়বে শুনে তিনি নিজেই যেচে একটা লাঠি হাতে চলে এলেন। গলা কান মাথা ঢাকা বাঁদুরে টুপি, মোটা কম্বল আর নাগরা জুতোয় তাঁকে বেশ জম্পেশ দেখাচ্ছিল।

উদ্ধববাবু নিজেও সঙ্গে একটা অস্ত্র রাখলেন। বহুকাল আগে তাঁর এক রাজপুত মক্কেল মামলায় জিতে একটা তরোয়াল উপহার দিয়েছিল। বংশের স্মৃতিচিহ্ন। তরোয়ালটা বেশ লম্বা আর ভারী। রাজপুত বলেছিল, 'এই তরোয়াল যদি খাপ থেকে কখনো বের করেন তবে রক্ত না খাইয়ে খাপে ভরবেন না। আজ পর্যন্ত এই তরোয়াল রক্ত না খেয়ে খাপে ঢোকেনি কখনো। এমনি রক্ত না জোটে তো কুকুর-বেড়াল পোকামাকড় যা হোক একটা মেরে নিয়মটা রাখবেন।'

উদ্ধববাবু রক্ত খাওয়ানোর কথা শুনে তরোয়ালটা কখনো খাপ থেকে বের করেননি। আজ করলেন। দেখে অবাক হলেন, দশ বছর খাপের মধ্যে একটানা বন্ধ থেকেও তরোয়ালটার গায়ে একটু মরচে পড়েনি। এখনও ঝকঝক করছে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, অস্ত্রটা হাতে নিলেই শরীরের রক্ত কেমন একটু চনমন করে ওঠে! ঘোড়ার পিঠে চেপে এক্ষুনি যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

কিন্তু উদ্ধববাবুর ঘোড়া নেই। ধারেকাছে কোথাও কোনো যুদ্ধও হচ্ছে না। তাই তিনি শূন্যে কয়েকবার তরোয়ালটাকে ঘুরপাক খাইয়ে নিলেন। মনে দুর্জয় সাহস এল।

রাত এগারোটার পর তিন জন বাইরের বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বসলেন। ফ্লাস্কে চা, টিফিন ক্যারিয়ারে লুচি আর আলুর দম। তিনটে নতুন ব্যাটারি ভরা টর্চ।

জাফর মিয়া বললেন, 'পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখলে পারতে হে উদ্ধব। বদমাশগুলো যদি দল বেঁধে আসে তাহলে আমরা তিন জন কী করব?'

উদ্ধববাবু বলেন, 'সেটা একবার ভেবেছিলাম। তবে একটা পাখির জন্য পুলিশ পাহারা বসালে লোকে আমাকে পাগল ভাববে। তাই অতটা আর করিনি! এমনিতেই আজ আদালতে আমার সম্পর্কে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন হাকিম।'

ভালোমানুষ জাফর মিয়া কী বুঝলেন কে জানে। শুধু বললেন, 'তা ভালো। তা ভালো।'

রাত বারোটার মধ্যেই জাফর মিয়া ঢুলতে লাগলেন। রামু প্রথম দিকটায় তেজে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু বাচ্চা ছেলে, হঠাৎ কোন সময়ে শতরঞ্চিতে কোণ ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। উদ্ধববাবু একা।

তবে একা হলেও ভয়ের লেশমাত্র তিনি টের পাচ্ছেন না। হাতের তরোয়ালটা ঝকঝক করছে। শরীরের রক্ত এতই গরম হয়ে উঠেছে যে এই শীতেও তাঁর ঘাম হতে লাগল। তিনি প্রথমে আলোয়ানটা খুললেন, তারপর সোয়েটার ছেড়ে ফেললেন। তাতেও গরম বোধ করায় গায়ের জামাটা খুলে সেটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন। গায়ের গেঞ্জিটাও ভিজে গেছে ঘামে। সেটাও খুলবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় থানার ঘড়িতে একটা বাজবার ঢং শব্দ হল। উদ্ধববাবু তরোয়াল হাতে পায়চারি করতে করতে দরবারি কানাড়া রাগের একটি মুড তৈরি করতে লাগলেন। ভারি গভীর এবং গম্ভীর রাগ। তাঁর গলায় রাগটা খোলেও ভালো। গাইতে গাইতে বেশ আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি! পাখির কথা মনে রইল না, পাহারার কথা মনে রইল না। সুরের ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তরোয়ালটাও উঠছিল নামছিল। পা পড়ছিল তালে তালে। চোখ বোজা। উদ্ধববাবু স্পষ্টই টের পাচ্ছিলেন, আজ তাঁর গলায় অন্য কেউ ভর করেছে। এ যেন তাঁর সেই পুরোনো গলাই নয়। সুরের এক মায়ারাজ্য থেকে রাগরাগিণীর বাতাস ভেসে আসছে। চারদিকে এক সুরের সম্মোহন ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন চোখ মেললেন তখনও তিনি ঠিক বাস্তব জগতে নেই। নিজের সুরের রেশ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বেশ অনেকটা সময় গেল ধাতস্থ হতে। তখন অবাক হয়ে দেখেন, রামু উঠে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। জাফর মিয়া ঘন ঘন চোখের জল মুছছেন। বারান্দায়, সামনের বাগানে, ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর পাড়া-প্রতিবেশী জড়ো হয়েছে। প্রত্যেকেই হাঁ করে দেখছে তাঁকে।

উদ্ধববাবু একটু লজ্জা পেলেন। গান তিনি ভালোই গেয়ে থাকেন বটে, কিন্তু এত রাতে লোক জড়ো হওয়ার মতো ততটা কি? যাই হোক, তিনি হাতজোড় করে শ্রোতাদের নমস্কার জানালেন।

ঠিক এই সময়ে বেরসিক গবা পাগলা বলে উঠল, 'আপনি তো গানের ঠেলায় পাড়া জাগালেন। ওদিকে যে হয়ে গেছে।'

উদ্ধববাবু মিটিমিটি হেসে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল রে আবার?'

'আবার কী? যেনাদের আসবার কথা ছিল তেনারা এসে কাজ হাসিল করে হাওয়া।'

উদ্ধববাবুর মাথাটা আজ বড়ো ভালো। এই শীতের রাতে গান গেয়ে তিনি সকলের ঘুম ভাঙিয়েছেন। তাঁর সুরের চুম্বকে সকলে ছুটে এসেছে। এই সাফল্যের পর তাঁর এলেবেলে কথা ভালো লাগছে না। তবু গলাটা মিষ্টি রেখেই বললেন, 'আরও লোক এসেছিল বুঝি? তা বসতে দিলি না কেন?'

'তারা বসবার জন্য এলে তো বসতে বলব! তারা কাজ গুছোতে এসেছিল, কাজ গুছিয়ে সরে পড়েছে।'

'তাই নাকি?' উদ্ধববাবু তবু গা করেন না।

গবা পাগলা বলল, 'আমিও গোয়ালঘরের চালে বসে পাহারা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আপনি তরোয়াল ঘুরিয়ে গান ধরেছেন। তরোয়ালের ডগাটা একবার রামুর পেটের ধার ঘেঁষে গেল, আবার জাফরচাচার নাকের ডগা ছুঁয়ে এল। মারাত্মক কাণ্ড। ভাবছি নেমে এসে আপনাকে জাপটে ধরি। ঠিক এই সময় তেনারা এলেন। পাঁচ-সাতজন তাগড়া জোয়ান। আপনি চোখ বুজে গানে মত্ত। তারা আপনার চোখের সুমুখ দিয়ে, বগলতলা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল যন্ত্র দিয়ে তারপর চোখের পলকে পাখির দাঁড়টা নিয়ে আপনার সুমুখ দিয়েই বেরিয়ে গেল। গান যে কী সব্বোনেশে তা আজ বুঝলাম।'

উদ্ধববাবু এখনও সংগীতের সুরলোক থেকে নেমে আসতে পারেননি। চোখে এখনও ঘোর। মিষ্টি করে বললেন, 'পাখি নিয়ে গেছে? যাক। পাখি যাক, সুর তো ধরা দিয়েছে। তুই বরং রাঘব ঘোষকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।'

লোকজনের ভিড় ঠেলে হঠাৎ দারোগা কুন্দকুসুম বারান্দায় উঠে এলেন। মুখ গম্ভীর। বললেন, 'উদ্ধববাবু, আপনার মতো বিশিষ্ট লোককে হ্যারাস করতে চাই না। কিন্তু আপনার পাড়াপ্রতিবেশীদের কয়েকজন গিয়ে আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে আপনি গভীর রাতে বিকট চিৎকার করে তাঁদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। ইন ফ্যাক্ট, আমিও থানা থেকে একটা চ্যাঁচানি শুনতে পেয়েছি। প্রতিবেশীরা আপনাকে থামানোর জন্য এসে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু আপনি একটি বিপজ্জনক অস্ত্র ঘোরাচ্ছেন দেখে তাঁরা কেউ কাছে আসতে ভরসা পাননি। তাঁদের ধারণা, আপনি পাগল হয়ে গেছেন। আপনার বিরুদ্ধে বিপজ্জনক অস্ত্র রাখা ও ব্যবহার এবং লোকের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানোর দু-দফা অভিযোগ। আমি

আপনাকে গ্রেফতারও করতে পারি। কিন্তু অতটা না করে আজ কেবল একটা ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আর এরকম করবেন না।'

কুন্দকুসুম চলে যাওয়ার পর উদ্ধববাবু সুরলোক থেকে দড়াম করে বাস্তব জগতে নেমে এলেন। কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাখিটা তবে নিয়ে গেছে?'

গবা বলল, 'তবে আর বলছি কী?'

উদ্ধববাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, 'তোর চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল, তুই কিছু করলি না?'

গবাও সমান তেজে বলে, 'সে তো আপনারও চোখের সামনেই নিয়ে গেছে। আমাকে দোষ দিচ্ছেন শুধু শুধু। আমি একা অতজনের সঙ্গে পারব কেন?'

'চ্যাঁচাতে তো পারতিস!'

গবা হেসে বলে, 'আজ্ঞে, আপনার গানের চোটে আর সব শব্দ তো লোপাট হয়ে গিয়েছিল, আমার চ্যাঁচানি শুনবে কে? তবু চেঁচিয়ে ছিলাম। কিন্তু আপনার গলার দাপটে আমার চ্যাঁচানি ঢাকা পড়ে গেল।'

জাফর মিয়া হঠাৎ একগাল হেসে বললেন, 'উদ্ধব আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। বুঝলে! হঠাৎ কানের ভিতরকার ঝিঁঝিঁ ভাবটা কেটে গেছে।'

উদ্ধববাবু কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'তাই নাকি?'

'ঃও, তোমার গান যে কী উপকারী তা আর বলার নয়। প্রথমটায় একটু আঁতকে উঠেছিলাম বটে। কিন্তু তার পর থেকেই কান ভেসে যাচ্ছে হাজাররকম শব্দে।'

'হুঁ' বলে উদ্ধববাবু তরোয়াল-হাতে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিলেন। রক্ত না-খাইয়ে তরোয়াল খাপে ভরা বারণ। উদ্ধববাবু তরোয়ালটার দিকে চেয়ে বললেন, 'খাওয়াচ্ছি রক্ত। নে খা।' বলে তরোয়ালটা দিয়ে নিজের কণ্ঠনালি চেপে ধরলেন।

১৭

.ভার রাত্রে সামন্তমশাইয়ের তাঁবুতে একটা লোক ঢুকল। চাপা গলায় ডাকল, 'সামন্তমশাই!'

সামন্তর ঘুম পাতলা। এক ডাকেই জেগে লম্ফটা উসকে দিয়ে বলে, 'কে?'

'আমি গোবিন্দ। শুনলাম সার্কাস এখান থেকে চলে যাচ্ছে।'

সামন্ত একটা শ্বাস ফেলে বলে, 'রাত ভোর হলেই গোছগাছ শুরু হবে। বেলাবেলিই রওনা হওয়ার কথা।'

'আমি কি পড়ে থাকব এখানে? আমাকেও সঙ্গে নিন।'

সামন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তোকে না নেওয়া কি আমার ইচ্ছে? কিন্তু পুলিশ কড়া নজর রাখছে। যেখানে যাব সেখানেও রাখবে। লুকিয়ে থাকতে তো পারবি না।'

'তাহলে?'

'তাহলে যে কী তা আমার মাথায় খেলছে না। রোজই তোর কথা ভাবি। কিন্তু কোনো ফন্দিফিকির খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সার্কাস ছাড়া যে আমি বাঁচব না।' বলে গোবিন্দ সামন্তর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। তার চোখে জল।

সামন্ত তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, 'কী যে গেরোয় পড়েছিস বাবা। ভগবান তোকে কেন এমন বিপদে ফেলল তাও বুঝি না। ভালো লোকেরাই দেখছি এই দুনিয়ায় সবচেয়ে হতভাগ্য।'

গোবিন্দ মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু কাঁদল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আপনি আমার বাবার মতো। আপনাকে তাই বলতে বাধা নেই। আমি ভালো লোক নই সামন্তমশাই।'

সামন্ত চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'তোকে আমি এইটুকু বয়েস থেকে জানি। বলতে কী আমার কাছেই প্রতিপালিত হয়েছিস। কোনোদিন চুরি-টুরি করিসনি, মিথ্যে কথা বলিসনি, লোকে বিপদে পড়লে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহায্য করেছিস, তবু তুই ভালো লোক নোস, এ আবার কেমন কথা?'

গোবিন্দ চোখের জল মুছে বলে, 'সে-সব আপনিই শিখিয়েছেন। ভালো লোকের কাছে থাকলে লোকে সৎ শিক্ষাই পায়। কিন্তু কয়লা ধুলে কি ময়লা যায়? আমার ভিতরে যে গরল ছিল।'

'সে আবার কী কথা?'

গোবিন্দ ধীর গম্ভীর গলায় বলে, 'হরিহরকে আমি খুন করিনি বটে, কিন্তু আমার মনে পাপ ছিল। গুপ্তধনটা খুঁজে পেলে আমার ইচ্ছে ছিল, হরিহরকে খুন করে সবটুকু আমি হাতিয়ে নেব। তারপর সেই টাকায় নিজের একটা সার্কাসের দল খুলব।'

'বটে।' সামন্ত একটু বিষণ্ণমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমি তো তোকে অনেকবার বলেছি, আমি মরলে এই সার্কাস তোরই হবে। আমি জানি, তোর মাথায় ব্যাবসা করে টাকা রোজগারের মতলব নেই। সার্কাস একটা আনন্দের জিনিস। লোকের কাছ থেকে পয়সা আমরা নিই বটে, কিন্তু সেটাই কথা নয়। বড়ো কথা হল, ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাহস আর আনন্দ জাগিয়ে তোলা আর নিজেদেরও তা থেকে আনন্দ পাওয়া। লোভ থাকলে ভালো খেলোয়াড় হওয়া যায় না, ভালো মানুষও হওয়া যায় না। তোর হঠাৎ লোভ এল কোথা থেকে?'

'লোভটা বাইরে থেকে আসে না, সামন্তমশাই। লোভ মানুষের ভিতরেই থাকে।' গোবিন্দের চোখে আবার জল। চোখ মুছে সে বলল, 'হরিহরকে খুন করার কথা ভেবেছিলাম দুটো কারণে। একে তো হরিহরের মতো বদমাশ দুটো নেই। আর একটা কারণ হল, আমি ওকে খুন না করলে ও-ই আমাকে খুন করত।'

সামন্ত চোখ ছোটো করে খুব একদৃষ্টে গোবিন্দর দিকে চেয়ে ছিল। বলল, 'তোর সঙ্গে হরিহরের চেনা-পরিচয় হল কী করে?'

'হরিহরকে সবাই চিনত। আমরা যখন কাশিমের চরের কাছে খেলা দেখাচ্ছিলাম তখন একদিন হরিহর আমার কাছে লুকিয়ে আসে। আমাকে বলল, সে এক জায়গায় গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। আমি যদি সেই গুপ্তধন উদ্ধারে তাকে সাহায্য করি তাহলে সে আমাকে অর্ধেক বখরা দেবে। গুপ্তধনের কথা শুনেই প্রথম আমার ভিতরে লোভ জেগে উঠল।'

'সন্ধান পেয়েছিলি?'

'না। গুপ্তধনটা ছিল এক বুড়ির। সে সম্পর্কে হরিহরের পিসি হয়। সেই বুড়ির তিন কুলে কেউ নেই। এমনকী সেই গুপ্তধনও নাকি বুড়ি চোখে দেখেনি। তবে সন্ধানটা সে-ই জানত। বুড়ি একটা কাকাতুয়া পুষত, আর সেটাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসত। গোপনে নাকি বুড়ি কাকাতুয়াটাকে সেই গুপ্তধনের সন্ধান শিখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আর কাউকে বলত না। হরিহর বুড়ির গুপ্তধনের সন্ধান জানার জন্য বিশু নামে নিজের এক সাকরেদকে পিসির বাড়িতে চাকরের কাজ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বিশু কোনো সন্ধান বের করতে পারেনি। তবে একদিন বিশু কাকাতুয়াটাকে চুরি করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে হরিহর বিশুর পিছু ধাওয়া করে এক মাঠের মধ্যে তাকে খুন করে। কিন্তু বিশু খুন হওয়ার আগে

পাখিটার পায়ের শিকলি খুলে উড়িয়ে দেয়। ওদিকে হরিহরের পিসি কাকাতুয়ার শোকে মারা যায়। তবে মরার আগে সে যখন ভুল বকছিল তখন হরিহর সেইসব কথা থেকে গুপ্তধনের জায়গাটা আঁচ করেছিল। কিন্তু তা উদ্ধার করা বড়ো সহজ কাজ ছিল না। তাই আমার কাছে এসেছিল হরিহর।'

'তারপর কী হল?'

'সে অনেক ঘটনা। কাশিমের চরে একটা মস্ত পুরোনো বাড়ি আছে। সেই বাড়ির অনেকগুলো গম্বুজ আছে। কোনো গম্বুজেই উঠবার কোনো সিঁড়ি নেই। আর এমন সমান করে তৈরি যে কোনো খাঁজ-টাঁজও নেই যা বেয়ে ওঠা যায়। হরিহর বলেছিল তার মধ্যে একটা গম্বুজের মাথায় নাকি একটা ঢাকনা আছে। ঢাকনার নীচে গভীর এক কুয়োর মুখ। গম্বুজের মাথা থেকে সেই কুয়ো নেমে একেবারে মাটির তলায় চলে গেছে। আর মাটির তলায় কোনো কুঠুরিতে আছে সেই গুপ্তধন। সেই কুঠুরিতে পৌঁছোনো খুব শক্ত কাজ। সার্কাসের খেলোয়াড় ছাড়া সে-কাজ করার সাধ্য খুব কম লোকের আছে।'

'তুই হরিহরের কথায় রাজি হলি?'

'প্রথমে হইনি। পরে লোভ হল। ভীষণ লোভ। মনে হল, রাতারাতি বড়োলোক হওয়ার এমন সুযোগ আর পাব না।'

'তা বলে খুনের কথা ভাববি?'

'লোভ একটা নেশার মতো সামন্তমশাই, যখন ঘাড়ে চাপে তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না।'

'তারপর কী হল?'

'কথা ছিল, আমি সন্ধে বেলা সেই পোড়ো বাড়িতে হাজির থাকব। হরিহর আসবে। কিন্তু সে সময়মতো এল না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই বাড়িতে বহু গম্বুজ। কোনটা যে গুপ্তধনের সুড়ঙ্গ তা তো জানি না। হরিহর এসে চিনিয়ে দেবে। কিন্তু সে আর হল না। কাশিমের চরে অন্য একদল বদমাশের হাতে হরিহর খুন হয়ে গেল সেই রাতে। আমার চোখের সামনেই ঘটনা। দোষের মধ্যে আমি গিয়ে হরিহরের লাশটাকে নাড়াচাড়া করেছিলাম, বেঁচে আছে কি না দেখতে। যদি তার কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করা যায়। ঠিক সেই সময়ে কিছু লোক এসে পড়ল সেখানে। ধরা পড়ে গেলাম।'

'তুই বলেছিলি, জেলখানা থেকে তোকে পালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেটা কেন দেওয়া হল তা জানিস।'

গোবিন্দ একটু হেসে বলল, 'একটু একটু বুঝতে পারি। জেলখানায় পুরোনো এক ডাকাতির দাগি আসামি আছে। এখন সে ওয়ার্ডেন। কথায় কথায় তাকে একদিন গুপ্তধনের গল্পটা বলেছিলাম। মনে হয় লোকটা সেই থেকে লোভের খপ্পরে পড়ে গেছে। আমার ফাঁসি হলে তো সে গুপ্তধনের আর সন্ধান পাওয়া যাবে না। তাকে আমি জায়গাটার নাম বলতেও রাজি হইনি। কাজেই সেপাইদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সে আমাকে পালানোর পথ করে দিয়েছিল। সে তো জানে পালিয়ে গিয়ে আমি সেই গুপ্তধনের সন্ধান করবই। গুপ্তধন উদ্ধার করবার সঙ্গেসঙ্গে আমাকে পাকড়াও করা হবে। শুনেছি সেই দাগি আসামির দলটা এখনও বেশ দাপটে ডাকাতি করে বেড়ায়, আর সে জেলে থেকেও তাদের সর্দার।

১৮

গলায় তরোয়ালের ধারালো দিকটা চেপে ধরে উদ্ধববাবু চোখ বুজে দুর্গানাম স্মরণ করে বিড়বিড় করে বললেন, 'দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মাগো! সন্তানকে কোলে তুলে নাও মা। দেখো, যেন বেশি ব্যথা-ট্যথা না পাই, রক্তপাত যেন বেশি না হয়। মরার পর যেন ভূত-টুত হয়ে থাকতে না হয়। সব দেখো মা!' বলতে বলতে তরোয়ালটায় একটু চাপ দিয়েছেন।

আত্মহত্যার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে চিন্তা করতে করতেই উদ্ধববাবু শোয়ার ঘরে ঢুকেছিলেন। তরোয়ালটা হাতেই ছিল। রক্ত না খাইয়ে সেটাকে খাপে ভরা বারণ। সুতরাং তিনি চটপট স্থির করে ফেললেন, এক কাজে দুই কাজ সেরে ফেলাই ভালো।

কে যেন খুব কাছ থেকে বলে উঠল, 'বাবামশাই, লুচি খাব।'

উদ্ধববাবু চোখ খুললেন। অবাক হয়ে দেখলেন, উত্তর দিকের জানলার গরাদ দিয়ে কাকাতুয়াটা সেঁধিয়ে ঘরে ঢুকছে। টালুক-টুলুক করে দেখছে তাঁকে। চোখে চোখ পড়তেই বলল, 'সব ভালো যার শেষ ভালো।'

উদ্ধববাবু তরোয়াল রেখে দিয়ে কাকাতুয়াটাকে বুকে তুলে নিয়ে আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেললেন। ধরা গলায় বললেন, 'তোর জন্যেই এ-যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলাম বাপ, কত লুচি খেতে চাস? তোকে ফাঁসির খাওয়া খাওয়াব।' বলে ভিতর বাড়ির দিকে মুখ করে হাঁক দিলেন, 'ওরে নয়নকাজল, শিগগির লুচির জন্য ময়দা মাখ।'

কিন্তু নয়নকাজল তখন ময়দা মাখার মতো অবস্থায় তো আর নেই। বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে সে মাটির ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার বুকের ওপর দানবের মতো একখানা পা রেখে দাঁড়িয়ে সাতনা। গলায় বল্লমটা চেপে ধরে সাতনা বলছে, 'প্রাণে বাঁচতে চাস তো সত্যি কথা বল।'

ভয়ে নয়নকাজল বাক্যিহারা হয়ে গেছে। দোষটা অবশ্য তারই। পরশুদিনই একটা লোক তার মামাতো ভাই সেজে এসে তাকে দু-শো টাকা দিয়ে বলে গেছে, 'আমরা ঠিক সময়মতো আসব। উদ্ধব বাধা দেবে দিক। তুই পাছ-দুয়ার দিয়ে পাখিটা বের করে দিবি।' নয়নকাজল সে প্রস্তাবে রাজি হয়নি। পাখি গুপ্তধনের সন্ধান জানে। এমন পাখি হাতছাড়া করার জন্য মাত্র দু-শো টাকায় রফা করে কোন আহাম্মক! সে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিল, 'ওসব হবে না। আমাকে ভাগ দিতে হবে। পাখি নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব।'

সেই কথাই ঠিক ছিল। ডাকাতরা বাড়ি ঢুকতেই নয়নকাজলও পাখিটাকে দাঁড় থেকে খুলে র্যাপারে চাপা দিয়ে পাছ-দুয়ার খুলে বেরোয়। তারপর সবাই মিলে হাঁটা দিয়েছে জঙ্গলের দিকে। কিন্তু কাকাতুয়া খুব ছোটোখাটো পাখি তো নয়! বেশ বড়োসড়ো, আর ওজনও অনেকটা। জঙ্গলের কাছ-বরাবর এ-বগল থেকে ও-বগলে নেওয়ার সময় পাখিটা হঠাৎ ঝাপটা মেরে উড়ে গেল।

নয়নকাজল সাতনার দিকে চেয়ে চিঁচিঁ করে বলল, 'মাকালীর দিব্যি বলছি, হাতটায় ঝিঁঝি ধরেছিল বলে, ইচ্ছে করে ছাড়িনি।'

দলের ষণ্ডামতো আর একটা লোক সাতনাকে ডেকে বলল, 'এক্ষুনি মারিস না। ওটাকে দিয়ে কাজ হবে।'

সেই লোকটা এসে সাতনাকে সরিয়ে নয়নকাজলকে টেনে দাঁড় করাল। তারপর দু-গালে ফটাস ফটাস করে দু-খানা চড় মেরে বলল, 'আবার যা। এবার শুধু পাখি নয়, উকিলের ছোটো ছেলেটাকেও চুরি করবি। উকিলটা মহা ত্যাঁদড় আছে। থানা-পুলিশ করতে পারে। ছেলেটা আমাদের হাতে থাকলে তা আর করতে সাহস পাবে না।' চড় খেয়ে নয়নকাজলের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিন করছিল। সে কোনোমতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সাতনা তার গলায় বল্লমটা আবার ধরে বলল, 'শোন বাপু, গুপ্তধনের ভাগ চাস সে অনেক বড়ো কথা। কিন্তু এখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ঠিক ঠিক কাজ করিস। একটু গুবলেট হলে যমদোরে গিয়েও আমাদের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। মনে থাকবে?'

নয়নকাজল মাথা নাড়ল। একটু দম নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

বাড়ি পৌঁছোতে ফর্সা হয়ে গেল চারদিক। উদ্ধববাবুর হুংকারে পাড়া কাঁপছে। 'কোথায় গেল সেই পাজি ছুঁচোটা? সেই তখন থেকে কাকাতুয়া লুচি লুচি করে হেদিয়ে মরছে!'

নয়নকাজল হাঁফাতে হাঁফাতে উদ্ধববাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'আজ্ঞে বাবামশাই, ধরতে ধরতেও ধরতে পারলাম না। একটুর জন্য . . .'

উদ্ধববাবু নয়নকাজলের উড়োখুড়ো চেহারা দেখে আঁতকে উঠে বললেন, 'কাকে ধরতে পারলি না?'

'দলে পাঁচ জন ছিল। হাতে ইয়া বড়ো দা, বন্দুক, কুড়ুল, বল্লম। তা ভাবলাম, যার নুন খাই তার জন্য না হয় প্রাণটা দেব। পাখিটা চুরি করে যেই না তারা পালাচ্ছে, আমিও লাঠি নিয়ে পিছু ধরলাম। মাইলটাক পর্যন্ত দৌড়ে ধরেও ফেলেছিলাম প্রায়। কিন্তু ভয় খেয়ে তারা এমন ছুটতে লাগল যে, একটুর জন্য . . .'

উদ্ধববাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুম! ঠিক আছে, এখন গিয়ে দু-সের ময়দা মাখ ভালো করে। ডাকাতদের ব্যবস্থা আমি করছি।'

নয়নকাজল উদ্ধববাবুর কাঁধে-বসা পাখিটার দিকে কটমট করে একবার চেয়ে ময়দা মাখতে গেল।

১৯

গতকাল রাতে কাকাতুয়াকে চুরি করতে ডাকাত এসেছিল কিন্তু চুরি করতে পারেনি। সকালে কাকাতুয়াকে লুচি খাইয়ে উদ্ধববাবু থানায় গেলেন। এতকাল এ-ব্যাপারে পুলিশকে জড়াননি তিনি। কিন্তু রাত্তিরে যা হয়ে গেল তাতে তিনি ভাবনায় পড়েছেন। ডাকাতদলকে ঠেকানো তো একার কাজ নয়।

উদ্ধববাবু উকিল হিসেবে খুবই ডাকসাইটে। সবাই তাঁকে খাতিরও করে। কুন্দকুসুমও করতেন। কিন্তু রাত্রির ঘটনার পর আজ যেন উদ্ধববাবুকে তিনি বিশেষ পাত্তা দিতে চাইছিলেন না। ঘটনাটা শুনে বরং হোঃ-হোঃ করে খানিক হেসে বললেন, 'একটা পাখির জন্য সাতটা ডাকাত কাল আপনার বাড়ি চড়াও হয়েছিল, এ-কথা নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া কে বিশ্বাস করবে বলুন!'

উদ্ধববাবুও জানেন, পাখির জন্য ডাকাতি হয় এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তাঁর পাখিটা যে গুপ্তধনের সন্ধান জানে এ-কথাটাও তিনি ফাঁস করতে চান না। গলাখাঁকারি দিয়ে তিনি বললেন, 'পাখিটা আসলে খুব দামি। রেয়ার টাইপের জিনিস।'

কুন্দকুসুম ভ্রূ কুঁচকে উদ্ধববাবুকে একটু দেখে নিয়ে ফিচেল হাসি হেসে বললেন, 'একটা খুব রেয়ার পাখির দামও নিশ্চয়ই এত বেশি হতে পারে না যার জন্য বাড়িতে ডাকাত পড়বে। আপনি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেলেন উদ্ধববাবু?'

কথাটা যুক্তিযুক্তই। কিন্তু কুন্দকুসুম তো আর গোপন কথাটা জানেন না। উদ্ধববাবু তাই মাথা চুলকে বললেন, 'সে যাই হোক, আমার বড়ো ভয় করছে। আজ রাত থেকে আমার বাড়িতে দু-জন আর্মড গার্ড যদি রাখেন তবে বড়ো ভালো হয়।'

কুন্দকুসুম মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব। আমার হাতে যে ফোর্স আছে তা নিতান্তই সামান্য। তার ওপর এই থানার সব জায়গায় রিসেন্টলি ক্রাইম ভীষণ বেড়ে গেছে। ইন ফ্যাক্ট একজন ফেরারি খুনি আসামির জন্য আমাকে সদর থেকে এক্সট্রা ফোর্স আনতে হচ্ছে! আপনি যত বড়ো উকিলই হোন উদ্ধববাবু, এই অবস্থায় আপনার পোষা পাখিকে পাহারা দেওয়ার জন্য লোক দিতে পারব না। মাপ করবেন!'

উদ্ধববাবু মরিয়া হয়ে বললেন, 'ডাকাত যে পড়েছিল তার কিন্তু সাক্ষী আছে। তারা দরকার হলে আদালতে বলবে যে, আপনি আমার বিপদ জেনেও প্রোটেকশন দেননি।'

'বটে!' বলে কুন্দকুসুম সোজা হয়ে কটমট করে উদ্ধববাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি আমার বিরুদ্ধে আদালতেও যাবেন বলে ভাবছেন! কারা সাক্ষী আছে বলুন তো! আমি তাদের স্টেটমেন্ট নেব।'

'গবা আছে, আমার ছোটো ছেলে রামু আছে, জাফরচাচা আছেন।'

কুন্দকুসুম বাজখাঁই গলায় আবার হাঃ-হাঃ করে হাসলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রামু বা জাফরচাচা সাক্ষ্য দেবে না। ওরা কিছু দেখেনি। বরং সাক্ষ্য দিলে ওরা উলটো কথাই বলবে। ওরা বলবে যে, আপনি বিপজ্জনক এক অস্ত্র দিয়ে বহু লোকের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন, বিকট চিৎকার করে লোকের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন।'

'ওরা দেখেনি!' চিন্তিত উদ্ধববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'কিন্তু গবা তো দেখেছে।'

'গবাকে সাক্ষী দাঁড় করালে দেশসুদ্ধু লোকের কাছে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন। কারণ সবাই জানে গবা বদ্ধ উন্মাদ। পাগলের সাক্ষ্য টেঁকে না, উকিল হয়ে এটা আপনার জানা উচিত ছিল।'

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলেন।

কুন্দকুসুম পিছন থেকে তিক্তমধুর গলায় বললেন, 'সকালে আপনি রটিয়েছিলেন যে, আপনার পাখিটা চুরি গেছে বা ডাকাতি হয়েছে। কিন্তু আমি খবর রাখি যে, পাখিটা এখনও আপনার কাছেই আছে।'

উদ্ধববাবু কী একটা বলতে গেলেন, কিন্তু শেষ অবধি বললেন না। বলে লাভও নেই। এই মাথামোটা লোকটা তাঁকে বিশ্বাস করবে না। আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি থানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

পাখিটার জন্য আজ রাতে ডাকাতরা আর একবার হানা দিতে পারে। সুতরাং সন্ধের আগেই উদ্ধববাবু তৈরি হতে লাগলেন। তবে অসুবিধে দেখা দিল লোকজন জোটানোর

বেলায়। জাফরচাচাকে বলতে গিয়েছিলেন উদ্ধববাবু, 'চাচা আজও আমার সঙ্গে রাতটা গল্পগুজব করে কাটাবেন নাকি?'

জাফর মিয়া আঁতকে উঠে বললেন, 'কানে শোনার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি ভাই, সেটা আবার হারাতে চাই না। তা ছাড়া আজ বাতের ব্যথাটাও চাগাড় দিয়েছে।'

উদ্ধববাবু রামুকে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু তার সাড়া পাওয়া গেল না। এমনকী নয়নকাজলকে পর্যন্ত ডেকে গলা ভেঙে ফেললেন। 'কোথায় যে সব থাকে!' বিরক্ত হয়ে এই কথা বলে সন্ধে-রাত্রিতেই উদ্ধববাবু বন্দুক কাঁধে নিয়ে বাড়ির চারদিকটা টহল দিলেন। টর্চ জ্বেলে বাড়ির সবচেয়ে দুর্বল অংশ কোনটা এবং কোথা দিয়ে ডাকাতরা বাড়িতে ঢুকতে পারে তা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। বাড়িটা তাঁর খুবই মজবুত এবং নিরাপদ। কিন্তু তা বলে কি আর রন্ধ্র থাকতে পারে না! লখিন্দরের বাসরঘরেও তো রন্ধ্র ছিল।

ওদিকে তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়েরাও বাড়ির চারদিকে সার্চ করতে লেগে গেছে।

উদ্ধববাবু খিড়কির দরজাটা পেরেক দিয়ে একেবারে সেঁটে দিলেন, তারপর কয়েকটা পাথরের চাঁই এনে ঠেকা দিলেন তাতে। বাড়ির চারদিকে উঁচু পাঁচিলের ওপর উঠে কাঁটাতার বিছিয়ে দিলেন। আর সামনের বারান্দায় সরষের তেল ঢাললেন। অনেকগুলো কলার খোসা ছড়িয়ে রাখলেন। ডাকাতরা হুড়মুড় করে এলে যাতে আছাড় খায়। কেলেহাঁড়ি দিয়ে একটা কাকাতুয়াও বানালেন। সেটাকে সামনের দরজার পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

সবই হল, কিন্তু নয়নকাজলের পাত্তা নেই। সে নাকি বিকেলের দিকে দোকানের সওদা করতে গেছে। এখনও ফেরেনি। রামু গেছে খেলার মাঠে। তারও কোনো পাত্তা নেই। উদ্ধববাবু বেশ উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত। কী করবেন ভেবে না পেয়ে তিনি স্টোর রুমে তালা দিয়ে রাখা পাখিটাকে দেখতে গেলেন।

তালা খুলে তাঁর চোখ কপালে উঠল। দাঁড় ফাঁকা। পাখির পালকটিরও পাত্তা নেই।

পাখি-রামু-নয়নকাজল! দুয়ে দুয়ে চার করতে উদ্ধববাবুর দেরি হল না। অবশ্য পাখির দাঁড়ে একটা চিরকুটও লটকানো ছিল। তাতে লেখা-'পাখিটা বিধিসম্মত মালিকের হস্তগত হইয়াছে। ব্যাপারটি লইয়া শোরগোল করিলে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের প্রাণ সংশয় হইবে। জনৈক শুভাকাঙ্খী।'

কিন্তু তবু শোরগোল হল। পাড়াপ্রতিবেশীরা খবর পেয়ে ছুটে এল। কিন্তু তাতেও দেখা দিল প্রবল গণ্ডগোল। বারান্দায় আর উঠোনে ধপাধপ লোকজন আছাড় খাচ্ছে আর 'বাবা

রে, মা রে, গেছি রে' বলে চ্যাঁচাচ্ছে। খুন্তিবুড়ি চোখে কম দেখেন। তিনি সামনের দরজায় কাকাতুয়াটাকে দেখে ভূত ভেবে সেই যে ভিরমি খেলেন আর চোখ খোলার নামটি নেই। সামনের বারান্দায় ভিড় হওয়ায় জনাকয় লোক পাঁচিলে উঠেছিল। কাঁটাতারে জামা-কাপড় আটকে তাদের বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। রামুর মা আর ঠাকুমা ডুকরে কাঁদতে লেগেছেন, রামুর ভাই-বোনেরা কাঁদছে। এই গোলমালে মাথা ঠান্ডা রাখা দায়। বারবার সবাইকে চুপ করতে বললেন উদ্ধববাবু। কে শোনে কার কথা! অবশেষে এই গোলমালে অসহ্য হয়ে উদ্ধববাবু বন্দুকটা আকাশে তাক করে দুম দুম করে দুটো ফায়ার করলেন। তাতে ফল হল উলটো। যারা কাঁদছিল তারা আরও জোরে কাঁদতে লাগল। পাড়াপড়শির বাচ্চারা ভয় খেয়ে চ্যাঁচাতে লাগল। বন্দুকের শব্দে যারা চমকে উঠে পালাবার তাল করেছিল তারা ফের কলার খোসা আর তেল-হড়হড়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তবে উপকার হল এক জনের। ভিরমি কেটে উঠে পড়লেন খুন্তিবুড়ি।

কিছুক্ষণ বাদে লোকজন বিদেয় হল, কুন্দকুসুম তদন্তে এলেন। চারদিক ঘুরেটুরে দেখে বললেন, 'আপনার বন্দুকের লাইসেন্স আছে তো?'

'আছে।' উদ্ধববাবু বুক চিতিয়ে বললেন।

কুন্দকুসুম বুক ফুলিয়ে বললেন, 'থাকলেই কী! যখন-তখন ফায়ার করার আইন কিন্তু নেই। যাকগে, আপনার মন আজ অস্থির, বন্দুকের ব্যাপারে তাই কিছু বলছি না। আর রামুকে কিডন্যাপ, পাখিটা চুরি এবং নয়নকাজলের উধাও হওয়া-এগুলো আমার নোট করা রইল।'

কুন্দকুসুম চলে যাওয়ার পর বেশ একটু রাতের দিকে গবা পাগলা এসে ঢুকল। তার মুখ থমথমে।

উদ্ধববাবু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ভাবছেন। হাতে এখনও বন্দুক। ডাকাতরা শোরগোল করতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু শোরগোল কিছু বেশিই হয়ে গেছে। এখন রামুর কী হয় সেইটে নিয়েই তাঁর চিন্তা।

গবা ডাকল, 'বাবু।'

'কী বলছিস?'

'একজন কাজের লোক রাখবেন? খুব ভালো লোক।'

এই দুঃসময়ে পাগলটা চাকর রাখার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে দেখে উদ্ধব অবাক হন। বলেন, 'কী বলছিস?'

গবা তখন উদ্ধবের কানে কানে চুপিচুপি ক-টা কথা বলল।

২০

রামু নিরুদ্দেশ, কাকাতুয়া বেহাত, নয়নকাজল হাওয়া। বাড়িতে প্রচণ্ড ডামাডোল। এরই মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে একটা নতুন কাজের লোক বহাল হয়ে গেল।

উদ্ধববাবুর প্রেশার বেড়ে গেছে, তিনি শয্যা নিয়েছেন। ডাক্তার এসে দেখে নড়াচড়া বারণ করে গেছেন। কিন্তু উদ্ধববাবু কেবল এপাশ-ওপাশ করেন। তাঁর ছোটো ছেলেটা দুষ্টু ছিল বটে, তিনি শাসনও করতেন তাকে, কিন্তু এখন তার জন্য বুক ফেটে যাচ্ছে কষ্টে। ছেলেটাকে কি ওরা জ্যান্ত রাখবে?

রাত বেশ গভীর হয়েছে। ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। উদ্ধববাবু ঘুমোনোর বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করে উঠে বসে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলেন। ঠিক সেই সময়ে ভিতরবাড়ির দিককার দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। উদ্ধববাবু হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

ঘরে ঢুকল নতুন কাজের লোকটা।

'কী চাও?' উদ্ধববাবু জিজ্ঞেস করলেন। 'আজ্ঞে আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

'এত রাতে কথা কীসের?'

'আজ্ঞে টের পাচ্ছি রামুর চিন্তায় আপনার ঘুম হচ্ছে না। শরীরও ভালো যাচ্ছে না আপনার। তাই বলতে এসেছিলাম গুপ্তধনের হদিস যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ ওরা রামুর ক্ষতি করবে না। তাতে ওদের লাভ নেই।'

'কিন্তু হদিস পেতে আর বাকি কী? কাকাতুয়া তো ওদের হাতে।'

'তা বটে। কিন্তু মজা হল, কাকাতুয়াকে ঠিক প্রশ্নটি না করা গেলে সে কিছুতেই হদিস বলবে না। এই কাকাতুয়াটাকে নিয়ে আমি বহুকাল ধরে চিন্তা করছি। হরিহর পাড়ুই পারেনি, বিশু পারেনি, আপনারাও পারেননি। অনেক ভেবে দেখেছি, পাখিটাকে ঠিক প্রশ্নটি যতক্ষণ করা না হচ্ছে, ততক্ষণ তার মুখ থেকে আসল কথাটি বেরোবে না।'

'প্রশ্নটা তুমি জানো?'

'আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু যারা পাখিটা চুরি করেছে তাদের মাথা অত সাফ নয়। পাখির কাছ থেকে তারা কথা বের করতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। যা করার আমি আর গবাদা মিলে করব।'

'গবা বলছিল, তুমি নাকি সার্কাসের খেলোয়াড়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কথাটা পাঁচকান করবেন না।'

উদ্ধববাবু চোখ বুজে বলেন, 'সব বড়ো গোলমাল ঠেকছে হে। এক সার্কাসের খেলোয়াড় বাড়ির চাকর হয়ে ঢুকল। বাড়ির পুরোনো চাকর ডাকাতের দলে গিয়ে ভিড়ল। ছেলেটা গুম হয়ে গেল। সব বড়ো গোলমাল ঠেকছে।'

নতুন লোকটা মাথা চুলকে বলল, 'আজ্ঞে তা আর বলতে। তবে কিনা আমি লোক খারাপ নই।'

'তা কে জানে বাপু। আমার আর কাউকে বিশ্বাস হয় না। তবু তুমি যখন বলছ তখন একটু নির্ভর করেই দেখি।'

'আমি বলি কী বাবু, আপনি বরং শুয়ে শুয়ে দরবারি কানাড়ার সুরটা গুনগুন করতে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে বড়ো ওষুধ হল গান।'

উদ্ধববাবু কটমট করে লোকটার দিকে চাইলেন। ভালো করে দেখে তার মনে হল লোকটা ঠাট্টা করছে না। তখন খুশি হয়ে বললেন, 'আমার গানের কথা তোমায় কে বলল?'

'কেউ বলেনি। ভালো গাইয়ের গলা কথাবার্তায়ও ফুটে ওঠে। কালে খাঁ সাহেব যখন চাকরকে বকতেন বা রান্নার নিন্দে করতেন, তখনও সমঝদার লোক 'কেয়াবাত, কেয়াবাত' করে উঠত। তা ছাড়া বড়ো গাইয়ের বাড়ির গোরু-কুকুর কি পোষা পাখির গলায় পর্যন্ত সুর এসে যায়। আপনার নেড়ি কুকুরটার গলায় আজ সন্ধে বেলাতেই আমি একটা সাপটা শুনেছি।'

'বলো কী?' উদ্ধববাবু খুবই অবাক ও উত্তেজিত হল।

লোকটা বিনয়ে হেসে হাত কচলে বলল, 'সুর এমনই জিনিস যে, চেপে রাখা যায় না। যার গলায় সুর আছে, সে শত চেষ্টা করেও কোনোদিন বেসুর বের করতে পারবে না গলা থেকে। আপনার যেমন, একটু আগে শুয়ে শুয়ে 'ঃআ ঃউ' করছিলেন, আমি দরজার বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। শুনলাম তার মধ্যেও সুর আছে।'

উদ্ধববাবু এত দুঃখেও হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'সমঝদারই নেই হে দেশে, সমঝদার থাকলে কি আজ আমাকে ওকালতি করে খেতে হত? তা তুমি আমার বাড়িতেই থেকে যাও। সার্কাসের সমান মাইনে দেব। কাজকর্ম কিছুই করতে হবে না। শুধু আমার একটু সেবা-টেবা করবে আর কি।'

'সে হবেখন বাবু। এখন আমি বিদেয় হই। অনেক কাজ বাকি।'

উদ্ধববাবু শুয়ে পড়লেন। সিলিং-এর দিকে চেয়ে খুব সাবধানে গলা ঝেড়ে নিয়ে আবার উঠে বসলেন। বাঁ-হাতে কান চেপে ধরে নিখুঁত দরবারির সুর ধরলেন! তারপর আর

বাইরের শোক-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করল না।

নতুন চাকরটা নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর মৃদু একটা শিস দিল সে। অন্ধকারে আর একটা মূর্তি এগিয়ে এল কাছে। তার দু-হাতে ধরা দুটো সাইকেল। দু-জনে সাইকেলে চেপে এত জোরে ছুটতে লাগল যে, মোটরগাড়িও পাল্লা দিতে পারবে না।

প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা একনাগাড়ে সাইকেল চালিয়ে দু-জনে যখন কাশিমের চরের কাছাকাছি পৌঁছোল তখন এই দুর্দান্ত শীতের রাতেও তারা ঘেমে নেয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই। সামনেই একটা জঙ্গল। মরা নদীর খাত। তারপর আবার জঙ্গল।

ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে সাইকেল লুকিয়ে রেখে দু-জনে এবার পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। দু-জনের মধ্যেই চমৎকার বোঝাপড়া। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না, কিছু জিজ্ঞেস করছে না। যেন আগে থেকে প্ল্যান করা আছে এই অভিযান।

দ্বিতীয় জঙ্গলটায় খানিকদূর ঢুকে দু-জনে থামল। জিরোতে নয়। অন্ধকার কুয়াশামাখা এই রাতে চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। দু-জনে তাই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রাতের শব্দগুলিকে চিনবার চেষ্টা করল। কোন শব্দটা প্রাকৃতিক, কোনটা নয়। সন্দেহজনক কিছুই অবশ্য শুনতে পেল না তারা। তবে এরপর সাবধানে এগোতে লাগল।

সামনেই একটা দুর্গের মতো মস্ত বাড়ির কালো ভূতুড়ে আকারটা জেগে উঠছিল কুয়াশার মধ্যেও। একটা জায়গায় সামনের জন থামল। তারপর আস্তে ডাকল, 'গবাদা।'

'হুঁ।'

'এই হল সেই জায়গা, যেখানে হরিহর খুন হয়। মনে আছে?'

'খুব মনে আছে।'

'আর সামনে ওই সেই বাড়ি।'

'জানি।'

দু-জনে চুপ করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

এবার গবা ডাকল, 'গোবিন্দ।'

'বলো।'

'হরিহরকে খুন হতে আমি দেখেছি। তবে খুনিকে দেখিনি। আর দেখিনি বলেই সাক্ষ্যও দিইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি। সাক্ষ্য দিলে তুই নির্দোষ মানুষ হয়তো খালাস পেতিস।'

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, 'না, গবাদা। খালাস হলেও ওরা আমাকে ছাড়ত না। জেলখানাতেও ওদের লোক আছে। বিরাট দল। ফাঁসিতে না ঝুললেও খুন হতাম।'

দু-জনে বাতাসের মতো ফিসফিস করে কথা বলছিল। এত আস্তে যে, চার হাত দূর থেকেও শোনা যায় না।

গবা আর গোবিন্দ আর একটু এগিয়ে গেল। তারপর গোবিন্দ বলল, 'গবাদা, এইবার।'

গবা গলাটা সাফ করে নিল একটু। তারপর হঠাৎ বেশ চেঁচিয়ে গান ধরল, 'আজ মনটা করে উড়নখুড়ন গা করে আইঢাই। কাশিমের চরে দেখি জনমানব নাই। আছেন শুধু বিজ্ঞপক্ষী আর যতেক ভক্তজন। ইঙ্গিতে কথা কয় পাখি, তা বুঝেছেন ক-জন। আয় রে যত নন্দীভৃঙ্গী, তোদের ডাকে হরিহর। পাখির পেটে কথা করে খচরমচর। আছেন গুরু আছেন জ্ঞান কিন্তু শিষ্য নাই। বিজ্ঞপক্ষী গোমড়া মুখে বসে থাকেন তাই।'

গান শেষ হলে দু-জনে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে। অনেকক্ষণ কেটে যায়।

গোবিন্দ বলে, 'ওরা বোধ হয় এদিকে আসেনি গবাদা।'

গবা হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল তোলে।

কাছেপিঠে জঙ্গলের মধ্যে সড়সড় শব্দ হয় একটু। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে বা কারা আসছে।

২১

দু-জনে নিঃসাড়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে। টের পাচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ নজর করছে তাদের দিকে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও একদম সামনে কেউই এগিয়ে এল না।

'গবাদা।' গোবিন্দ ফিসফিস করে বলল।

'বলে ফেল।'

'ওরা আমাদের মাপজোখ করছে। কাছে আসছে না।'

'তাই তো দেখছি। কিন্তু এই কুয়াশা আর অন্ধকারে মাপজোখটা কীভাবে?'

'সেও তো কথা। আর আমরাই বা উজবুকের মতো লুকিয়ে আছি কেন? ওরা যে খুঁজে পাবে না আমাদের,' বলে গোবিন্দ উঠতে যাচ্ছিল।

গবা হাতটা টেনে ধরে বলল, 'দূর পাগল। অতটা বেপরোয়া হোসনে। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?'

'তুমি গানটা তাহলে আর একবার ধরো! ওরা জবাব দেয় কি না।'

গবা গলা খাঁকারি দিয়ে গান ধরল, 'দানাপানি খায় রে পক্ষী, উড়াল দিতে চায়। তার শিকল করে ঠিনিন বেন্ধে রাখা দায়। এইবার উড়লে পক্ষী আর না পাবে তারে। ধনরত্নের হদিস রবে চির অন্ধকারে। তাই শুন শুন বুদ্ধিমন্ত যতেক ভক্তজন। পাখিরে কওয়াতে কথা এসেছেন দু-জন। অতি শিষ্ট ভদ্র নখদন্ত নাই। দুধুভাতু খাই মোরা ধর্মেরে ডরাই।'

'গবাদা।' এবার বেশ একটু হেঁকেই ডাকল গোবিন্দ।

'বলে ফেল।'

'কই, কারও তো টিকি দেখছি না।'

'এখনও বোধ হয় মাপজোখ করছে।'

'দাঁড়াও। ওদিকে এক বাঁশঝাড়ের কাছে একটা ছায়া মতো দেখছি,' বলে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গেসঙ্গে বাতাসে একটা মৃদু শিসের মতো শব্দ হল। অন্ধকারেও ঝিকিয়ে উঠল একটা বিদ্যুৎগতির বল্লম।

'বাপ রে!' বলে গোবিন্দ বসে পড়ল।

বল্লমটা খচ করে বসে গেল পিছনের একটা গাছে।

'জোর বেঁচে গেছিস।' গবা গোবিন্দকে কাঁটাঝোপ থেকে টেনে তুলতে তুলতে বলে।

'অন্ধকারেও নিশানা দেখেছ? এই টিপ যার-তার হাতের নয়।'

'বকবক করিসনি। এখন চল, উঠে লম্বা দিই।'

গোবিন্দও কথাটায় সায় দিলে বলল, 'তাই চলো। কিন্তু ওরা আমাদের বিশ্বাস করল না কেন বলো তো!'

'সেটাই বুদ্ধির কাজ।'

দু-জনে জঙ্গলের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসতে থাকে।

জঙ্গলের বাইরে এসে গবা একটু হাঁফ ছেড়ে বলে, 'আর যাহোক, তাহোক, আমাদের গান ওদের কানে তো পৌঁছেছে। যদি কাজ হয় তো ওতেই হবে।'

'আমরা কারা তা জানবে কী করে?'

'খোঁজ নেবে। জানা কিছু শক্ত না। একটু বুদ্ধি চাই। সেটা ওদের ভালোই আছে।'

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে গোবিন্দ জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু সাতনার দল আমাকে খড়ের গাদায় পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল কেন বল তো!'

'সে আর বলা শক্ত কী? তোকে মারলে হরিহরের সত্যিকারের খুনি বেঁচে যাবে। তুই যে নির্দোষ তা আর প্রমাণ হবে না।'

'আমাকে হাতে পেলে কি ওরা মেরে ফেলবে গবাদা?'

'চেষ্টা তো করবেই।'

গোবিন্দ আর কিছু বলল না।

গবা বলল, 'রামুটার কথা ভাবছি। কীভাবে রেখেছে ওকে কে জানে! উদ্ধববাবুকে শাসিয়ে গেছে, পাখিচুরির কথা পাঁচকান হলে রামুকে জ্যান্ত রাখবে না। তা সে-কথা তো দুনিয়াসুদ্ধু লোক জেনে গেছে।'

এ-কথায় গোবিন্দ থমকে দাঁড়িয়ে গবার হাত চেপে ধরে বলল, 'গবাদা, ফিরে যাই চলো। আমরা দু-জন হলেও দশ জনের মহড়া নিতে পারি। চলো গিয়ে ওদের ডেরা হুটোপাটা করে দিয়ে রামুকে নিয়ে আসি।'

গবা মাথা নেড়ে একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'উদ্ধববাবু রামুকে খুব শাসন করে বটে, কিন্তু আমি জানি, ওই দুষ্টু ছেলেটাই ওঁর সবচেয়ে প্রিয়পুত্র। যদি কোনো খারাপ খবর পান তাহলে আর বাঁচবেন না।'

'তাহলে?'

'তাহলেও মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করা চাই। সব কাজেই যে বুক চিতিয়ে বোকা সাহস দেখাতে হবে তার কোনে মানে নেই। ছুঁচ হয়ে ঢুকবি, বোমা হয়ে বেরোবি।'

'ঢুকতে দিচ্ছে কোথায়! যা একখানা বল্লম ঝেড়েছিল আজ।'

'রোস না দু-দিন। পাখির মুখ থেকে তো আর আসল কথাটি বেরোচ্ছে না!'

* * *

কাশিমের চর নিজঝুম। হাড়-কাঁপানো শীতে কুয়াশার কম্বল জড়িয়ে গোটা জায়গাটাই ঘুমিয়ে আছে যেন। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক আর প্যাঁচার ভূতুড়ে শব্দ ওঠে ঝোপেঝাড়ে। রাতপাখি ডেকে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। বাঁশবনে ঝিঁঝির ঝিনঝিন। কিন্তু এইসব শব্দ যেন কাশিমের চরের নির্জনতাকেই আরও গাঢ় করে তোলে।

দোতলার একটা ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে মেঝের ওপর চটের বিছানায় রামু শুয়ে আছে। গায়ে একটা কুটকুটে কম্বল, এরকম শুয়ে তার অভ্যাস নেই। মেঝে থেকে চট ভেদ করে পাথুরে ঠান্ডা আসছে। কুটকুটে কম্বল দিয়ে ঢুকছে বাইরের শীত। বারবার তাই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে রামুর। দুষ্টুমি করতে গিয়ে বহুবার বহুরকম বিপদে পড়েছে। দুষ্টু ছেলেরা পড়েই। কিন্তু এরকম বিপদে সে কোনো কালে পড়েনি।

ডাকাতদের এই দলটা বেশ বড়োসড়ো। চেহারাগুলো একদম ভদ্রলোকের মতো নয়। হাতে সবসময়ে লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি, বন্দুক-টন্দুকও আছে। কারও কোনো মায়াদয়া নেই। খেলার মাঠ থেকে ফেরার সময় সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ একটা লোক এসে খবর দিল, 'তোমার বাবাকে কারা যেন পূর্বস্থলির মাঠে মারধোর করে ফেলে রেখে গেছে। শিগগির এসো।'

খবরটা পেয়েই রামু লোকটার পিছু পিছু ছুটল। ক-দিন আগেই উদ্ধববাবুকে আদালত থেকে ফেরার পথে কারা বোমা মেরেছিল। এই সেদিনও বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।সুতরাং লোকটার কথায় রামুর অবিশ্বাস হয়নি। উদ্ধববাবুকে ওরা মারতেও পারে।

পূর্বস্থলির মাঠ শহরের বাইরে। ভারি নির্জন জায়গা। সাঁঝের আবছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। রামু সেখানে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকানোরও সময় পেল না। শিমূল গাছের পেছন থেকে জনাচারেক লোক বেরিয়ে এসে একটা গামছায় তার মুখ বেঁধে ফেলল। তারপর একটা গোরুর গাড়িতে তুলে ফেলল চটপট। অনেক রাতে তারা এসে পৌঁছোয় এই জায়গায়। রামু পরে তাদের কথাবার্তা থেকে জানতে পেরেছে এই জায়গারই নাম কাশিমের চর।

প্রথম রাত্রিটা সারাক্ষণ বাড়ির কথা ভেবে কেঁদেছে রামু। এরা রুটি আর একটা আলুর ঝোল খেতে দিয়েছিল। তা ছোঁয়ওনি সে। কিন্তু সকাল থেকে রামুর চোখের জল শুকিয়ে গেল। একটা দৈত্যের মতো লম্বাচওড়া লোক এসে তাকে প্রথমেই বলল, 'শোনো রামু, তোমার এই দশা। উদ্ধব উকিল বোকাও বটে, জেদিও বটে। কিন্তু সে জানে না, আমার সঙ্গে বিবাদ করলে তাকে নির্বংশ হতে হবে। সে-কাজ শুরু হবে তোমাকে দিয়েই। একটু যদি বেচাল দেখি তবে রামদা দিয়ে দু-খানা করে কেটে ফেলব। এখন যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিকঠাক জবাব দাও। প্রথমে বলো, গবা পাগলা আসলে কে!'

রামু ভয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে বলল, 'গবাদা তো পাগল।'

'ওর পাগলামিটা চালাকি ছাড়া কিছুই নয়। সেটা আমরা জানি। কিন্তু ওর আসল পরিচয়টা আমাদের দরকার।'

'গবাদা কারও কোনো ক্ষতি করে না তো।'

'ক্ষতি যাতে করতে না পারে তার জন্য সাবধান হওয়া ভালো।'

'গবাদার আর কোনো পরিচয় আমি জানি না।'

লোকটা অবশ্য রামুকে এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করেনি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার লোকটা এল। কিন্তু তার সঙ্গে নয়নকাজলকে দেখে রামু হাঁ। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'নয়নদা।' কিন্তু সঙ্গের লোকটা রামুকে একটি ধমক মেরে বলল, 'চোপ'! রামু ভয়ে চুপ করে গেল! নয়নকাজলও রামুর দিকে ভালো করে চাইতে পারছিল না। অন্য দিকে চেয়ে রইল। তার হাতে রামুদের কাকাতুয়ার দাঁড়টা।

দৈত্য লোকটা বলল, 'এই পাখিটা কিছু গোপন খবর জানে। কিন্তু কিছুতেই বলছে না। তোমাদের পোষা পাখি, তোমরা নিশ্চয়ই এর গোপন কথা জানো!'

রামু মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না। পাখিটা গুপ্তধনের কথা বলে বটে, কিন্তু কোথায় তা আছে তা কখনো বলেনি।'

লোকটা বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু তোমার কাজ হল পাখিটার পেট থেকে কথা বের করা। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। যদি তার মধ্যে পারো ভালো, যদি না পারো তবে পাঁচ ঘা করে বেত খাবে রোজ। এই নয়নকাজলও থাকবে পাশের ঘরে। সে নজর রাখবে তুমি কী করছ না-করছ।'

রামু আর নিজেকে সামলাতে না পেরে জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'নয়নদা! তুমিও এদের দলে?'

নয়নকাজল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২২

ঘুম বারবার ভাঙছে রামুর। বড়ো শীত। বিছানাটাও বড্ড শক্ত, কম্বল কুটকুট করছে। জেগে উঠলে সে জঙ্গলের গভীর নিস্তব্ধতা টের পায় আর গা ছমছম করে ওঠে তার। যে-বাড়িটায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে, সেটা বিশাল। তবে প্রায় সবটাই ভেঙে পড়ে গেছে। এখানে-সেখানে এক-আধটা ঘর দাঁড়িয়ে আছে কোনোক্রমে। বাদবাকিটা ইট আর চুন-সুরকির স্তূপ। ডাকাতরা যথাসম্ভব বাড়িটাকে নিজেদের থাকার মতো করে নিয়েছে। তবে রামু জানে এটা ওদের স্থায়ী আড্ডা নয়। একসঙ্গে বেশি লোক এখানে থাকে না। প্রায় সব সময়েই আনাগোনা করে। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। সে-দরজাও পেল্লায় ভারী কাঠের। ঘরখানাও খুবই বড়োসড়ো। মেঝেয় আর দেওয়ালে পঙ্কের কাজ করা। তবে সবই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মেঝেয় ফাটল, দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। দিনের বেলা ঘরটা খুব ভালো করে দেখে নিয়েছে রামু। পালানোর কোনো পথ নেই। আর পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? চারদিকে জঙ্গল। ডাকাতরা চারদিকে নজর রাখছে। ঘুম ভেঙে অন্ধকারে চুপচাপ তাকিয়ে ছিল রামু। শীতে একটু থরথরানি উঠছে শরীরে। কম্বলটা ভালো করে মুড়ি দিয়েও শীত যাচ্ছে না।

হঠাৎ দরজায় একটু শব্দ হল। খুব মৃদু টোকা দেওয়ার মতো শব্দ। রামু কান খাড়া করল। না, ভুল নয়। আবার গোটা দুই টোকা পড়ল।

স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই রামু বুঝল, এই টোকা ডাকাতদের নয়। অন্য কারও কোনো কাণ্ড। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কম্বল মুড়ি দিয়ে দরজার কাছটায় এসে হাঁটু গেড়ে বসে রইল

সে চুপচাপ। খানিকক্ষণ বাদে একটু জোরে টোকা দেওয়ার শব্দ। কে যেন চাপা গলায় ডাকল, 'রামু!'

গলাটা চিনল রামু। বিশ্বাসঘাতক নয়নদা। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হলেও এই শত্রুপুরীতে নয়নকাজলই তার একমাত্র চেনা লোক। এমনিতে একসময়ে নয়নদা রামুকে ভালোও বাসত খুব। পেয়ারার ডাল দিয়ে গুলতি বানিয়ে দিয়েছে, চাবি-পটকা বানাতে শিখিয়েছে, তার টাইফয়েডের সময় ওই নয়নকাজলই লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে সন্দেশ এনে খাইয়েছে।

রামু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দরজার কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'কে, নয়নদা?'

'হ্যাঁ। পাহারাদারটা একটু তফাতে গেছে। বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়েছে। সেই ফাঁকে এলাম।'

'কী চাও?'

'শোনো, এই দরজার বাঁ-দিকের পাল্লায় একটা ফোকর আছে। এমনিতে বোঝা যায় না। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজলে একটা ছোট্ট আলপিনের ডগার মতো জিনিস পাবে। সেটা টানলেই গোলমতো একটা ঢাকনা খোলা যায়।'

'তা দিয়ে বেরোতে পারব?'

'না। বেরোনোর কথা এখন ভেবো না। এরা অত কাঁচা ছেলে নয়।'

'তাহলে ফোকর দিয়ে কী হবে?'

'তোমার জন্য এক গেলাস দুধ এনেছি।'

'তুমি তো জানোই দুধ খেতে আমার ভালো লাগে না।'

'সে জানি। কিন্তু এদের দেওয়া খাবার যে তোমার মুখে রুচছে না, তাও তো দেখছি। এরকম আধপেটা খেয়ে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বে যে। আর এ ট্যালটেলে দুধ নয়। একদম ক্ষীর করা দুধ, সরে ভরতি।'

রামু দরজা হাতড়ে ফোকরটা খুলতে পারল। নয়নদার দেওয়া দুধটা হাত বাড়িয়ে নিলও। মুখে দিয়ে দেখল সত্যিই চমৎকার ক্ষীরের গন্ধ। পুরু সর।

'কী, ভালো?'

'ভালো কিন্তু তুমি তো এদের দলে। তবে আমার জন্য ভাবছ কেন?'

নয়নকাজল একটু চুপ করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কপালের ফের রে ভাই! লোভে পড়ে এদের দলে ভিড়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি প্রাণসংশয়।'

'তার মানে?'

'মানে এরা আমাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না। তোমার মতো আমাকে ঘরে আটকে রাখেনি বটে, কিন্তু এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোরও উপায় নেই। সব গাঁয়ে-গঞ্জে এদের লোক আছে। যেখানে যাব, সেখানেই গিয়ে খুন করে আসবে।'

রামু বলল, 'এরা কি মাফিয়াদের মতো?'

'কে জানে বাপু কাদের মতো। তবে বিরাট দল। শুনেছি জেলখানাতেও নাকি এদের চর আছে। এদের কোনো লোককে পুলিশ ধরলে সে তিন দিনের মধ্যে জেল ভেঙে পালিয়ে আসে।'

'কিন্তু তোমাকে খুন করবে কেন?'

'সেইই তো হয়েছে মুশকিল। একবার এদের দলে ভিড়লে তার আর ছাড়ান-কাটান নেই। তাকে আর এরা কিছুতেই ফিরে যেতে দেয় না। সে ছিল একরকম। কিন্তু ওদিকে আমাকে ডাকাত বলেও স্বীকার করছে না। কোনো বখরা দেবে না, মাইনে দেবে না, চাকরের মতো খাটাচ্ছে।'

'তা তুমি এখন কী করতে চাও?'

নয়নকাজল করুণ স্বরে বলল, 'এ আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত রে ভাই। তাই ভাবছি আমার যা গতি হওয়ার হবে। খামোখা তুমি কষ্ট পাবে কেন? ঠিক করেছি, তোমাকে সুযোগ পেলেই পালানোর পথ করে দেব।'

'পারবে?'

'চেষ্টা তো করব। মুশকিল হয়েছে পাখিটাকে নিয়ে।'

'কী মুশকিল?'

'পাখিটা আসল কথা বলতে চাইছে না। সাতনা তোমাকে বলেছে, পাখিটার পেট থেকে কথা বের করতে না পারলে মেরে ফেলবে। আমি জানি, তুমি তা পারবে না। আর সাতনা সত্যিই তোমাকে খুন করবে।'

'ওই বিশাল চেহারার লোকটার নাম কি সাতনা?'

'হ্যাঁ। ওর দয়ামায়া বলতে কিছু নেই।'

'ও কি দলের সর্দার?'

'আরে না। দলের সর্দার কে, তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। মস্ত দল, চারদিকে অনেক ডালপালা ছড়ানো।'

'আমার বাবাকে একটা খবর দিতে পার না নয়নদা?'

'খবর দেওয়ার দরকার নেই। খবর পেলে তোমার বাবা তোমাকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করবেন। তাতে তোমার বিপদ বাড়বে।'

'অন্তত গবাদাকে যদি একটা খবর দিতে পার।'

'গবা পাগল! সে খবর পেয়ে গেছে। একটু আগে জঙ্গলে একটা লোক গান গাইছিল শুনলে না?'

'না তো!'

'আমি শুনেছি। গবারই গলা। তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না। শুধু মনে রেখো, আমি আছি। মরলে মরব, কিন্তু ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তোমার ক্ষতি হতে দেব না। গেলাসটা দাও, এবার যাই।'

গেলাস নিয়ে নয়নকাজল নিঃশব্দে চলে গেল।

দুধটা খাওয়ার পর শীত একটু কম লাগতে লাগল রামুর। কুটকুটে কম্বল মুড়ি দিয়ে ভরা পেটে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় দরজা খুলে প্রথম যে ঘরে ঢুকল সে সাতনা।

খুরধার চোখে রামুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, 'কাল রাতে গবা পাগলা এখানে হানা দিয়েছিল। কে তাকে এ-জায়গার হদিস দিল জান?'

'আমি কী করে জানব? রামু অবাক হয়ে বলে?'

'তোমাদের চাকর নয়নকাজলকে কাঁটাওলা বেত দিয়ে মার দেওয়া হচ্ছে এখন। আমাদের মনে হচ্ছে, হদিসটা সে-ই দিয়ে এসেছে।'

রামু একটু কেঁপে উঠল ভয়ে। বলল, 'নয়নদা? নয়নদা কী করে খবর দেবে? সেও তো তোমাদের দলে!'

'আমাদের দলে কি না তা এখনও আমরা জানি না। তোমার বাবার উকিলে বুদ্ধি তো কম নয়। হয়তো ওকে চর করে আমাদের দলে ভিড়িয়েছে। যাকগে, সে-সব ভেবে লাভ হবে না। এখন একটা কথা বলো তো!'

'কী কথা?'

'গোবিন্দ কোথায়?'

'কে গোবিন্দ?'

'গোবিন্দকে তুমি ভালোই চেনো। সার্কাসের গোবিন্দমাস্টার।'

'সে কোথায়, তা আমি কী করে জানব?'

'আমাদের সন্দেহ, গোবিন্দ তোমাদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। তাকে অন্য কোথাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।'

রামু কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তাকে তোমরা খুঁজছ কেন?'

'তাঁর মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করা দরকার। তাই খুঁজছি।'

'তুমি এরকম নিষ্ঠুর লোক কেন?'

সাতনা কটমট করে রামুর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু তারপর হঠাৎ যেন কেমন ছাইরঙা হয়ে গেল তার মুখ। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজাটা আঁট করে বন্ধ করে দিল পাহারাদার।

২৩

যুধিষ্ঠিরবাবুর কামাই নেই, রোজ যেমন আসেন, তেমনই আজও পড়াতে এসেছেন।

কিন্তু যাদের পড়াচ্ছেন তাদের পড়ায় মন নেই। রামুর দুই দাদা আর তিন দিদির মুখ ভার, চোখ ছলছল, গোঁজ হয়ে তারা বসে থাকে।

যুধিষ্ঠিরবাবু আজ বইপত্র খুললেন না, টাস্কও দেখলেন না। রামুর সবচেয়ে বড়ো দাদা সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রামুর কোনো খবর এখনও পাওয়া যায়নি, না?'

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমাদের মা জল পর্যন্ত মুখে তুলছে না, বাবার চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে।'

যুধিষ্ঠিরবাবু গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'হুঁ, তা তোমার বাবার সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে?'

'হ্যাঁ। বাবা তো ঘরেই শুয়ে আছেন।'

'আমাকে একটু তাঁর কাছে নিয়ে চলো তো!'

উদ্ধববাবু আর একটা বিনিদ্র রাত কাটিয়ে সকালে উঠেছেন। যন্ত্রের মতো পুজো-আচ্চা সেরে এসে ঘরে শুয়ে পড়েছেন। বুকটা বড়ো কাঁপে আজকাল। মাথায় কত যে চিন্তা!

যুধিষ্ঠিরবাবুকে নিয়ে সোমনাথ ঘরে ঢোকার পর তিনি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসুন যুধিষ্ঠিরবাবু।'

যুধিষ্ঠির বসে বললেন, 'রামুর খবরটা আমি বাইরের লোকের মুখে শুনেছি।'

উদ্ধববাবু কাতর স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বড্ড পাঁচকান হয়ে গেছে। এখন ভয় খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ওরা আমার ছেলেটাকে মেরে-টেরে না ফেলে।'

যুধিষ্ঠির গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি পুলিশকে কি সব কথা জানিয়েছেন?'

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ কুন্দকুসুম সবই জানে, বিচক্ষণ লোক। কিন্তু সেও তো কিছু করতে পারল না।'

যুধিষ্ঠির একটু হেসে বললেন, 'আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন উদ্ধববাবু, সবাই সবকিছু জানে। কিন্তু কাজের বেলা কেউই কিছু করতে পারছে না।'

উদ্ধববাবু বুক কাঁপিয়ে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'করা হয়তো যেত কিন্তু রামুকে আটকে রেখে ওরা আমাদের একেবারে জব্দ করে দিয়েছে। কাল রাতে এসে কুন্দকুসুম বলে গেল কিছু করা সম্ভব নয়। তাহলেই ছেলেটার বিপদ। এই অবস্থায় আমারও মাথায় কিছু খেলছে না।'

যুধিষ্ঠির ভ্রূকুটি কুটিল মুখে বসে রইলেন চুপচাপ। হঠাৎ কুঁজোয় জল নিয়ে বাড়ির চাকরটা ঘরে ঢুকল। যুধিষ্ঠির আনমনে তার দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে ভালো করে তীক্ষ্ণ নজরে দেখলেন লোকটাকে। খুব লম্বা নয়, মজবুত গড়ন, গালে কিছু দাড়ি। তবু তাঁর স্মৃতি চমকে উঠল। যুধিষ্ঠির সোজা হয়ে বসলেন। উদ্ধববাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বুঝি আপনাদের নতুন কাজের লোক?'

'হ্যাঁ। এই তো তিন দিন হল কাজে লেগেছে।'

যুধিষ্ঠির আর কিছু বললেন না। তবে চাকরটা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, 'হুঁ।'

উদ্ধববাবু যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। লোকটা কেমন তা বুঝতে পারছিলেন না। তবে গোপনে শ্রীধরবাবুর কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন। শ্রীধরবাবুর ভাঙা পা এখনও সারেনি। তিনি অবশ্য ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, যুধিষ্ঠির সম্পর্কে চিন্তা করবেন না। অতি উত্তম ছেলে। আমি বহুকাল ধরে চিনি।

উদ্ধববাবু অবশ্য নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। আজকাল তাঁর সকলকেই সন্দেহ হয়। তিনি যুধিষ্ঠিরের মুখের ভাবসাব দেখে সন্দিহান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওকে চেনেন নাকি?'

যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বললেন, 'না বোধ হয়। চেনা চেনা লাগছিল বটে, তবে কত মানুষের সঙ্গে কত মানুষের চেহারার মিল থাকে।'

এই বলে যুধিষ্ঠির উঠলেন। বললেন, 'রামুর ব্যাপারে আমার যদি কিছু করার থাকে তবে আমাকে বলবেন। শত হলেও সে আমার ছাত্র। বলতে কী আমি অমন উজ্জ্বল বুদ্ধিমান ছেলে কমই দেখেছি।'

'বলেন কী?' উদ্ধববাবু অবাক হয়ে বলেন, 'রামু উজ্জ্বল বুদ্ধিমান?'

'ঠিক তাই। দুষ্টুমির স্টেজটা কেটে গেলেই সেটা বোঝা যাবে।'

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

যুধিষ্ঠির সন্তর্পণে বেরিয়ে এলেন। উঠোনের দিকটায় চাকরটা ভেজা কাপড়জামা মেলছে রোদ্দুরে।

যুধিষ্ঠির চাপা স্বরে ডাকলেন, 'ওহে, ও গোবিন্দমাস্টার।'

গোবিন্দ চমকে চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াল। চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

যুধিষ্ঠির একটু হাসলেন। তারপর কাছে গিয়ে বললেন, 'ভয় পেয়ো না। একটু বাইরে নিরিবিলিতে চলো। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

গোবিন্দর চোখের আগুনটা নিভে গেল। বলল, 'আজ্ঞে।'

যুধিষ্ঠির গোবিন্দকে নিয়ে বাইরে এলেন। নিরিবিলি বকুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'আমাকে চিনতে পার?'

গোবিন্দ মুখখানা ভালো করে দেখল। তারপর চাপা স্বরে বলল, 'চিনি। হরিহর পাড়ুইয়ের ছেলে না তুমি?'

যুধিষ্ঠির মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, 'ধরেছ ঠিক। আমার বাবা বড়ো ভালো লোক ছিল না। পদবিটা আজকাল আর ব্যবহার করি না? এখন আমি যুধিষ্ঠির রায়।'

গোবিন্দ কঠিন স্বরে বলল, 'কী চাও? বাপের খুনিকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে?'

যুধিষ্ঠির গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না। আমার বাবা যেসব পাপ করেছিলেন তাতে তাঁর খুন হওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না। তাঁর খুনির ব্যবস্থা সরকার করবে। আমার তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি কোন দলে। কেনই-বা এ-বাড়িতে চাকর সেজে আছ?'

গোবিন্দ খুব তীব্র দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরকে দেখছিল। হরিহরের ছেলে লেখাপড়া শিখেছে বলে জানে। হরিহরও বলত তার ছেলে নাকি তার মতো নয়। গোবিন্দ একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, হরিহরকে আমি খুন করিনি।'

'হতে পারে। এখন আসল কথা বলো। তুমি এখানে কী করছ? চাকর সেজে থাকলেই তো চলবে না। যদি বুঝি তোমার মতলব খারাপ তাহলে উদ্ধববাবুকে তোমার আসল পরিচয়টা আমাকেই দিতে হবে।'

গোবিন্দ একটু হেসে বলল, 'উনি জানেন। আমি রামুর দলে। সাতনার দলের নই।'

যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়ে বললেন, 'সাতনা? সে আবার এর মধ্যে আছে নাকি?'

'আছে। দলের সর্দার না হলেও সে বেশ পাণ্ডা গোছের লোক। আমার ধারণা হরিহরকে সে-ই খুন করেছিল।'

যুধিষ্ঠির একটু আনমনা হয়ে যান। অনেকক্ষণ দূরে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'সাতনা! সাতনাকে আমিও চিনতাম। সে লোক খারাপ ছিল না।'

যুধিষ্ঠির ব্যথিত মুখে মাথা নেড়ে বলেন, 'তার মেয়েটা চুরি যাওয়ার পর থেকেই সে মানুষ থেকে জানোয়ার হয়ে গেল। তা শোনো গোবিন্দমাস্টার, যদি সাতনার দলই রামুকে চুরি করে থাকে তাহলে একটা উপায় হয়তো করা যাবে।'

'তার মানে?'

যুধিষ্ঠির ব্যথিত মুখে বললেন, 'সাতনার মেয়েটাকে চুরি করেছিলেন আমার বাবাই। বাবার কী মতলব ছিল জানি না। হয়তো সাতনার কাছ থেকে কিছু আদায় করা। কিন্তু চুরি করলেও মেয়েটাকে বাবা মেরে ফেলেননি। আমার এক নিঃসন্তান মাসির কাছে রেখে এসেছিলেন। যতদূর জানি মেয়েটা এখনও সেখানেই আছে। যত্নে আছে। সাতনাকে বহুবার খবরটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পারিনি।'

'বলো কী!' গোবিন্দর চোখ কপালে উঠল।

'ঠিকই বলছি। তুমি যদি খবরটা সাতনার কাছে পৌঁছে দিতে পার তাহলে হয়তো কাজ হবে। বলবে রামুকে ফেরত দিলে সে তার মেয়েকে ফেরত পাবে।'

উত্তেজিত গোবিন্দ কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'তোমার মাসির ঠিকানাটা?'

যুধিষ্ঠির মৃদু হেসে বললেন, 'ওটা এখন গোপন থাক। তবে নিশ্চিন্ত থাকো, মেয়েটা আছে। আগে খবরটা সাতনার কাছে পৌঁছে দাও। তারপর যা করার আমিই করব।'

'তোমার কথা কি সাতনাকে বলব?'

'না বলাই ভালো।' যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে বলেন, 'কারণ যে-গুপ্তধনের জন্য তোমরা সবাই হন্যে হয়ে গেছ তার আসল উত্তরাধিকারী আমিই। কিন্তু আমি ওসব দাবি করব না। আমি চাই গুপ্তধনের উদ্ধার হলে তা সরকারের তহবিলে জমা হোক। সাতনা জানে যে আমিই ওই গুপ্তধনের ওয়ারিশ। কাজেই আমি বেঁচে আছি জানলে সে আমাকে খুন করতে চাইবে।'

গোবিন্দ বলে, 'তাহলে কী বলব? সাতনা কি আমাদের কথা বিশ্বাস করবে?'

'করবে। মেয়েটার একটা ছবি আছে আমার কাছে। সেটা ওকে দিয়ো। তাহলে বিশ্বাস করবে।'

২৪

পরের রাতেও নয়নকাজল এল। রামু ভেবেছিল, বেত খেয়ে নয়নকাজলের বুঝি হয়ে গেছে। সে দরজায় শব্দ করল।

রামু উঠে গিয়ে দরজায় মুখ লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'আমি নয়নদা।'

'ঃউ, নয়নদা! তুমি ভালো আছ?'

'ভালো কি আর থাকি? সারা গায়ে কালসিটে, কাঁকালে ব্যাথা, চলতে গেলে মাথা ঘোরে।'

'তোমাকে খুব মেরেছে নয়নদা?'

'খুব। মেরেই ফেলত। কিন্তু পাখিটার মুখ থেকে এখনও কথা বেরোয়নি বলে প্রাণটা আমার রেয়াত করেছে।'

'তুমি পালিয়ে যাচ্ছ না কেন নয়নদা? গিয়ে পুলিশে খবর দাও।'

নয়ন একটু দুঃখের হাসি হেসে বলল, 'পালালে যদি বাঁচতুম রে ভাই, তবে কি আর চেষ্টা করতুম না! আর পুলিশের কথা কী বলব! আমার মতো গরিব-দুঃখী মানুষের কথায় তারা গা করবে না।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় কিছু দেখছি না। নিতান্ত চুনোপুঁটি ভেবে যদি ছেড়ে-টেড়ে দেয়। ভগবান ভরসা। তোমার জন্য আজ আর দুধটুকু আনতে পারিনি।'

'দুধ লাগবে না। শোনো নয়নদা, এদের সর্দার যখন আবার আমার কাছে আসবে, তখন আমি তাকে বলে দেব যেন আর কখনো তোমার গায়ে হাত না দেয়। দিলে আমি পাখির মুখ দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করব না।'

নয়ন একটু অবাক হয়ে বলে, 'সর্দার! সর্দারকে তুমি কোথায় দেখলে?'

'কেন ওই দানবের মতো লোকটা। সাতনা না কী যেন নাম!'

নয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'সাতনা সর্দার-টর্দার নয়। তবে মোড়ল গোছের একজন বটে। আসল সর্দার যে কে, তা এরা নিজেরাও ভালো জানে না। যেই হোক তাঁর অনেক ক্ষমতা। তাকে সবাই যমের মতো ডরায়।'

'তুমি সর্দারকে দেখনি?'

'আমি কেন, এরাও অনেকে দেখেনি। ওসব নিয়ে ভেবো না। সাতনাকে আমার কথা বললে হিতে বিপরীত হবে। এখন ছেড়ে রেখেছে, তুমি কিছু বললে হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে রাখবে।'

'তাহলে বলব না কিন্তু এই যে তুমি আমার কাছে এসেছ, যদি ধরা পড়ে যাও?'

'সে ভয় খুব একটা নেই। তোমার ওপর এরা তেমন কড়া নজর রাখছে না। তুমি ছোটো ছেলে, দরজা ভেঙে পালাতে তো পারবে না, আর পালালেই বা যাবে কোথায়? চারদিকে জঙ্গল।'

'এখন ওরা ক-জন আছে?'

'বেশি নয়। তবে সব সময়েই লোক আনাগোনা করে। বিরাট কাণ্ড। কোদাল গাঁইতি দিয়ে চারদিকে খুব খোঁড়াখুঁড়িও হচ্ছে গুপ্তধনের জন্য।'

'কিছু পেয়েছে?'

'না, পাওয়া বড়ো সহজ নয়।'

'পাখিটা কোথায়?'

'সে খুব ভালো জায়গায় আছে। আমাদের নাগালের বাইরে।'

রামু উত্তেজিত গলায় বলল, 'শোনো নয়নদা, আমাদের যেমন করে হোক, পালাতেই হবে। এখানে থাকলে তুমি বা আমি কেউই হয়তো বেঁচে থাকব না।'

'পালাবে? ও বাবা!'

'ভয় পাচ্ছ কেন? মরার চেয়ে তো পালানো ভালো।'

'তা ভালো কিন্তু . . .'

'কিন্তু-টিন্তু নয়। ভালো করে দেখো, এ-ঘর থেকে বেরোনোর কোনো উপায় আছে কি না।'

'দেখেছি। নেই।'

'ছাদে উঠতে পার?'

'তা পারি।'

'আর একটা দড়ি লাগবে।'

'তাও জোগাড় হবে। কিন্তু অত সাহস ভালো নয়। শুনেই আমার হাত-পা কাঁপছে।'

'শোনো নয়নদা, না পালালেও এরা রেহাই দেবে না। আমাকে যদি নাও মারে, তোমাকে মারবে। কারণ তুমি বড়ো মানুষ, ওদের অনেক গোপন খবর জেনে গেছ। কাজেই তোমার না পালিয়ে উপায় নেই। যদি দু-জনে পালাতে পারি, তবে আমি বাবাকে গিয়ে সব বলব। বাবা পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ কিছু না করে পারবে না। তা ছাড়া গোবিন্দদা আর গবাদা আছে। ওরা ঠিক একটা বুদ্ধি বের করবে।'

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু পালানোর উপায়টা কী ভেবেছ?'

'খুব সোজা। দক্ষিণ দিকে ছাদের কাছে একটা বড়ো ঘুলঘুলি আছে। অবশ্য অনেক উঁচুতে। ঘুলঘুলিতে পাতলা তারের জাল দেওয়া। জালটা পুরোনো হয়ে মরচে পড়ে পচে গেছে। তুমি ছাদে উঠে কার্নিশে ভর দিয়ে ওই ঘুলগুলির ভিতর দিয়ে দড়ি নামিয়ে দেবে। আমি দড়ি ধরে উঠে যাব।'

'পারবে? পড়ে যাবে না তো?'

'না না। আমি গোবিন্দমাস্টারের কাছে অনেক তালিম নিয়েছি। কিন্তু তুমি খুব সাবধান।'

'আজ রাতেই পালাবে নাকি?'

'আজ এক্ষুনি। কাল আবার কী হয় কে জানে।'

'আমার বড়ো ভয় করছে রামু। পুরোনো কার্নিশ ভেঙে যদি পড়ে যাই?'

'কার্নিশ যদি পুরোনো হয় তাহলে ছাদের রেলিং বা শক্ত কিছুতে দড়িটা বেঁধে নিজের কোমরে জড়িয়ে নিয়ো। পড়বে না কিন্তু সাবধান। শব্দ-টব্দ কোরো না।'

'আচ্ছা। কিন্তু পারবে তো রামু?'

'আমি পারব। তোমাকেও পারতে হবে।'

'দেখি তাহলে।' মিনমিন করে এ-কথা বলে চলে গেল নয়ন।

রামু শীত তাড়ানোর জন্য কয়েকটা ডন-বৈঠক করল। স্কিপিং-এর ভঙ্গিতে নেচে মাংসপেশির আড় ভেঙে নিল। গা গরম করে না নিলে হঠাৎ কঠিন পরিশ্রম করতে গিয়ে পেশিতে টান ধরে যায়। গোবিন্দদা তাকে অনেক কটা কসরত শিখিয়েছে। সবই ফ্লোর একসারসাইজ। তার কয়েকটা করে নিল রামু।

তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অন্ধকার ঘরে ঘুলঘুলিটা খুব আবছা দেখা যায়। অনেকটা উঁচুতে। খুব বড়ো ঘুলঘুলি নয় বটে, তবে রামু গলে যেতে পারে। কিন্তু কথা হল, নয়নকাজল পারবে কি না কার্নিশে নামতে। একে ভীতু মানুষ, তার ওপর নয়ন তো আর খেলাধুলো করে না।

ওদিকে নয়ন পড়েছে মুশকিলে। একতলার একটা ঘরে মেলা দড়িদড়া শাবল খন্তা মজুত থাকে। দরজায় তালাও নেই। সে নিঃশব্দে গিয়ে একটা দড়ি বের করে এনেছে বটে, কিন্তু বাকি কাজ করতে ভয়ে তার হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

দালানের মধ্যে তেমন পাহারা নেই। পাহারা আছে বাড়ির চারধারে। কোনো দরজা বা ফটক দিয়ে বেরোনোর উপায় নেই। আর নীচের তলার ঘরে দোর দিয়ে অনেক লোক ঘুমোচ্ছে। দোতলাতে গোটা দুই-তিন ঘরে লোক আছে। সাড়াশব্দ হলে তারা জেগে যেতে পারে।

নয়ন পা টিপে টিপে ছাদে উঠল। আজও কুয়াশা আছে, শীতও সাংঘাতিক। তবে মাঝরাতে একটু চাঁদের উদয় হয়ে থাকবে। অন্ধকারটা তেমন জমাট নয়। একটু ফিকে ভাব। মস্ত ছাদখানা অনেকটা দেখা যাচ্ছে। বিস্তর আজেবাজে জিনিস পড়ে আছে ছাদে। পুরোনো পিপে, পাথরের মূর্তি, ইট, ভাঙা দরজা জানলার কাঠ।

নয়ন ঠাহর করে রামুর ঘরটা কোথায় তা আন্দাজ করল। রেলিং দিয়ে ঝুঁকতে নীচের দিকে মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল তার। এই এত উঁচু থেকে যদি পড়ে যায় তো মাথাটি আস্ত থাকবে না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করল সে।

তারপর চোখ খুলতেই বুকের মধ্যে একটা চড়াই পাখি উড়াল দিল যেন।

সামনে লোক দাঁড়িয়ে।

দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজছিল নয়নের। সে 'বাবা গো' বলে ফের চোখ বুজে ফেলল।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কে তুই?'

'আজ্ঞে আমি দলের লোক।'

'এখানে কী করছিস!'

'আজ্ঞে পাহারা দিচ্ছিলাম।'

লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'ছাদে তো আমার ডিউটি। তুই এলি কোত্থেকে? হাতে দড়িই বা কেন?'

নয়ন একটু সাহস করে বলল, 'যদি কাউকে ধরে ফেলি তো বাঁধতে হবে না?'

'ঃও, তাই বল!' বলে হঠাৎ লোকটা হাসতে হাসতেই ঠাস করে একটা চড় কষাল নয়নের গালে। সেই চড়ে চোখে ফুলঝুরি দেখতে লাগল নয়ন। বাপ রে, কী চড়!

যখন একটু ধাতস্থ হল নয়নকাজল, তখন আবার আত্মারামের খাঁচা ছাড়ার উপক্রম। লোকটা তার কণ্ঠার কাছে বল্লমের চোখা ডগাটা ধরে আছে। যা ধার, তাতে একটু চাপ দিলেই গলা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে। নয়নের বুক ঢিবঢিব করছে, মা কালীর নামটাও স্মরণে আসছে না।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'তোর নাম কী?'

নয়নকাজল জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'ইয়ে মানে-'

সর্বনাশ! নয়নকাজল দেখে নিজের নামটাও তার মনে নেই মোটেই। মাথাটা এত ঘেবড়ে গেছে যে, কোনো কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে না। বাবার নামও নয়, নিজের নামও নয়, কারও নামই নয়। তবে উপায়?

'কী রে?' বলে লোকটা বল্লমটা একটু নাড়ে।

নয়নকাজল চেঁচিয়ে বলে, 'আমার নাম লোক।'

'লোক?' বলে লোকটা অবাক হয়ে পড়ে থাকা নয়নকাজলের দিকে চেয়ে বলে, 'লোক আবার কারও নাম হয় নাকি?'

'কে জানে বাপু। নিজের নামটা আমার মনে পড়ছে না তেমন। মেলা খোঁচাখুঁচি কোরো না, লেগে যাবে।'

'এখানে কী করিস?'

'ডাকাতি। আর কী করার আছে?'

'তুই কেমনধারা ডাকাত? আমার মতো রোগাপটকা লোকের একটা চড় সহ্য করতে পারিস না! কোন আহাম্মক তোকে দলে ভিড়িয়েছে?'

এ-কথায় নয়নের খুব অপমান বোধ হল। লোকটা তেমন রোগাপটকা মোটেই নয়। দিব্যি ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। হাতের চড়টাও বেশ খোলতাই হয়। নয়ন বলল, 'চড়-টড় খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।'

লোকটা হাসল! বলল, 'তা দড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলি? গলায় দড়ি দিতে?'

দড়ির কথায় নয়নের গোটা ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। তাই তো। রামু যে হাঁ করে বসে আছে তার জন্য। আর তো দেরি করা যায় না।

নিজের অবস্থাটা আড়চোখে একটু দেখে নিল নয়ন। খুবই খারাপ অবস্থা। ছাদের ধুলোবালির মধ্যে চিত হয়ে পড়ে আছে সে। তার বুকের দু-দিকে দু-খানা পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা! হাতের বল্লম তার গলায় ঠেকানো। নড়ার সাধ্য নেই।

নয়ন বলল, 'তা গলায় দড়ি দিলেই বা কী? তোমার বল্লমের চেয়ে সেটা কতটা খারাপ হবে?'

'মতলবটা কী ফেঁদেছিলি সেটা খোলসা করে বল তো বাপ। নইলে গেলি।'

নয়ন লক্ষ করছিল, লোকটা তাকে মানুষ বলেই তেমন গ্রাহ্য করছে না। ভাবছে নয়নের পিঁপড়ের প্রাণ, তাই ততটা সাবধানও হচ্ছে না। নয়ন নিজের ডান পাটা একটু তুলল। না, লোকটা লক্ষ করছে না। পা তোলার ঘটনাটা ঘটছে লোকটার পিছন দিকে। সুতরাং নয়ন লোকটাকে পিছন থেকে একটা রাম লাথি কষাতে পারে। ভয় হল, সেই ধাক্কায় লোকটার বল্লম না আবার তার গলায় বিঁধে যায়। তাই লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঝটকায় বল্লমটা সরিয়ে নিতে হবে। তারপর মা কালী ভরসা। নয়ন লোকটাকে অন্যমনস্ক করার জন্য হঠাৎ একটু কঁকিয়ে উঠে বলল, 'আমার পেটে বড়ো ব্যথা। বল্লমটা সরাও।'

লোকটা আবার তার নাটুকে হাসি হেসে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা আর হল না। নয়নের আচমকা লাথিটা লোকটাকে দু-হাত ছিটকে দিল। হুড়মুড় করে লোকটা যেই পড়েছে অমনি নয়ন বল্লমটা বাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। খুন-টুন সে জীবনে করেনি। তাই বল্লমটা লাঠির মতো বাগিয়ে ইচ্ছেমতো ঘা কতক দিল লোকটাকে। লোকটা নেতিয়ে পড়ে রইল চুপচাপ।

নয়নকাজল দড়ি নিয়ে ছাদের একটা মজবুত রেলিংয়ে বেঁধে খানিকটা নিজের কোমরে জড়াল। এখন আর তার আলসে দিয়ে নামতে ভয় করছে না। তার চেয়ে বড়ো ভয় ওই লোকটার যদি চট করে জ্ঞান ফিরে আসে।

দড়ি ধরে একটু ঝুঁকতেই রামুর ঘরের ঘুলঘুলিটা হাতের নাগালে পেয়ে গেল সে। দড়িটা নামিয়ে দিয়ে ডাকল, 'রামু!'

'এই যে!'

'উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি। বাইরে বিপদ।'

রামু গোবিন্দর কাছে কায়দা-কসরত কম শেখেনি ক-দিনে। দড়ি ধরে টপ করে ঝুল খেয়ে উঠে এল ঘুলঘুলিতে। তারপর দড়িটা টেনে নিয়ে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে নেমে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না।

সে যে পালাতে পারে, এটা নিশ্চয়ই কারও মাথায় আসেনি। এলে আরও ভালো পাহারা রাখত। কিন্তু পাহারা নেই। তা বলে পালানোও সহজ নয়। চারদিকে ঘন গাছপালা। নিবিড় জঙ্গল। তারা রাস্তা চেনে না।

'নয়নদা, কোনদিকে যাবে?'

'তাই তো ভাবছি। চলো এগোই যেদিকে হোক। এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।'

'চলো।' বলে রামু এগোতে থাকে।

কিন্তু এগোনো খুবই শক্ত। শীতকাল বলে সাপের ভয় নেই তেমন। কিন্তু লতাপাতায় পা আটকে যায়। হঠাৎ হঠাৎ পাখি ডেকে ওঠে।

দুর্গের মতো বিশাল বাড়িটার চৌহদ্দি বড়ো কমও নয়। খানিকদূর এগোনোর পর সামনে আর একটা ভাঙা দালান। সেই দালানের একটা ঘর থেকে টেমির আলো আসছে বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে।

নয়ন রামুর হাত চেপে ধরে বলল, 'সর্বনাশ! শিগগির অন্য পথে চলো।'

রামু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'যাব, একটু উঁকি দিয়ে যাই।'

'পাগল হয়েছ?'

হঠাৎ কাছে পিঠে একটা ঘোড়া পা দাপিয়ে চিহিঁহিঁ করে ডেকে উঠল। দু-জনেই সেই শব্দে চমকে ওঠে।

'রামু, লক্ষণ ভালো নয়।'

'তুমি চুপ করো তো নয়নদা। অত ঘাবড়ে যাও কেন?'

রামু নিঃসাড়ে গিয়ে জানলার ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। উঁকি মেরে ভিতরে তাকিয়ে তার রক্ত জল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। একটা চৌকির ওপর কম্বলের আসনে বিশাল চেহারার এক কাপালিক বসা। তার মস্ত জটাজূট, বিশাল কালো দাড়ি-গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ধ্যাবড়া টিপ। গায়ে লাল পোশাক। তার সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে সাতনা।

নয়ন ডাকল, 'রামু! পালাও!'

রামু আর দাঁড়াল না, নয়ন আর সে প্রাণপণে দৌড়োতে লাগল।

কতবার যে পড়ল দু-জন, কতবার ফের উঠল, তার হিসেব নেই। গাছের সঙ্গে শতেক বার ধাক্কা খেল। পা-হাত ছড়ে গেল, কপাল ফুলে উঠল। তবু তারা দৌড়োতে থাকে।

খানিকটা দূর দৌড়োবার পরই তারা বুঝতে পারে, পিছনে কারও হাঁকডাক নেই বটে, কিন্তু কেউ তাদের পিছু নিয়েছে ঠিকই। তারা যেদিকে যাচ্ছে, পায়ের একটা শব্দও সেদিকেই তাদের পিছু নিচ্ছে।

'নয়নদা, পিছনে কেউ আসছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

২৬

রামু বলল, 'বড্ড হাঁফিয়ে গেছি।'

নয়ন বলল, 'আমিও। এসো, বসে একটু জিরিয়ে নিই।'

'জিরোবে! কিন্তু কে যে আসছে পিছনে।'

ফিসফিস করে নয়ন বলে, 'আসছে আমাদের পায়ের শব্দ শুনে শুনে। নইলে এই জঙ্গলে আমাদের পিছু নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। যদি বসে থাকি, তবে আমাদের পায়ের শব্দও হবে না, আর লোকটাও খুঁজে পাবে না আমাদের।'

বলতে বলতে নয়ন বসে দম নিতে থাকে। রামুও। পিছনে পায়ের শব্দটাও আর হচ্ছে না।

রামু জিজ্ঞেস করে, 'আমরা কতদূর এসেছি নয়নদা?'

'তা কী করে বলব? এ-জায়গা আমার চেনা নয়। জঙ্গলটাও ভারি জটিল। শুনেছি পুবধারে একটা দুর্ভেদ্য বাঁশবন আছে। সেই বন এত ঘন যে, শেয়ালও গলতে পারে না।'

'আমরা কি সেদিকেই যাচ্ছি?'

'তাও জানি না। আমরা খুব বেশি দূর আসতে পারিনি। ছুটবার সময় ডাকাতদের রাতপাহারার একটা হাঁকডাক শুনতে পেলাম যেন।'

রামু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে চলো, আর একটু দূরে যাই।'

নয়ন তার হাতখানা ধরে বসিয়ে দিয়ে কাহিল গলায় বলল, 'খামোখা হয়রান হয়ে লাভ কী? গোলকধাঁধায় পড়ে আবার হয়তো গিয়ে ডাকাতদের আড্ডায় হাজির হতে হবে। তার চেয়ে বসে থাকো। ভোর হলে আলোয় আলোয় চলে যাব।'

রামু জিজ্ঞেস করে, 'কাপালিকটাকে দেখলে?'

'ভালো করে দেখিনি। যা ভয় পেয়েছিলাম।'

রামু একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'বিশাল চেহারা। হাবভাব দেখে মনে হল সাতনাও ওকে খাতির করে।'

'তা হলে ও হল সাতনার ওপরের সর্দার। এ-দলে কে কোন পোস্টে আছে, তা বলা মুশকিল।'

'তান্ত্রিক কাপালিকরা কি ডাকাত হয়?'

'হতে পারে। তা ছাড়া আসল কাপালিক কি না তাই দেখো, ভেকও থাকতে পারে।'

যেখানে তারা বসে আছে, সে-জায়গাটায় গাছপালা তেমন ঘন নয়। শীতে গাছপালার পাতা ঝরে এমনিতেও একটু হালকা হয়েছে জঙ্গল। অন্ধকারে গাছপালা চেনা যায় না, তবে এখানকার গাছগুলো সবই বড়ো বড়ো। ঝোপঝাড় তেমন নেই। লম্বা ঘাসের জঙ্গল আছে অবশ্য। তারা তেমনি বুকসমান ঘাসের মধ্যেই বসে আছে। হাত বাড়ালে একটা শিশুগাছের গুঁড়ি ছোঁয়া যায়।

হঠাৎ রামু বলল, 'একটা শব্দ পেলে নয়নদা?'

নয়ন একটু শক্ত হয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ একটু একটু পাচ্ছি। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ আসছে।'

রামু বলল, 'আসছে নয়, এসে গেছে। ওঠো, নয়নদা, ছোটো।'

প্রাণের দায়ে নয়ন উঠল। কিন্তু ছুটতে গিয়েই ঘটল বিপদটা। কোত্থেকে একটা খেঁটে লাঠি ছিটকে এসে তার দুই পায়ের মধ্যে একটা ডিগবাজি খেল। তাইতে নয়ন পড়ল উপুড় হয়ে। আর একটা খেঁটে লাঠির পাল্লায় পড়ে রামুও চিতপটাং।

শিশুগাছের পিছন থেকে লোকটা ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এল। হাতে বল্লম। অন্য হাতে নড়া ধরে প্রথমে রামুকে দাঁড় করাল। ছোট্ট একটা চড় তার গালে কষিয়ে গমগমে গলায় বলল, 'পালাতে চাইবে আর? ওই খেঁটে লাঠির ক্ষমতা জান? এককালে ঠ্যাঙাড়ে ঠগিরা ওই দিয়ে দূর থেকে লোককে ঘায়েল করত। ফের যদি পালাও তো পাবড়া দিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেব।'

রামুর অবশ্য পালানোর মতো অবস্থা নয়। চড়টা খেয়ে তার মাথা ঘুরছে। সে উবু হয়ে বসে পড়ল।

নয়নকাজল আর ট্যাঁ-ফো করল না। শোয়া অবস্থাতেই লোকটার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে আর পালাব না।'

লোকটা দু-জনকে পাশাপাশি বসিয়ে নিজেও মুখোমুখি বসল। অন্ধকারে আবছা যা দেখা যায় তাতে বোঝা যাচ্ছে লোকটার বয়স বেশি নয়। হালকা-পলকা চেহারা বটে, কিন্তু গায়ে বেশ জোর রাখে। পরনে মালকোঁচা ধুতি, গায়ে একটা বালাপোশের খাটো কোট, পায়ে নাগরা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পালাচ্ছিলে তোমরা?'

নয়ন মাথা চুলকে বলল, 'ঠিক পালাচ্ছিলাম না।'

'তাহলে কি এত রাতে জঙ্গলে বেড়াতে বেরিয়েছিলে?'

নয়ন একগাল হেসে বলল, 'আজ্ঞে অনেকটা তাই, দিনকাল ভালো নয়। চারদিকে চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাত। তাই চারদিকটায় একটু নজর রাখছিলাম আর কি।'

'এই জঙ্গলে চোর-ছ্যাঁচড় কী করতে আসবে?' লোকটা একটু অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে।

নয়ন বিগলিত হয়ে বলে, 'বলা তো যায় না আজ্ঞে। আমাদের আড্ডায় তো মেলাই দামি জিনিস আছে।'

লোকটা এবার একটু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের একটা আড্ডা আছে নাকি এখানে? তা সে আড্ডাটা কোথায়?'

নয়ন ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ঘন ঘন মাথা চুলকোতে থাকে। রামু বলে, 'কেন, আপনি কি সাতনা ডাকাতের আড্ডা চেনেন না?'

লোকটা এবার উৎসাহে একহাত এগিয়ে আসে। চাপা গলায় বলে, 'আরে আমিও যে সেই আড্ডাটাই খুঁজতে বেরিয়েছি। জায়গাটা কোথায় বলো তো?'

রামু মাথা নেড়ে বলে, 'তা আমরাও জানি না। আমরা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। জঙ্গলের রাস্তা চিনি না। ফিরে যাওয়ার পথ বলতে পারব না।'

লোকটা বলে, 'তোমরা পালিয়ে এসেছ কেন? তোমাদের কি ওরা ধরে রেখেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার নাম কি রামু, উদ্ধববাবুর ছেলে তুমি?'

'হ্যাঁ।' রামু ভয়ে ভয়ে বলে।

লোকটা একটু হাসে। বলে, 'আচ্ছা কাণ্ড যা হোক। আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা ওদের দলেরই লোক।'

'আপনি কে?'

'আমাকে চিনবে না। আমি ডাকাতদের দলে নাম লেখাতে যাচ্ছি।'

নয়ন ফস করে বলে ওঠে, 'সে তো আমিও গিয়েছিলুম। কিন্তু ওরা নতুন লোককে সহজে দলে নেয় না।'

লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'নেবে। এলেমদার লোক দেখলে ঠিকই নেবে। তোমরা যদি কেবল পথটা বাতলে দিতে পারতে তাহলে আমার অনেক হয়রানি কমে যেত।'

নয়ন একটু গুম হয়ে থেকে বলল, 'আপনি কেমন লোক কে জানে। খুব ভালো লোক যে নন তা বোঝাই যাচ্ছে। লোক আমিও ভালো নই। তাই আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমার মনে হচ্ছে এই পশ্চিম দিকে নাক বরাবর এগোলে সেই আড্ডায় পৌঁছে যেতে

পারবেন। তবে সাবধানে, আচমকা বল্লম এসে বুকে বিঁধতে পারে। মাথায় লাঠি পড়তে পারে কিংবা ঘাড়ে রামদায়ের কোপ। ওরা বাইরের লোক পছন্দ করে না।'

লোকটা হেসে বলল, 'কিন্তু তুমি তো ওদের দলের লোক।'

'না, আমি দল ছেড়ে পালাচ্ছি।'

'তাই কি হয়?' বলে লোকটা সাদা দাঁতে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'তোমরা পালালে এত পরিশ্রমই বৃথা যাবে। আমি তোমাদের ধরে আবার সাতনার আস্তানায় নিয়ে যাব। চলো।'

নয়ন ভয়ে আঁতকে উঠে বলে, 'বলেন কী? এই তো গত পরশু সাতনার এক কসাই আমাকে বিষ-বিছুটি দিয়ে ছেড়েছে। আবার সেখানে যাব?'

রামুও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, 'আপনি ডাকাত হতে যাচ্ছেন তো যান না, আমাদের টানছেন কেন?'

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, 'তোমাদের ধরে নিয়ে গেলে সাতনা চট করে আমার ওপর খুশি হয়ে যাবে। তা ছাড়া দলের ঘাঁতঘোঁতও কিছু তোমাদের কাছে জানার আছে আমার। আর দেরি করে লাভ নেই। ওঠো, উঠে পড়ো।'

নয়ন লোকটার পায়ে ধরার চেষ্টা করল। রামুও কাঁদো-কাঁদো হয়ে অনেক কথা বলল। কিন্তু লোকটার নরম হওয়ার নাম নেই। খেঁটে লাঠিদুটো বগলে নিয়ে বল্লম বাগিয়ে সে একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বলল, 'নাকি কান্না বন্ধ করো। তোমাদের এত সহজে ছাড়ছি না।'

অগত্যা বল্লমের মৃদু খোঁচা খেতে খেতে দু-জনে ম্লানমুখে লোকটার আগে আগে পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগল।

বেশি দূর হাঁটতে হল না। আধ-মাইলটাক হাঁটতেই অন্ধকারে বিশাল বাড়িটা দেখা গেল। আর দেখা গেল মশাল হাতে বিশ-ত্রিশজন লোক ছোটাছুটি হাঁকাহাকি করছে।

লোকটা বলল, 'ওই বোধ হয় সেই আড্ডা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। যমদুয়ার।' নয়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

আচমকা পিছন থেকে লোকটা একটা অমানুষিক 'রে-রে-রে-রে' হাঁক ছাড়ল। সে এমন শব্দ যে মাটি কেঁপে ওঠে, গাছপালা নড়তে থাকে, দুর্বল লোকের হৃৎপিণ্ড থেমে যায়। কোনো কথা নয়, শুধু 'রে-রে-রে-রে' শব্দ বজ্রনির্ঘোষের মতো বেজে ওঠে।

সেই শব্দে মশালগুলো স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

২৭

মশালের আলোয় সবার আগে সাত ফুট লম্বা সাতনাকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে। হাতে টাঙ্গি।

ভয় খেয়ে নয়নকাজল রামুর হাত চেপে ধরে বলল, 'আর রক্ষে নেই। দেশে আমার বিধবা মাকে একটা খবর পাঠিয়ে দিয়ো ছোটোদাদাবাবু।'

রামু অত ঘাবড়ায়নি। সে তো জানে কাকাতুয়াটাকে দিয়ে এখনও আসল কথা বলাতে পারেনি এরা।

দলটা কাছে এগিয়ে আসতেই দুটো মুশকো চেহারার লোক এসে খপাখপ রামু আর নয়নকাজলকে ধরে পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

সাতনা গমগমে গলায় লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে রে?'

লোকটা বেশ বুক চিতিয়েই জবাব দিল, 'আমার নাম কিংকর। তুমি কেডা?'

'আমি সাতনা সর্দার।'

'ঃও, তুমিই!' বলে লোকটা একটু হাসল। তারপর বলল, 'তোমার দলেই নাম লেখাতে এসেছি। আমি বর্ধমানের শংকর মাঝির শাকরেদ। নাম শুনেছ?'

'শংকর মাঝি।' সাতনার গলায় রীতিমতো ভক্তিশ্রদ্ধা ফুটে উঠল। ধরা গলায় বলল, 'এ দলে আসবে নাকি?'

'ইচ্ছে তো তাই।' বলে লোকটা জামার বুকপকেট থেকে বের করে সাতনার হাতে দিয়ে বলল, 'এই হল শংকর মাঝির পাঞ্জা। বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া যেখানে খুশি যে-কোনো দলে এই পাঞ্জা দেখালেই লুফে নেবে আমাকে। তবু তোমার দলেই এলাম কেন জান? শুনেছি তোমরা একটা বড়ো দাঁও মারার ফন্দি এঁটেছ। সত্যি নাকি?'

সাতনার মুখটা একটু ব্যাজার হল। বলল, 'সত্যি। তবে হিস্যা নিয়ে বেশি ঝাঁকাঝাঁকি কোরো না। আমাদের হিস্যাদার অনেক।'

সাতনা সর্দার তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শাকরেদদের বলল, 'এ দুটোকে নিয়ে যা।' তারপর লোকটার দিকে ফিরে বলল, 'এদের তুমি পেলে কোথায়? ধরেই বা আনলে কেন?'

লোকটা বলল, 'ওদের মুখেই শুনলুম যে, ওরা তোমার আস্তানা থেকে পালিয়েছে। তাই ভাবলুম যার দলে নাম লেখাতে যাচ্ছি তার একটু উপকার করি গে।'

সাতনা মৃদু হেসে বলে, 'দল আমার নয়। আজ বড়ো সর্দার এখানেই আছে। চলো তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই।'

'চলো।'

শাকরেদরাও ওদিকে রামু আর নয়নকাজলকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। এ-বাড়ির মাটির নীচে গোটাকয় চোরকুঠুরি আছে। তারই দুটোয় দু-জনকে ভরে বাইরে থেকে ঝপাঝপ তালা মেরে দিল।

ভিতরে জমাট অন্ধকার। সোঁদা সোঁদা গন্ধ। হাতে আর মুখে মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে বার বার। রামু বারকয়েক হাঁচি দিল নাক সুড়সুড়ির চোটে। ঘরে কিছু নেই। না বিছানা, চৌকি, না অন্য কোনো আসবাব। পায়ের নীচে শুধু ঠান্ডা মেঝে। তারই ওপর উবু হয়ে বসল সে। হাঁটু দুটো দু-হাতে জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি মেরে শীত তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে ঢুলতে লাগল।

চোরকুঠুরি থেকে কখন ভোর হল তা টেরও পায়নি রামু। একটা লোক এসে দরজা খুলে যখন নড়া ধরে তাকে ছেঁচড়ে বের করে আনল, তখন সে দেখল বাইরে বেশ বেলা হয়ে গেছে।

উঠোনের রোদে একটা দড়ির চারপাইতে বসে কাঁসার মস্ত গেলাসে খেজুর-রস খাচ্ছিল সাতনা। তার সামনে নিয়ে রামুকে খাড়া করা হল।

সাতনা একবার ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে চেয়ে গেলাসটা গলায় উপুড় করে বাড়িয়ে দিল বাঁ-ধারে। গামছায় মুখ বাঁধা একটা হাঁড়ি নিয়ে মাটিতে বসে আছে একটা লোক। সে গেলাসটা তাড়াতাড়ি আবার ভরে এগিয়ে দেয়।

সাতনা রামুর দিকে লালচে চোখে চেয়ে বলে, 'খুব খারাপ কাজ করেছিলে কাল রাতে। তোমার কি জানের পরোয়া নেই? কিংকরের হাতে পড়েছিলে বলে বেঁচে গেছ। নইলে জঙ্গল থেকে বেরোতেও পারতে না, বেঘোরে আমার দলবলের হাতে শিকার হয়ে যেতে।'

রামু কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

আরও কয়েক ঢোক খেজুর-রস খেয়ে সাতনা একটা মস্ত ঢেকুর তুলে বলল, 'তোমাকে এবারের মতো মাপ করে দিলাম। বাচ্চা ছেলেদের ওপর আমার কোনো রাগ নেই। কিন্তু খবর পেয়েছি, তোমার বাবা পুলিশে খবর দিয়েছে। তোমার খোঁজে লোকজনও লাগিয়েছে। কাজটা তোমার বাবা খুব ভালো করেনি। এখন যদি তোমাকে জ্যান্ত রাখি, তবে আমাদের মেলা ঝামেলা। তাই ঠিক হয়েছে তোমার মাথাটা কেটে নিয়ে তোমার বাবার কাছে পাঠানো হবে।'

বলে সাতনা আর এক চুমুক খেজুর-রস খেল। আর রামুর শীত করতে লাগল।

সাতনা ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলল, 'বুঝেছ?'

রামু একটু কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আর নয়নদার কী হবে?'

'নয়ন?' বলে সাতনা অবাক হয়ে রামুর দিকে চেয়ে বলে, 'নয়নের খবরে তোমার কী দরকার হে ছোকরা?'

'নয়নদার কিছু হলে তার বিধবা মা খুব কাঁদবে।'

'সে তো তোমার মা-ও কাঁদবে।'

'আমাকে কেউ ভালোবাসে না। বাবা না, মা না।' বলতে বলতে আজ রামুর চোখে জল এসে গেল। গলাটা এল ধরে।

সাতনা গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েও কেমন থমকে গেল একটু। বারকয় গলা খাঁকারি দিল। হঠাৎ তার মনটা বোধ হয় নরম হয়ে পড়েছিল। সেটা ঝেড়ে ফেলতে একটা বিকট হাঁকাড় দিল, 'নিয়ে যা। নিয়ে যা একে।'

লোকগুলো তাকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পশ্চিম ধারে একটা ঢিবি, তার ওপাশে পচা ডোবায় মস্ত হোগলা বন। ভারি নির্জন জায়গা। ঢিবি পেরিয়ে ডোবার ধারটায় রামুকে নিয়ে এল তারা। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। একদিকে ঢিবি আর অন্যধারে হোগলার বন থাকায় জায়গাটা লোকচক্ষুর আড়ালও বটে। যে দু-জন লোক রামুকে ধরে এনেছে তারা দু-জনেই ভীষণ তাগড়া জোয়ান। কালো চেহারা। মুখে রসকষ নেই। একজনের হাতে ঝকঝকে একটা ভোজালি। একজন রামুকে ধরে হাত দুটো মুচড়ে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে চুল ধরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল সামনের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'এই বয়সে মরণ না ডাকলে কেউ বাঘের ঘরে ঢোকে!'

রামু কোনো ব্যথা টের পাচ্ছিল না। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। গলা তেষ্টায় কাঠ। বুকটা দুঃখে বড়ো ভার হয়ে আছে। মরতে সে ভয় পাচ্ছিল না। শুধু দুঃখ হচ্ছিল কেউ তাকে ভালোবাসে না বলে।

যে লোকটার হাতে ভোজালি সে একটা মসৃণ পাথরের মতো জিনিসে ভোজালিটা বারকয় ঘষে নিয়ে আঙুলে ধার দেখে নিল। তারপর বলল, 'নে, হয়েছে। ভালো করে ধরিস। শেষ সময়টায় বড়ো ঝটকা দেয় কেউ কেউ।'

জলার ধারে যখন এই ঘটনা ঘটছে, তখন একটু দূরে ঈশান কোণে একটা ভাঙা মন্দিরের উঁচু চাতালে দাঁড়িয়ে দু-জন লোক দৃশ্যটা দেখছিল। আসলে দৃশ্যটা খুব মন দিয়ে দেখছিল একজন। সে কিংকর। আর দ্বিতীয় লোকটি অর্থাৎ সাতনা লক্ষ করছিল কিংকরকে।

রামুর ঘাড়ের ওপর উদ্যত ভোজালিতে রোদ ঝিকিয়ে উঠতেই কিংকর আর সহ্য করতে পারল না। হাতের বল্লমটা চোখের পলকে তুলে শাঁ করে ছুড়ে দিল। এত দূর থেকে বল্লম যত জোরেই ছোড়া হোক, তা পৌঁছোনোর কথা নয়। তা ছাড়া নিশানা ঠিক রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কিংকরের জাদু-হাত যেন বল্লমটাকে মন্ত্রপূত করে ছুড়ল। সেটা রোদে ঝিলিক হেনে হাউইয়ের মতো তেড়ে গিয়ে খুনেটার বাঁ-কাঁধে বিঁধে গেল। ভোজালি ফেলে 'বাপ রে' বলে চেঁচিয়ে লোকটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে।

সাতনা এতটুকু চঞ্চল হল না। শুধু প্রকাণ্ড একখানা হাত বাড়িয়ে কিংকরের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলল, 'শাবাশ! বহোত খুব।'

কিংকর এই বাহবায় গলল না। চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'তোমরা ডাকাত না ছুঁচো? কাপুরুষের দল! বাচ্চাদের যারা খুন করে, তারা কখনো মরদ নয়।'

সাতনা একটু হাসল। তারপর মোলায়েম গলায় বলল, 'রামুকে খুন করা হত না হে। তোমাকে একটু পরীক্ষা করার জন্য ওটুকু অভিনয় করতে হল।'

কিংকর ফুঁসে উঠে বলল, 'কীসের পরীক্ষা? তোমাদের মতো চুনোপুঁটির কাছে পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে তেমন ঠাউরেছ নাকি?'

সাতনা ঠান্ডা গলায় বলে, 'আহা চটো কেন ভায়া! তুমি তিন দলের লোক না শত্রুপক্ষের চর তা একটু বাজিয়ে দেখতে হবে না?'

কিংকর চোখ রাঙা করে তেজের গলায় বলল, 'দেখো সাতনা, যতদূর জানি তুমি এ-দলের সামান্য মোড়ল মাত্র। সর্দার তান্ত্রিকবাবা কাল তোমাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না। বেশি ফোপরদালালি করবে তো সোজা সর্দারকে জানিয়ে দেব। আর একটা কথা, তোমার চেহারাটা বড়োসড়ো বটে, ভেবো না বেড়ালের মতো তোমার ন-টা প্রাণ আছে। এ দু-খানা শুধু-হাতে তোমার ওই মোষে গর্দান ভেজা গামছার মতো নিংড়ে মুচড়ে দিতে পারি। কাজেই বুঝে-সমঝে চলো। আমি তোমার পালের মেড়াদের মতো নই।'

সাতনার সঙ্গে এই ভাষায় এবং তেজের ভঙ্গিতে কেউ কথা কওয়ার সাহস পায় না। কিন্তু এই অগ্রাহ্যের ভাব সাতনা মুখ বুজে সয়ে গেল। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি একটা ছেলেকে চিনতাম। তখন তার অল্প বয়স। ইস্কুলে পড়ে। প্রতি বছর ইস্কুলের

স্পোর্টসে ছেলেটা জ্যাভেলিন থ্রোয়ে সেরা প্রাইজ পেত। বর্শা ছুড়ত এমন জোরে যে দেখে তাক লেগে যেত। বেঁচে থাকলে এখন সে তোমার বয়সিই হয়েছে।'

এ-কথা শুনে কিংকর একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তবু তেজের সঙ্গে বলল, 'ওসব এলেবেলে কথা শুনতে চাই না। এবার থেকে কিংকরকে একটু সমঝে চলো।'

দু-জন লোক বল্লম-খাওয়া লোকটাকে ধরাধরি করে চাতালে এনে ফেলল। মুখে জল দেওয়া হচ্ছে, রক্তে ভাসাভাসি কাণ্ড। চোট গুরুতর। তবে কাঁধে লেগেছে বলে প্রাণের ভয় নেই। সাতনার স্যাঙাতরা কটমট করে কিংকরের দিকে তাকাচ্ছে, একটু ইঙ্গিত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা নামিয়ে দেবে।

কিন্তু সাতনা তাদের দিকে তাকাল না। কিংকরকে বলল, 'চলো, ভিতর বাড়িতে যাই। ভয় নেই, রামুকে কেউ এখনই খুন করবে না।'

কিংকর বলল, 'না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ওই বাচ্চা ছেলেটার গায়ে কেউ হাত তুলেছে বলে যদি টের পাই তবে সেই হাত আমি কেটে ফেলে দেব মনে রেখো।'

'বাপ রে!' বলে সাতনা হাসল, 'তুমি যে আমাকে ভয় খাইয়ে দিচ্ছ।'

এ-কথায় কিংকরও হেসে ফেলল। তারপর ভিতরবাড়িতে গিয়ে উঠোনের রোদে দু-জনে দুটো দড়ির চারপাইতে বসে খেজুর-রস খেতে লাগল। কিংকর জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ওই ছেলেটাকে সাতসকালে খুনেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?'

সাতনা প্রথমটায় কথা বলল না। একমনে খেজুর-রস খেয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, 'দেখছিলাম ওই ছেলেটার প্রতি দরদ আছে কি না।'

কিংকর অবাক হয়ে বলল, 'থাকবে না কেন? ডাকাতি করি বলে তো আর অমানুষ নই।'

সাতনা একথায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমাকে যে সেই ছেলেটার কথা বলছিলাম, যে ইস্কুলে জ্যাভেলিন থ্রোতে প্রতিবার ফার্স্ট হত, তার কথা আর একটু শুনবে নাকি?'

কিংকর একটু থতমত খেয়ে বলে, 'তার মানে? তোমার কি মাথার গণ্ডগোল আছে নাকি বাপু? হঠাৎ পুরোনো গপ্পো ফেঁদে বসতে চাইছ কেন?'

'সাধে কি আর চাইছি? গপ্পোটা তোমার জানা দরকার। এমনও তো হতে পারে যে, সেই ছেলেটাই তুমি।'

কিংকর হাতের রসসুদ্ধ ভাঁড়টা হঠাৎ ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ ধকধক করছে, লম্বা শরীরের পেশিগুলো জামার তলায় ঠেলাঠেলি করছে! থমথমে গলায় সে বলে,

'সাতনা, বুঝতে পারছি খামোখা আমাকে ঝামেলায় জড়িয়ে, সকলের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুমি আমাকে দল থেকে হঠাতে চাইছ। কারণ আমি থাকলে এই দলে তোমার জায়গা আমার নীচেই হবে। তাই বলছি, ওসব হীন চক্রান্ত না করে এসো, দু-জনে মরদের মতো ফয়সালা করে নিই কে কত বড়ো ওস্তাদ। হাতিয়ার ধরতে হয় তো ধরো, নইলে খালি হাতে চাও তো তাই হোক। চলে এসো।'

এই চ্যালেঞ্জের জবাবে কিন্তু সাতনা নড়ল না। কেমন একরকম ক্যাবলা চোখে কিছুক্ষণ কিংকরের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'বসো কিংকর। না, তোমার সঙ্গে আমি কাজিয়া করতে চাই না। বসো কথা আছে।'

রাগে ফুলতে ফুলতে কিংকর আবার চারপাইতে বসল।

সাতনা বলল, 'তুমি খুব সাংঘাতিক লোক, মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, তোমারও একটা বই দুটো প্রাণ নেই।'

'তা জানি। ওসব ভয় আমাকে দেখিয়ো না। কিংকরের একটাই জান বটে, কিন্তু সেটা মরদের জান। তোমার জান নয়। আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ো না।'

এতেও উত্তেজিত হল না সাতনা। শান্ত গলায় বলল, 'তোমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই জানি। সে-চেষ্টা করছি না। শুধু জানতে চাইছি তুমি এ-দলে ঢুকলে কেন? তোমার মতলবখানা কী?'

'সে যাই হোক, সর্দার বুঝবে। তুমি তোমার মতো থাকো।'

সাতনা মাথা নেড়ে বলে, 'তা থাকতে পারছি কই? তুমি কথায় কথায় আমাকে শাসাচ্ছ, লড়তে চাইছ। তার মানে ছুতোনাতায় আমার সঙ্গে তোমার লাগবেই। তাই মনে হয় তুমি আমাকে ভালো চোখে দেখতে পারছ না।'

কিংকর গম্ভীর গলায় বলে, 'ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করলে ভালো চোখে দেখতে বাধা কী?'

সাতনা বলে, 'বাধা আছে। তোমার বাধা আছে। আমার সব কিছু মনে থাকে। মানুষের মুখ আমি সহজে ভুলি না।'

কিংকরের মুখটা আবার হিংস্র হয়ে ওঠে।

সাতনা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'কিছু বলতে হবে না। আমি মরদ কি না সে-পরিচয় যথাসময়ে পাবে। এখন খ্যামা দাও। শুধু মনে রেখো সাতনার দশজোড়া চোখ সব জায়গায় তোমাকে নজরে রাখবে। দশজোড়া হাত তৈরি থাকবে। এক চুল বেয়াদবি দেখলে, চোখের একটা ইশারা করব, সঙ্গেসঙ্গে তোমার মুণ্ডু খসে পড়বে।'

কিংকর ঝাঁকুনি মেরে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবিকই পিছন থেকে আচমকা দশখানা বল্লমের তীক্ষ্ণ ডগা পিঠ আর কোমর স্পর্শ করল। কিংকর উঠল না। কিন্তু একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'খুব মরদ।'

সাতনা খুব বড়ো একটা শ্বাস টেনে বলল, 'তোমার সাহস আছে বটে।'

২৯

কোনো কথা না বলে দু-খানা তীক্ষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ কিংকরকে দেখল সাতনা। তারপর বলল, 'তোমার বড্ড ঝাঁজ হে। ঝাঁজালো লোক আমি পছন্দ করি বটে, তবে বেশি ঝাঁজ ভালো নয়।'

কিংকর কথা বলল না। কটমট করে তাকিয়ে রইল। সাতনা একটা হাঁক দিলে এক স্যাঙাত দৌড়ে আসে। সাতনা তাকে বলে, 'যা, রামুকে ধরে নিয়ে আয়।'

কিংকরের পিছনে দশখানা বল্লম উঁচিয়ে আছে। সে অবশ্য গ্রাহ্য করল না। একমনে খেজুর-রস খায় আর মাঝে মাঝে সাতনার দিকে আগুনপারা চোখ করে চায়।

একটু বাদেই নড়া ধরে রামুকে নিয়ে এল সাতনার স্যাঙাত। অল্প সময়ের মধ্যেই রামুর মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখে আতঙ্ক। তাকে দেখে কিংকর সাতনার ওপর রাগে দাঁতে দাঁত পিষল।

সাতনা কিংকরকেই লক্ষ করছিল। একটু হেসে বলল, 'রাগ কোরো না হে। মায়াদয়া করলে আমাদের চলে না। ওহে রামু, এই লোকটাকে চেনো?'

রামু দিশাহারার মতো চারদিকে চেয়ে দেখল। তারপর কিংকরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিনি। এই লোকটাই কাল রাতে আমাদের ধরে এনেছে।'

সাতনা মাথা নেড়ে বলে, 'সে তো জানি। সে-কথা নয়। লোকটাকে আগে থেকে চেনো কি না ভালো করে দেখে বলো তো।'

রামু ভালো করেই দেখল। আবছা আবছা একটা চেনা মানুষের আদল আসে বটে, কিন্তু সঠিক চিনতে পারল না। মাথা নেড়ে সে বলল, 'চিনি না।'

'খুব ভালো করে দেখলে চিনতে পারতে কিন্তু। অবিশ্যি তোমার দোষ নেই। এই লোকটা হরবোলা। একসময়ে সার্কাসে হরেকরকম পাখি আর জানোয়ারের ডাক নকল করত। যেকোনো মানুষের গলা একবার শুনে হুবহু সেই গলায় কইতে পারে। সুতরাং গলা শুনে একে চিনবে না। আর চেহারা? যে-চেহারাটা এখন দেখছ সেইটেও এর আসল চেহারা নয়,

তবে অনেকটা কাছাকাছি। দরকার শুধু থিয়েটারের সং সাজার কয়েকটা জিনিস। তাহলেই হাঃ হাঃ হাঃ ঃহ . . .'

সাতনা হাসতে হাসতে বেদম হয়ে পড়ল।

কিংকর স্থির চোখেই সাতনার দিকে চেয়ে ছিল। কথা বলল না।

সাতনা হাসি থামিয়ে কিংকরের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার অনেক গুণ। এত গুণ খামোখা নষ্ট করলে হে।'

কিংকর একটু হেসে বলে, 'তোমারও অনেক গুণ। সেইসব গুণ তুমিও অকাজে নষ্ট করলে সাতনা। তবে বলি তোমার ক্ষতি করতে আমার আসা নয়। আমি তোমাকে দুটি কথা বলব। বেশ মন দিয়ে শোনো।'

সাতনা হাসি থামিয়ে বেশ গম্ভীর মুখ করে কিংকরের দিকে চাইল। তারপর বলল, 'শুধু গুল মেরে এই জাল কেটে বেরোতে পারবে না। কাজেই বলার আগে ভেবেচিন্তে নাও, যা বলবে তা সত্যি কি না।'

'আমি যা বলব তা সত্যি। তবে এত লোকের সামনে বলা যাবে না। কথাটা বড়ো গোপন।'

সাতনা পাহাড় প্রমাণ শরীরটা টান করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে। চোরকুঠুরিতে চলো। তবে তোমার হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা থাকবে।'

'ঠিক আছে। তাই-ই সই।'

'সার্কাসে তুমি হাতকড়া খোলার খেলা দেখাতে! আমার সব মনে আছে। কিন্তু এখন চালাকি করে হাতের দড়ি খুলতে যেয়ো না আমার কাছে রিভলবার আছে। মনে রেখো।'

দুটো লোক এসে কিংকরের হাত পিছমোড়া দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর সাতনা আর কিংকর গিয়ে ঢুকল চোরকুঠুরিতে।

কিংকরকে দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে মুখোমুখি বসল সাতনা। হাতে সত্যিই ছ-ঘরা রিভলবার। বসে বলল, 'যা বলার চটপট বলে ফেলো।'

'আমি কাকাতুয়াটাকে দিয়ে কথা বলাতে পারি।'

'পার? বটে?' সাতনা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

কিংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'পারি। অনেক ভেবেচিন্তে কায়দাটা বের করেছি। কিন্তু পাখিটা কথা বললে তোমরা সেই গুপ্তধন বের করবে। অথচ ওই গুপ্তধন তোমাদের

পাওনা নয়। আইন বলে, যত গুপ্তধন পাওয়া যাবে তার সবই গভর্মেন্টের। কিন্তু তোমরা গভর্মেন্টকে এক পয়সাও দেবে না।'

সাতনা জলদগম্ভীর স্বরে বলে, 'শুধু এই কথা?'

'না। আরও আছে। গোবিন্দ ওস্তাদকে চেনো। বেচারা মিথ্যে খুনের মামলায় ফেঁসে গেছে। অথচ তা উচিত নয়। আসল খুনির উচিত নিজের দোষ স্বীকার করে নির্দোষ লোকটাকে খালাস করে দেওয়া।'

সাতনার মুখ ফেটে পড়ছিল দুর্দান্ত রাগে। খুব কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল, 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। আর একটা কথা। তোমার যে-মেয়েটা হারিয়ে গিয়েছিল, আমি তার সন্ধান জানি। সে যে তোমারই মেয়ে তার প্রমাণও দিতে পারি।'

আস্তে আস্তে, খুব আস্তে আস্তে সাতনার মুখে একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। কর্কশ, নিষ্ঠুর ভয়ংকর মুখখানা যেন কোমল হতে লাগল। চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। একটা দমকা শ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট গলায় সে বলল, 'মিথ্যে কথা!' একটু থেমে আবার বলল, 'মিথ্যে কথা! তুই আমাকে ভোলাতে এসেছিস!'

'না সাতনা, তোমাকে ভোলানোর ক্ষমতা আমার নেই। এই দেখো-' বলে পিছন থেকে ডান হাত বের করে কিংকর তার বালাপোশের কোটের ভিতর দিকে হাত ভরে একখানা ফোটো বের করে আনল।

সাতনা হাঁ করে চেয়ে দৃশ্যটা দেখে বলল, 'হাত খুলে ফেলেছ! তোমাকে বলেছিলাম না চালাকি করার চেষ্টা করলে-'

কিংকর অমায়িক একটু হেসে বলে, 'আমার হাত কিছুতেই বাঁধা থাকতে পারে

না, বুঝলে! আপনা থেকে খুলে বেরিয়ে আসে। যাকগে, আবার নাহয় বাঁধতে বলে

দাও।'

সাতনা জানে, সে-চেষ্টা বৃথা। হাত বাড়িয়ে সে ফোটোটা নেয়। অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থাকে ফটোটার দিকে। চোরকুঠুরিতে শুধু একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে আসা আলোতেও ফটোর মেয়েটির মুখ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় সাতনা। তার মেয়ে চুরি যায় পাঁচ-ছ বছর বয়সে। এই মেয়েটির বয়স তেরো-চোদ্দো বছর। কী হুবহু মিল। তার মেয়েটা বেঁচে থাকলেও এই বয়সিই হওয়ার কথা। সে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কতদিন আগেকার ফটো?'

'গত বছরের। তোমার মেয়ের বয়স এখন চোদ্দো বা পনেরো।'

'আর কোনো প্রমাণ আছে?'

'আছে। তবে তা দিয়ে আর তোমার দরকার কী? আমার কথা বিশ্বাস করতে পার। এ তোমারই মেয়ে এবং সে বহাল তবিয়তে বেঁচেও আছে।'

সাতনা ভালো করে কথা বলতে পারছিল না, বারবার ঢোঁক গিলছে। চোখে জল আসছে। অত বড়ো সা-জোয়ান লোকটার হাত দুটো কাঁপছে থরথর করে। সে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মেয়ে কোথায়?'

'সেইটে এখন বলতে পারছি না।'

'বলো!' বলে সাতনা প্রকাণ্ড দুটো হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল কিংকরকে। একটা রামঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'শিগগির বলো। নইলে মেরে ফেলব।'

কিংকর নিজের শরীরটাকে একটু মোচড় দিয়ে সরে গেল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে হাতটা তুলে সাতনার ঘাড়ে হাতের চেটোর ধার দিয়ে একটা কোপ মারল।

'আঁক' করে একটা শব্দ হল শুধু। তারপর হাতির মতো বিশাল শরীর নিয়ে সাতনা ঢলে পড়ল মেঝের ওপর।

কিংকর ঘরের কোণে একটা জলের কুঁজো অনেকক্ষণ আগেই লক্ষ করেছে। এখন সেইটে তুলে এনে সাতনার চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে লাগল।

একটু বাদেই চোখ মেলে উঠে বসল সাতনা।

কিন্তু এ এক অন্য সাতনা।

৩০

ধীর গম্ভীর স্বরে সাতনা বলল, 'যে-হাত আমার গায়ে তুলেছ, সে-হাত তোমার শরীর থেকে কেটে ফেলা হবে।'

কিন্তু সাতনা মুখে যা-ই বলুক, আর তার সেই ভয়ংকরতাও নেই। মুখটা কেমন ভোঁতা দেখাচ্ছে। চোখে একটা দিশেহারা ভাব। কিংকর একটু হেসে বলল, 'ভয় দেখাচ্ছ নাকি? তোমার আমার জীবন যেরকম, যাতে কাউকে কারও ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। খামোকা চোখ রাঙিয়ে নিজের কাছে নিজেই হাস্যাস্পদ হচ্ছ। ভয় খাওয়ার হলে এতক্ষণে খেতাম।'

সাতনাও সেটা ভালোরকম টের পাচ্ছে। কিংকর কিছুতেই ভয় পাচ্ছে না। তাই সাতনা খানিকটা চুপসে গিয়ে বলল, 'আমার মেয়ের ছবি যদি খাঁটি হয়ে থাকে, যদি জালজোচ্চুরি না করে থাক তবে এ-যাত্রায় তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে। এখন বলো, আমার মেয়ে কোথায়।'

কিংকরের মুখ থেকে এখনও হাসি মুছে যায়নি। সে মাথা নেড়ে বলল, 'ধীরে বন্ধু, ধীরে। অত তাড়া কীসের? তোমার শরীরে যে একটু নামমাত্র মায়াদয়া এখনও অবশিষ্ট

আছে, তা ওই মেয়েটির জন্য, তা জানি। কিন্তু আমারও শর্ত আছে।'

সাতনা থমথমে মুখে বলল, 'সেটা না-বোঝার মতো বোকা আমি নই। শর্তটা কী তা বলে ফেলো।'

'এক, দলের যে মাথা, তার নাম আমাকে বলতে হবে।'

'তার নাম জেনে কী হবে? ধরিয়ে দেবে?'

'সেটা পরে ঠিক করব। আগে নামটা তো জানি।'

'আর কোনো শর্ত আছে?'

'আছে। তোমাকে দল ছাড়তে হবে।'

সাতনা একটু ম্লান হেসে মাথা নাড়ল। 'তোমার শর্তগুলো শুনতে ভালো কিন্তু কাজের নয়। প্রথম কথা, দলের বড়ো সর্দারের নাম আমারও জানা নেই। দু-নম্বর কথা হল, দল ছাড়া অসম্ভব। এ-দলে ঢোকা যায়, বেরোনো যায় না।'

কিংকর হাসিমুখে বলল, 'আমার তিন নম্বর শর্ত হল, কোনো নির্দোষকে সাজা দেওয়া উচিত নয়। তাই বেচারা গোবিন্দ মাস্টারকে খালাস করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

সাতনা মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'যদি এর কোনো শর্তই না মানি?'

কিংকর এবার হাসল না। মৃদু স্বরে বলল, 'তোমার যে-মেয়ে যাওয়ার পর তুমি মানুষ থেকে পশু হয়েছ, সেই মেয়ের খোঁজ জীবনেও পাবে না।'

সাতনা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কিংকরের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কেমন ভ্যাবলার মতো বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, 'রাত দুটোর সময় আবার এই চোরকুঠুরিতে এসো। কথা হবে।'

'কিন্তু বাইরে যে-সব যমদূত মোতায়েন আছে তারা আবার পিছু নেবে না তো?'

'বারণ করে দিচ্ছি। এখন তুমি স্বাধীন।'

দু-জনে বেরিয়ে এল।

সাতনার মাথা নীচু। ভাবছে। মাঝে মাঝে হারানো মেয়েটার কথা ভেবে চোখে জল আসছে তার। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছছে মাঝে মাঝে, সাতনার চোখে জল! ব্যাপারটা তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না।

এই কিংকর নামে লোকটা কে, তা ভেবে সারাদিন রামুর মাথা গরম। গতকাল রাতে জঙ্গলের অন্ধকারে প্রথম দেখা! লোকটা তাদের ধরিয়ে দিল। কিন্তু আজ সকালে আবার

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাল। সাতনা যখন তাকে ডাকিয়ে নিয়ে লোকটাকে চিনতে পারে কি না জিজ্ঞেস করল, তখন তার স্পষ্টই মনে হল, সে কিংকরকে চেনে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না, কোথায় দেখেছে বা কবে।

আজ সকালেই ডাকাতরা তার গলা কাটতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আজই আবার কী মন্ত্রে যেন তারা ভারি সদয় হয়েছে তার ওপর! সকাল থেকে কিছু খেতে দেয়নি। কিন্তু বেলা দশটা নাগাদ একজন নরম-সরম চেহারার ডাকাত এসে জামবাটি-ভরা সর-ঘন দুধ কলা আর নতুন গুড় দিয়ে মাখা চিড়ের ফলার খাওয়াল। তারপর ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'যাও খোকা, ঘুরে-টুরে বেড়াও গিয়ে। তোমাকে আর ঘরে আটকে রাখার হুকুম নেই।'

রামু বেরিয়ে এল। চারদিকে আলো আর গাছপালা। মুক্ত বাতাস। বুক ভরে শ্বাস টানল সে। ডাকাতরা কেন সদয় হয়েছে তা বুঝতে পারল না।

ছেড়ে দিলেও রামুর পিছু পিছু ছায়ার মতো একজন পাহারাদার রেখেছে এরা। ভাঙা প্রকাণ্ড বাড়িটার সব জায়গায় যাওয়া বারণ। লোকটা মাঝে মাঝে পিছন থেকে সাবধান করে দিচ্ছে, 'ওদিকে যেয়ো না খোকা। না না, ওই কুঠুরিতে উঁকি মেরো না।'

ঘুরতে ঘুরতে নয়নদার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল রামুর। নয়নকাজল দিব্যি হাসিমুখে পিছন দিককার একটা বাগানে রোদে বসে গায়ে সর্ষের তেল মালিশ করতে করতে একজন রোগাপটকা পশ্চিমা ডাকাতের সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে কথা বলছিল। 'ছাপরা জিলা হাম খুব চিনতা। ওদিকে খুব ভালো দুধ মিলতা।'

রামু চেঁচিয়ে ডাকল, 'নয়নদা।'

নয়ন একগাল হেসে বলল, 'তোমাকেও ছেড়ে দিয়েছে? যাক বাবা! আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

রামু কাছে গিয়ে বসে একটু নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, কিংকর লোকটা কে বলো তো!'

নয়ন নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'সাংঘাতিক ডাকাত। এ সাতনার চেয়েও ভয়ংকর।'

'তা তো বটে, কিন্তু তোমার চেনা চেনা লাগছে না?'

নয়নকাজল একটু ভেবে বলল, 'তুমি কথাটা বললে বলেই বলছি, আমারও মনে ওরকম একটা ভাব হয়েছিল। লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি। তারপর ভাবলাম, দেখলেও সে-কথা মনে না-রাখাই ভালো। লোকটা এক নম্বরের বিশ্বাসঘাতক। আমাদের কাল রাতে ধরিয়ে দিল। আর একটু হলেই পালাতে পারতাম।'

রামু বিষণ্ণ মুখে বলে, 'পালিয়ে লাভটা কী হত? বাড়ি গিয়েও তো রক্ষা পেতাম না। তুমিও না, আমিও না।'

নয়ন চিন্তিত মুখে বলে, 'তা বটে।'

'লোকটা হয়তো আমাদের ভালোর জন্যই ধরিয়ে দিয়েছে। হয়তো এর পিছনে কোনো কারণ আছে। লোকটা জানত, পালিয়েও আমরা বেশিদূর যেতে পারব না। গেলেও বাঁচব না এদের হাত থেকে।'

নয়ন খুব মিনমিন করে বলল, 'আমি অত ভেবে দেখিনি। কিন্তু এখন তুমি বলার পর দেখো ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে নয়নদা, কিংকর লোকটা আমাদের শত্রু নয়।'

'না হলেই ভালো। ওরকম লোক যার শত্রু হবে, তার অনেক বিপদ।'

দুপুরে স্নান করে রামু আর নয়ন একটা ছোটোখাটো ভোজ খেল আজ। নতুন একটা ঘরে খড়ের ওপর পাতা নরম বিছানায় দু-জনে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিল অনেকক্ষণ। কাল রাতে অনিদ্রা গেছে। যখন উঠল, তখন বেলা ফুরিয়ে এসেছে। রামু দেখল তার বালিশের পাশে একটা ছোট্ট চিরকুট এক টুকরো পাথর চাপা দেওয়া। তাতে লেখা, 'আজ রাতে সজাগ থেকো।'

আশা আর ভরসায় রামুর বুক ভরে উঠল। সে নয়নকাজলকে ঠেলে তুলে দিল। তারপর চিরকুটটা দেখিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় এটাও সেই কিংকরের কাজ।'

ঠিক রাত দুটোয় সাতনা চোরকুঠুরিতে হাজির হল। সারাদিন কেঁদে কেঁদে তার চোখ লাল। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে কিছুটা। বেশ নড়বড়ে আর বুড়ো দেখাচ্ছে দানবের মতো লোকটাকে।

চোরকুঠুরিতে কোনো আলো নেই। জমাট অন্ধকার। কিন্তু সাতনা মৃদু একটু শ্বাসের শব্দ শুনে বুঝল, কিংকরও হাজির।

গলা খাঁকারি দিয়ে সাতনা ডাকে, 'কিংকর।'

'বলো।'

'এখানে নয়। বড়ো সর্দারের হাজারটা চোখ হাজারটা কান। চলো, জঙ্গলের দিকে যাই।'

'তাহলে চলো।'

দু-জনে নিশব্দে বেরিয়ে পড়ে। তারপর আগে সাতনা এবং তার পিছনে কিংকর ছায়ার মতো জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে।

নিস্তব্ধ জঙ্গলাকীর্ণ একটা জায়গায় এসে দু-জনে দাঁড়ায়।

সাতনা বলে, 'আমি রাজি।'

'ভালো করে ভেবে বলো।'

'ভেবেই বলছি। দুনিয়ায় ওই মেয়েটা ছাড়া আমার কেউ নেই। মেয়েটা চুরি যাওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমার মাথায় খুন চেপেছিল। সার্কাস ছেড়ে ডাকাতের দলে নাম লিখিয়েছিলাম। আজ সারাদিন ভেবে দেখলাম, মরতে একদিন হবেই। তার আগে যদি সুযোগ পাই, মেয়েটার একটা হিল্লে করে দিয়ে যাই। একবার তাকে চোখের দেখাও তো দেখতে পাব।'

'তা পাবে।'

'যখন ছোট্টটি ছিল, তখন সারাদিন আমার বুকের সঙ্গে লেগে থাকত মেয়েটা। মা-মরা মেয়ে। তাকে বুকে করে সার্কাসের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরতাম। মেয়েটাই ছিল আমার জীবন, আমার শ্বাসের বাতাস আমার নয়নের মণি।'

'জানি সাতনা।'

'সকলেই জানত। জানত, সাতনার মেয়েই সাতনার সর্বস্ব।'

'এবার বড়ো সর্দারের নামটা বলো সাতনা।' সাতনা একটু চমকে উঠল।

৩১

সাতনার মতো ডাকাবুকো লোককে আঁতকে উঠতে দেখে একটু হাসল কিংকর। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ভয় পাচ্ছ?'

সাতনা চারদিকে ভালো করে চেয়ে দেখল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'পাচ্ছি। আমার আয়ু আর বেশিদিন নয়। আজ অবধি সর্দারের চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারেনি। আমিও পারব না। তবু জেনেশুনে যে হাঁড়িকাঠে গলা দিচ্ছি, তার কারণ আমার কাছে আর নিজের প্রাণের দাম নেই। শুধু একটাই সাধ। মরার আগে যেন মেয়েটার মুখ একবার দেখে যেতে পারি।'

কিংকর এ-কথার জবাব দিল না চট করে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'তোমার কি ধারণা, সর্দার তোমার ওপর নজর রাখছে?'

সাতনা মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না। কিন্তু মনে মনে যেই ঠিক করেছি যে, সর্দারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব, তখনই মনে ভয়টা এল। কোন মানুষের মনে কী আছে তা সর্দার মুখ দেখলেই টের পায়।'

কিংকর মৃদুস্বরে বলল, 'মানুষের মুখে যে তার মনের কথা লেখা থাকে। সর্দার তো আর অন্তর্যামী ভগবান নয়, সে শুধু তোমাদের চেয়ে আর এক ডিগ্রি বেশি চালাক। এ-লাইনে আমার গুরু হল শংকর মাঝি। সে তোমাদের মতো নোংরা ডাকাত নয়। টাকা-পয়সা সোনাদানায় লোভ নেই। সারাদিন জপ-তপ নাম-ধ্যান নিয়ে থাকে। লোকের ওপর কখনো খামোখা হামলা করে না। শুধু অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়ায়। লোভ-লালসা নেই বলে তার মনটাও পরিষ্কার। চোখটাও পরিষ্কার। তোমাদের সর্দারের চেয়ে লোকের মন বোঝবার ক্ষমতাও তার বেশি। শংকর মাঝি একবার আমাকে বলেছিল, পাপী তাপী খুনে গুন্ডা বা বদমাশদের ফাঁসিকাঠে ঝোলালে বা জেলে ভরে রাখলেই কি আর তাদের ঠিক ঠিক সাজা হয় রে? লোকটার মনে অনুতাপ জাগাতে পারলে বরং সেইটেই ঠিক শাস্তি। একটা ডাকাতকে যদি ভালো করে তুলতে পারিস তবে দেখবি তার মতো মানুষই হয় না।'

সাতনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি শংকর মাঝির দলে কতদিন ছিলে?'

'বছর-দুই। তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি।'

সাতনা একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে, 'অনেক কিছু শিখেছ বটে, কিন্তু আগুন নিয়ে এই খেলাটা না খেললেও পারতে। আমার মেয়ের খবর এনে আমাকে দুর্বল করে ফেলেছ, কিন্তু তা বলে তো আর বড়ো সর্দারের মন গলবে না। তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর মন্ত্রটা কে তোমাকে এখন শেখাবে?'

কিংকর নির্ভীক গলায় বলে, 'বড়ো সর্দার ভগবান নয়, আগেই বলেছি। যত ক্ষমতাই থাক, তারও কিছু দুর্বলতা আছে, ভয় আছে। একবার তার মুখোশটা খুলতে দাও, তখন দেখবে।'

মাথা নেড়ে সাতনা বলে, 'মুখোশ বা মুখ কোনটা তা আমিও জানি না। শুধু জানি, সর্দার মস্ত তান্ত্রিক। মারণ উচাটন বশীকরণ সব জানে। মানুষের মনের কথা টের পায়। আর জানি, পুলিশ বা গবর্মেন্টের সাধ্য নেই যে তাকে ধরে। তুমি তার ডেরায় ঢুকে মস্ত ভুল করেছ। তুমি পুলিশের লোক না গবর্মেন্টের চর তা জানি না। শুধু জানি, যাই হয়ে থাকো, সর্দারের হাত থেকে রেহাই পাবে না।'

কিংকর হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার একটা শর্ত ছিল, নির্দোষ গোবিন্দ মাস্টারকে খুনের দায় থেকে রেহাই দিতে হবে। সেটা ভেবে দেখেছ?'

সাতনা বিষাক্ত গলায় বলল, 'আমাকে তার জন্য কী করতে হবে।'

'দায়টা তোমাকে নিজের ঘাড়ে নিতে হবে।'

'নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু যে মামলা বহুকাল আগে চুকেবুকে গেছে, আসামির ফাঁসির হুকুম পর্যন্ত হয়ে গেছে তা আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে আদালত চাইবে কি? তা ছাড়া আমি

স্বীকার করলেই তো হবে না, আদালত চাইবে প্রমাণ। তার ওপর আসামি জেলহাজত থেকে পালিয়েছে, সেটাও তো মস্ত অপরাধ। পুলিশ তাকে এত সহজে ছাড়বে না।'

'সে আমরা বুঝব। তুমি তোমার কাজটুকু করলেই হবে।'

'করব। এখন আমাকে আমার মেয়ের কাছে নিয়ে চলো।'

ট্যাঁক থেকে একটা মস্ত পকেটঘড়ি বের করল কিংকর। ঝুঁঝকো অন্ধকারে অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে থেকে সময়টা ঠাহর করল। তারপর বলল, 'আর আধঘণ্টা। তারপর কিছু কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ব দু-জনে।'

সাতনা সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, 'সময় দেখলে কেন? কীসের আধঘণ্টা?'

কিংকর মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার যেমন দলবল আছে আমারও তেমনি একটা ছোট্ট দল আছে। তাদের আজ রাত্তিরে এখানে পৌঁছোনোর কথা।'

সাতনা অস্ফুট একটা শব্দ করে দু-হাতে মুখ ঢাকল। মিনিট খানেক বাদে মুখ তুলে বলল, 'তার মানে কী? তুমি কি লড়াই করতে চাও?'

কিংকর মাথা নেড়ে বলল, 'না। লড়াই হবে না। তোমার যে কয়জন স্যাঙাত আছে তাদের ঠেকিয়ে রাখবে তুমি। আমরা বিনা লড়াইয়ে যুদ্ধ জিতে তোমাদের বেঁধে নিয়ে যাব। আর তাহলে বড়ো সর্দারের মনে তোমার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আসবে না।'

'বড়ো সর্দারকে কি ছেড়ে দেবে তাহলে?'

কিংকর অন্ধকারেও একটু হাসল। 'না। বড়ো সর্দারের জন্য আমি তো রয়েছি।'

সাতনা বলল, 'কিন্তু বড়ো সর্দার তো নেই এখানে।'

'কে বলল নেই?' কিংকর আবার একটু হাসে। মৃদুস্বরে বলে, 'আমি যে বড়ো সর্দারের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।'

আর ঠিক এই সময়ে একটা মস্ত কন্টিকারির ঝোপের ওপাশ থেকে একটা ভারী পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল।

সাতনা পাথর হয়ে বসে থাকে। কিছুক্ষণ শ্বাস ফেলতে পর্যন্ত ভুলে যায়।

কিংকর মৃদু হেসে বলে, 'কী হে, বিশ্বাস হল?'

সাতনার মুখে বিস্ময়ে কথা এল না। শুধু মাথা নাড়ল।

কিংকর স্বাভাবিক গলাতেই বলে, 'তোমার মতো সর্দারও আমাকে বিশ্বাস করেনি। সারাক্ষণই আবডাল থেকে নজর রেখেছিল।'

'তবু ভয় পাচ্ছ না?'

'না। কিন্তু আমার আর সময় নেই। তুমি ওঠো, স্যাঙাতদের গিয়ে বলো, গাড্ডায় একটা ছোটোখাটো হামলা হবে। তারা যেন বাধা না দেয়। বাধা দিলে রক্তের গাং হয়ে যাবে।'

সাতনা উঠল। অসহায়ভাবে বলল, 'আর বড়ো সর্দার?'

'তার কথা আমার খেয়াল আছে। তুমি ভেবো না। যাও।'

সাতনা দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে ভাঙা কেল্লার দিকে এগোতে লাগল।

তার ছায়ামূর্তির দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল কিংকর। তারপর ট্যাঁকঘড়িটা আর একবার দেখে নিয়ে খুব টানা নীচু পর্দায় একটা শিস দিল। এমনই সে শব্দ যে, জঙ্গলের অন্যান্য শব্দের মধ্যে ঠিক ঠাহর হয় না।

শিসটা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে একটা ঘুঘুর ডাক ভেসে এল কাছ থেকে। নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলল কিংকর। তার দল এসে গেছে।

কিংকর উঠে চকিত পায়ে কেল্লার দক্ষিণ কোণের দিকে চলে এল। ভাঙা ইঁদারার পাশে দু-টি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে।

কিংকর সাবধানি গলায় ডাকল, 'রামু।'

'আজ্ঞে।'

'এসো।' বলে কিংকর হাত বাড়িয়ে রামুর একটা হাত ধরে। রামুর পিছনে নয়নকাজল দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে কাকাতুয়ার দাঁড়। কাঁপা কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'আবার আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? সেদিনকার মতো নতুন কোনো বিপদে পড়ব না তো?'

কিংকর একটু হেসে বলে, 'না। বিপদের মধ্যেই তো আছি। বিপদকে ভয় করলে কি চলে?'

ধীরে ধীরে তিন জন গভীর জঙ্গলের দিকে এগোতে থাকে। অন্যদিক দিয়ে দশ-বারোটা ছায়ামূর্তি দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে কেল্লায় গিয়ে ঢোকে।

একটা বাঁশঝাড় গোল হয়ে একটা চত্বরকে ঘিরে রেখেছে। বাইরে থেকে ভিতরকার ফাঁকা জায়গাটা বোঝা যায় না। কিংকর সেইখানে এনে রামু আর নয়নকাজলকে দাঁড় করাল। বলল, 'আমার একটা কাজ বাকি আছে। সেইটুকু সেরেই আসছি।'

নয়নকাজল উদ্বেগের গলায় বলে, 'যদি কোনো বিপদ হয় এর মধ্যে?'

'তাহলে, ভগবান দু-খানা পা তো দিয়েছেন, দৌড় মেরো।'

কিংকর আর দাঁড়ায় না। অতি দ্রুত পায়ে সে দৌড়োতে থাকে কেল্লার দিকে। যেতে যেতেই দেখে, দশ-বারোজন লোক পাঁচ-সাতজন লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ করে না কিংকর।

কেল্লায় ঢুকে সে জোর কদমে ছুটে একদম বায়ুকোণে চলে আসে। পুরোনো ভাঙা খিলান গম্বুজের ভিতর একটা মিনার। তাতে ঢোকার কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু কিংকর দিনের বেলায় লক্ষ করেছে এই মিনারের গায়ের কারুকাজ একটু অন্যরকম। খাঁজগুলো কিছু বেশি গভীর।

চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে কিংকর বানরের মতো সেই খাঁজগুলোয় হাত আর পা রেখে উঠে যেতে থাকে ওপরে।

কিন্তু বেশিদূর উঠতে হয় না তাকে। ওপর থেকে একটা ঝাঁঝালো টর্চের আলো এসে পড়ে তার ওপর। আর সেই সঙ্গে একটা গুলির শব্দ।

৩২

গুলিটা একেবারে চুল ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। প্রাণের ভয়ে অনেকটা উঁচু থেকেই কিংকর লাফ নিয়ে নীচে পড়ল। একটা ভেঙে পড়া থামের আড়ালে গা ঢাকা দিতে যাবে, তার আগেই পরপর আরও দুটো গুলি। তবে মিনারের মাথা থেকে এত দূরের পাল্লায় রিভলবারের গুলি ততটা বিপজ্জনক নয়। রাইফেল হলে এতক্ষণে কিংকর ছ্যাঁদা হয়ে যেত।

থামের আড়াল থেকে মিনারের মাথাটা লক্ষ করল কিংকর। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায়, একটা মস্ত মানুষের ছায়ামূর্তি একটু ঝুঁকে নীচের দিকে নজর রাখছে। টর্চটা মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়ে সে চারদিকে আলো ফেলছে।

হঠাৎ কিংকরের কাঁধে একটা ভারী হাত আলতো করে রাখল কেউ। একটু চমকে উঠেছিল কিংকর। পিছন থেকে একটা ভারী গলা তার কানে কানে বলল, 'সর্দারকে অত সহজে বাগে আনতে পারবে না।'

'সাতনা! তুমি এখনও যাওনি!'

'আমি গেলে সর্দারকে লড়াই দেবে কে? একা তোমার কর্ম নয়।'

'মিনারের ওপর লোকটাই কি সর্দার?'

'হ্যাঁ। সর্দারের আজ এখানে থাকার কথা নয়। কিন্তু কিছু একটা আঁচ পেয়ে সর্দার আবার ফিরে এসেছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমার সঙ্গে এসো।'

'কোথায়?'

'কাকাতুয়ার কাছে। একমাত্র কাকাতুয়াটাই জানে ওই মিনারে ঢোকার গুপ্ত পথ। আমরা অনেকদিন ধরে তাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করছি কিন্তু পাখিটা বলেনি। এখন শেষ চেষ্টা করে দেখো, যদি তাকে দিয়ে কথা বলাতে পার।'

'কিন্তু সর্দার যদি পালায়?'

'গুপ্তধন না নিয়ে সর্দার পালাবে না। ও এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন। মই লাগিয়ে আমরা প্রত্যেকটা মিনারের মাথায় চড়েছি। আশ্চর্য এই যে, তিনটে মিনারের মাথায় গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখও মিলেছে। সেই পথ ধরে আমরা পাতালেও নেমেছি। কিন্তু বৃথা। গোলকধাঁধার মতো কিছু গলিঘুঁজি ছাড়া আর কিছু পাইনি। এই মিনারের সুড়ঙ্গটাও তাই। তবু সর্দার শেষ চেষ্টা করতে ওখানে উঠেছে। সহজে পালাবে না।'

কিংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লোভই মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। সে বলল, 'কাকাতুয়াটা রামু আর নয়নকাজলের কাছে আছে। চলো।'

বাঁশবনে ঘেরা নিরাপদ জায়গাটায় পৌঁছে তারা দেখল, দু-জন জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। দাঁড়ে বসে ঝিমোচ্ছে কাকাতুয়া। টর্চের আলো চোখে পড়তেই ডানা ঝাপটে বলে উঠল, 'মেরো না, মেরো না আমাকে বিশু।'

সবাই পাখিটার কাছে গুপ্তধনের সন্ধান জানতে চেয়েছে। পাখিটা বলেনি। কিংকর এবার পাখিটার সামনে বসে খুব আদরের গলায় বলল, 'না না, বিশু তোমাকে মারবে না।'

পাখিটা ডানা ঝাপটে বলে, 'আলমারিতে টাকা নেই। টাকা আছে-।'

কিংকর চাপা গলায় বলে, 'বোলো না, বোলো না, টাকার কথা বোলো না।'

পাখিটা আবার ডানা ঝাপটায়। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'তিন নম্বর মিনার। পাথর সরাও, পাথর সরাও।'

'পাথর নেই।'

'তলার দিকে। পাথরে চিহ্ন আছে।'

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না। তারপর কিংকর উঠে দাঁড়াল।

সাতনা বলল, 'তিন নম্বর মিনারের মাথাতেই এখন সর্দার থানা গেড়েছে।'

কিংকর মৃদু হেসে বলে, 'মিনারে চড়তে হবে না। পাখি কী বলল শুনলে তো। মিনারের গোড়ায় আর একটা পথ আছে। চলো! যদি পার একটা শাবল নিয়ে এসো চট করে।'

দু-জনে যখন আবার মিনারটার কাছে এল, তখন ওপরটা অন্ধকার। কোনো ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে না।

মিনারের গোড়ার দিকে চৌকো চৌকো পাথর গাঁথা। তার ওপর নকশা। টর্চ জ্বেলে কিংকর পরীক্ষা করে দেখল, সব নকশাই একরকম। কোনটা নির্দিষ্ট পাথর এবং তাতে কী চিহ্ন আছে তা বোঝা মুশকিল। কিংকর হাঁটু গেড়ে বসে তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে। বহু পুরোনো আমলের নকশাগুলো সব ক্ষয় হয়ে এসেছে। তবু কিংকর বুঝবার চেষ্টা করে।

আচমকা ওপর থেকে আবার এক ঝলক টর্চের আলো এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ। দু-জনের খুব কাছাকাছিই গুলি দুটো মাটিতে গেঁথে যায়। সাতনা অন্ধকারে কী একটা জিনিস মাথার ওপর তুলে ধরে। কিংকর তাকিয়ে দেখে, মস্ত একটা লোহার ঢাল। ছাতার মতো বড়ো। পুরোনো আমলের ভারী জিনিস দেখে একটু হাসে সে, সাতনার বুদ্ধি আছে।

ওপর থেকে পর পর আরও দশ-বারোটা গুলি ছুটে আসে। দু-চারটে টকাটক ঢালের ওপরও এসে পড়ে।

সাতনা চাপা গলায় বলে, 'সর্দার নেমে আসছে মনে হয়। তাড়াতাড়ি করো।'

কিংকর নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'আমরা দু-জন, ও একা। ভয় কী?'

সাতনা একটু মৃদু হেসে বলে, 'সর্দারকে চেনো না তাই বলছ। দু-দশ জনের মহড়া নেওয়া সর্দারের কাছে জলভাত। আমার এই লোহার মতো পাঞ্জা একবার সর্দার একটু চেপে ধরেছিল। তখনই বুঝেছিলুম, এর সঙ্গে ইয়ার্কি নয়।'

কিংকর এসব কথায় কান দেয় না। মন দিয়ে খুঁজতে থাকে। অনেক নিরিখ-পরখ করে তার মনে হয়, একটা পাথরের একটা কোনায় যেন খুব অস্পষ্ট একটা তীরের চিহ্ন আছে। খুবই অস্পষ্ট আন্দাজ। তবু এখন অন্ধকারে ঢিল ছোড়া ছাড়া উপায়ও তো নেই। শাবলটা পাথরের খাঁজে ঢুকিয়ে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে চাড় দিতে লাগল সে।

ঠিক এই সময়ে হাত দশেক ওপর থেকে সর্দারের রিভলবার দু-ঝলক আগুন ওগরায়। এখন এত কাছ থেকে তার নিশানা ভুল হয় না। ঢাল ঘেঁষে দুটো গুলিই কিংকরের পায়ের কাছে গেঁথে যায় মাটিতে।

কিংকর মুখ তুলে সাতনাকে বলে, 'হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? পালটা গুলি চালাও।'

সাতনা মাথা নেড়ে বলে, 'তা হয় না। ভালো হোক মন্দ হোক, সর্দার আমার গুরু। তাকে মারতে পারব না।'

কিংকর হাত বাড়িয়ে বলে, 'তবে আমাকে অস্তরটা দাও।'

'তাও হয় না। আমার অস্ত্র দিয়ে ওকে মারা চলবে না।'

'তা বলে ওই পাষণ্ডটার হাতে মরবে নাকি?'

'আমার চেয়ে সর্দার তো বেশি পাষণ্ড নয়। দু-জনেই সমান পাপী, তাহলে কে কার বিচার করবে বলো!'

ঢালের আড়াল থেকে খুব সাবধানে মুখ বের করে কিংকর ওপরের দিকে চেয়ে দেখল একটু। প্রকাণ্ড একটা ছায়ামূর্তি প্রায় বাদুড়ের মতো ঝুলে ঝুলে নেমে আসছে। মিনারের অগভীর খাঁজে স্রেফ আঙুলের সাহায্যে শরীরের ভার নিয়ে নেমে আসা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ পারে সার্কাসের বাজিকররা। সর্দার নামছেও বেশ তাড়াতাড়ি। একবার থেমে একটা হাত ঘুরিয়ে নীচের দিকে তাক করল যেন। সাঁত করে ঢালের আড়ালে মাথা টেনে নেয় কিংকর। আর সঙ্গেসঙ্গে একটা গুলি এসে মাটি ছিটকে দেয় খানিকটা। একটা রিভলবারে এত গুলি থাকার কথা নয়। কিংকর অনুমান করল, সর্দারের কোমরে অন্তত গোটা চারেক রিভলবার আছে। একটার গুলি ফুরোলে আর একটা চালাচ্ছে।

শাবলে আর একটা চাড় দিতেই পাথরটা নড়ে উঠল। শাবল টেনে নিয়ে পাথরের অন্য ধারে ঢুকিয়ে আবার চাড় দেয় কিংকর। পাথরটা আলগা হয়ে ঢকঢক করে নড়ে। শাবল ফেলে দু-হাতে মস্ত পাথরের চাঁইকে ধরে টান দেয় কিংকর।

ধড়াম করে পাথরটা খসে পড়ে মাটিতে। আর সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড বাঘের মতো সর্দারও লাফ দিয়ে নামে নীচে। নেমেই রিভলবার তুলে বিকট গলায় হাঁক দেয়, 'খবরদার প্রাণে বাঁচতে চাস তো পালা। মাত্র দশ সেকেন্ড সময় দেব। পালা!'

ঢালের নিরাপদ আড়ালে থেকেও সেই স্বরে একটু কেঁপে ওঠে সাতনা। কিন্তু কিংকর কাঁপে না। পাথরটা হঠাৎ খসে আসার ফলে টাল সামলাতে না পেরে সেও পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। কিন্তু খাড়া হওয়ার কোনো চেষ্টা না করে সে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে মিনারের আড়ালে সরে গেল। সর্দার বোকা নয়। দশ দিকে তার চোখ ঘোরে। তবু কিংকর শেষ একটা চেষ্টা করতে চায়। লোভে আর উত্তেজনায় এখন হয়তো সর্দারের মাথার ঠিক নেই।

সর্দার গম্ভীর গলায় বলে, 'সাতনা, পিস্তল ফেলে দে।'

সাতনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'সর্দার, তোমাকে গুরু বলে মানি। কিন্তু জান নিয়ে টানাটানি হলে আমাকেও অস্ত্র ধরতে হবে।'

সর্দার একটা পেল্লায় মাটি কাঁপানো ধমক দিয়ে বলে, 'চোপ শয়তান। সর্দারের পিছন থেকে ছোবল মারতে চেয়েছিলি, তার সাজা কী জানিস?'

'জানি।'

'সেই ছুঁচো কিংকরটা কোথায়?'

'আমার সঙ্গেই আছে।'

'যদি নিজের ভালো চাস তো সরে যা। আগে ওটাকে খুন করব। তোর বিচার তার পরে।'

সাতনা নরম গলায় বলল, 'শোনো সর্দার। তোমাকে আমি-তোমাকে আমি এমনিতে মারতে পারি না। সেটা অধর্ম হবে। তবে যদি একই জমিতে দাঁড়িয়ে ভগবানের আকাশের নীচে আমাদের মারার চেষ্টা করো, তাহলে কিন্তু গুলি তোমার দিকেও ছুটবে। রিভলবার আমার হাতেও তৈরি।'

সর্দার একটু চুপ করে থেকে এক পর্দা গলা নামিয়ে বলে, 'মেয়ের কথা ভেবে তুই দুর্বল হয়ে পড়েছিলি। তোর মাথা গুলিয়ে গেছে। সেইজন্য তোকে আমি এবারের মতো মাপ করে দিচ্ছি। একটা কথা মনে রাখিস, কাছেপিঠের এক-শো গাঁয়ে আমার চর আছে। তোর মেয়ে যদি বেঁচে থাকে, তবে তাকে আমি খুঁজে দেব। ভাবিস না।'

হামাগুড়ি দিয়ে মিনারের ও-পিঠে চলে এসেছে কিংকর। সর্দারের পিছন দিকে মাত্র হাত-পাঁচেকের মধ্যে এসে থেমেছে সে। অপেক্ষা করছে।

সর্দার সাতনার দিকে এক-পা এগিয়ে গেল। বলল, 'সাতনা, এখনও বলছি, ফিরে আয় আমার দিকে। গুপ্তধনের পথ মিলেছে। দু-জনে মিলে ভাগ করে নেব। আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হবে না।'

সাতনা এক-পা পিছু হটে বলে, 'দল ভেঙে দেবে?'

'দিতেই হবে। ডাকাতরা চিরকাল ডাকাত থাকে না। দুনিয়ার নিয়মে ভোল পালটাতে হয়।'

সাতনা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'তুমি ভোল পালটাতে পার সর্দার, কারণ তোমার আসল পরিচয় আজও কেউ জানে না। কিন্তু আমরা দাগি লোক, আমরা ভোল পালটাতে চাইলেও পারব না।'

অসাবধানে সাতনা ভারী ঢালটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিতে গিয়েছিল। পলকের সেই অসতর্কতাই কাল হল তার। সর্দারের রিভলবার গর্জে উঠল। একটা নয়, দু-হাতে দুটো।

'ঃআ!' বলে চেঁচিয়ে সাতনা উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। ঢালটা ছিটকে গেছে একধারে। আর আড়াল নেই।

সর্দার রিভলবার তুলে ভালো করে নিশানা করছিল। আর তখনই তার ঘাড়ে চিতাবাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল কিংকর।

৩৩

কিংকর ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে কিন্তু সর্দারকে নাগালে পেল না। সর্দার তো সোজা লোক নয়, সাতনার মতো দানবও তাকে খামোখা সমঝে চলে না। পিছন দিকে যেন-বা সত্যিই তার আরও দুটো চোখ আছে। কিংকরও ঝাঁপ দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ সর্দারও তড়িৎগতিতে সরে গেছে। কিংকর পড়ল মাটিতে, মুখ থুবড়ে।

সর্দার তার রিভলবার সোজা কিংকরের মাথায় তাক করে সাতনাকে বলল, 'তোর অস্ত্র ফেলে দে। নইলে তোর এই প্রাণের ইয়ারকে শেষ করে দেব।'

সাতনা কিংকরের অবস্থাটা দেখল। বোকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পস্তাচ্ছে। কিংকর সর্দারের হাতে মারা পড়লে সাতনার শোক করার কিছু নেই। কিন্তু ভয় একটাই। কিংকর মরলে জীবনেও আর মেয়েটার খোঁজ পাওয়া যাবে না। সাতনার এখন ধ্যানজ্ঞান তার মেয়ে। একবার তাকে চোখের দেখা দেখতেই হবে। তারপর মরে গেলেও দুঃখ নেই। কিন্তু এখন যে সংকটে তারা রয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশা দেখছে না সাতনা। সর্দারের হাতে দু-জনকেই না মরতে হয়।

সাতনা জানে, সর্দারকে গুলি করার উপায় নেই। এখন আর গুরু বলে সর্দারকে খাতির না করলেও চলে। কারণ, সর্দার বিনা কারণে তার দিকে গুলি চালিয়েছে। এখন উলটে গুলি চালালে সাতনার অপরাধ হয় না। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। একটু নড়লেই কিংকরের মাথাটা সর্দারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। আর অস্ত্র ফেলে দিলেও যে রেহাই পাওয়া যাবে তা নয়। সর্দার দু-জনকেই মারবে। সুতরাং এই শীতেও সাতনা ঘামতে লাগল।

সর্দার দুম করে একটা গুলি চালিয়ে দিল। কিংকরের মাথার কাছটায় মাটি ছিটকে গেল খানিকটা। একটু হেসে সর্দার বলে, 'এখনও ভেবে দেখ সাতনা, খুব বেশি সময় পাবি না। পরের গুলিটা ওর খুলি ফাটিয়ে দেবে।'

সর্দারের মস্ত টর্চের আলো অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে কিংকরের চারধারে। সেই আলোয় সাতনাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাতনার আর সর্দারের মাঝখানে কেবল একটা বেঁটে কামিনীঝোপ। সাতনা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'দিচ্ছি।'

কিংকরের নড়াচড়ার নাম নেই। এমন ভঙ্গিতে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে যেন-বা একটু বাদেই ওর নাকের ডাক শোনা যাবে। অসহায় সাতনা তার আগ্নেয়াস্ত্রটা সর্দারের পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে দিল।

বেচারা! প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই রিভলবার থেকে আগুন ঝিকিয়ে ওঠে। সাতনা তার পাঁজর চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সর্দারের রিভলবারের নল চকিতে কিংকরের দিকে ফেরে।

চোখে পলক ফেলার মতো একটুখানি দেরি হলে হয়তো কিংকর বেঁচে থাকত না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে নির্ভুল নিশানায় একটা ইট সাঁ করে এসে সর্দারের কপালে লাগে। সর্দার থমকে যায়। বাঁ-হাতখানা কপালে চেপে ধরে। কিন্তু পড়েও যায় না, মূর্ছাও হয় না।

ততক্ষণে কিংকর উঠে দাঁড়িয়েছে। খুব-একটা তাড়াহুড়ো করল না সে। শাবলটা কুড়িয়ে নিল শান্তভাবে। তারপর সর্দারের ডান হাতের কবজিতে আলতোভাবে মারল। রিভলবারটা পড়ে গেল। দু-পা এগিয়ে কিংকর সর্দারের মুখে একখানা ঘুসি চালাল।

সর্দার পড়ল না। এমনকী নড়লও না এতটুকু। হাত বাড়িয়ে সে কিংকরকে প্রায় মাথার ওপর তুলে ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করল দূরে। কিন্তু কিংকর তো ঘাসজল খায় না। সর্দার যখন তাকে দু-হাতে টেনে ওপরে তুলছে তখনই সে তার দু-খানা পায়ে ফুটবল-খেলোয়াড়ের মতো দুটো শট কষাল সর্দারের মুখে আর পেটে।

সেই দুটো লাথিতে যেকোনো শক্তসমর্থ লোকেরও জমি নেওয়া উচিত। কিন্তু সর্দারের কাছে তা বোধ হয় পিঁপড়ে কামড়ের শামিল। সে শুধু 'উম' করে একটা বিরক্তির শব্দ করল। তারপরই উলটে এক ঘুসি মারল কিংকরকে। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল কিংকর।

তারপরই শুরু হল, দু-জনের ধুন্ধুমার লড়াই।

কে জিতত, কে হারত তা বলা মুশকিল। কিন্তু হঠাৎ ঘটনাস্থলে আর একজন লোকের আবির্ভাব হল। মজুবত গড়ন। মাঝারি লম্বা। সে এসেই একটানে কিংকরকে সরিয়ে আনল সর্দারের থাবা থেকে। তারপর নিজে লাফিয়ে পড়ল সর্দারের ওপর।

এই দু-নম্বর লোকটা লড়তে জানে। মিনিট দুয়েক পরই দেখা গেল, সর্দার হাঁফাচ্ছে। লড়াইয়ের তাল পাচ্ছে না। যতবার ঘুসি লাথি চালায় ততবার তা বাতাস কেটে বেরিয়ে যায়। কুস্তির প্যাঁচে যতবার লোকটাকে কাবু করার চেষ্টা করে ততবার লোকটার প্যাঁচে পড়ে যায়।

কিংকরের দম শেষ। সে হাঁফাতে হাঁফাতে কিছুক্ষণ দম নিয়ে টর্চ আর রিভলবার তুলে নেয় মাটি থেকে। দুটোই সর্দারের। রিভলবারটা তুলে ধরে সে আদেশ দেয়, 'সর্দার, লড়াই ছাড়ো। ধরা দাও।'

সর্দার একবার তার দিকে তাকায়। তারপর আচমকা প্রতিপক্ষকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নীচু হয়ে ভোজবাজির মতো জঙ্গলের আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে যায় চোখের

পলকে।

কয়েক মুহূর্ত বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে কিংকর সর্দারের অনুসরণ করার জন্য পা বাড়ায়। সেই সময়ে কামিনীঝোপের ওপাশ থেকে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় সাতনা। টর্চের আলোয় দেখা যায়, রক্তে তার বুকের বাঁ-দিক ভেসে যাচ্ছে। বুকে হাত চেপে ধরে সাতনা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'সর্দারের রণপা আছে। পশ্চিমধারে একটা শুঁড়ি পথ, ধরতে হলে সেদিকে যাও, সাবধানে।' . . . বলে সাতনা আবার ঢলে পড়ে।

কিংকর আর দু-নম্বর লোকটা তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে ছুটে যায়।

শুঁড়ি পথটার ধারেই জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দু-জন। রামু আর নয়নকাজল। রামুর হাতে কয়েকটা আধলা ইট।

নয়ন বলল, 'তোমার ঢিলটা সর্দারের কপালে লেগেছে। নইলে এতক্ষণে কিংকরের হয়ে যেত। কী টিপ তোমার! আর কী সাহস!'

রামু রাগের গলায় বলে, 'কিন্তু তুমি অত কাঁপছ কেন? এত ভয়টা কীসের?'

'ও বাবা! এরা সাংঘাতিক লোক। ঢিলটা মেরে তুমি ভালো কাজ করনি। সর্দার জানতে পারলে তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

'অত সস্তা নয়। তুমি চুপ করে থাকো তো।'

'দেখলে তো নিজের চোখে তিন-তিনটে জোয়ান সর্দারকে কাবু করতে পারল না। তুমি বাচ্চা ছেলে কী করতে পারবে?'

'আর কিছু না করতে পারি ঢিল মারতে পারব। তুমি অত ভয় পেয়ো না।'

নয়ন মাথা চুলকে বলে, 'বুঝলে দাদাবাবু, আমি খুব একটা ভিতু ছিলুম না। এই ডাকাত হওয়ার পর থেকেই ভয়টা বেড়েছে। ওরে বাপরে! ওটা কী! রাম রাম রাম রাম' বলতে বলতে নয়ন মাটিতে বসে দু-হাতে মুখ ঢাকে।

রামু প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, শুঁড়ি পথটার মুখে ভীষণ ঢ্যাঙা এক মূর্তি হনহন করে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। কম করেও বারো ফুট লম্বা। আবছায়ায় ভালো দেখা যায় না। কিন্তু ভুল নেই।

রামুর রণপায়ে চড়া অভ্যাস আছে। সুতরাং প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সর্দার রণপায়ে চড়ে পালাচ্ছে।

রামু শুঁড়ি পথটার মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটার মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর বোঁ বোঁ করে তার দুটো ঢিল ছুটে গেল নির্ভুল নিশানায়।

রণপায়ে লোকটা একটু থমকে গেল। রামু ভেবেছিল, বুঝি লাগেনি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে মূর্তিটা হঠাৎ টলতে টলতে ধড়াস করে পড়ে গেল।

সেই সঙ্গেই ছুটে এল কিংকর আর সেই লোকটা। কিংকরের হাতে টর্চ। কিংকর চেঁচিয়ে বলল, 'শাবাশ রামু!'

একটু বাদে সকলেই ঘিরে দাঁড়াল সংজ্ঞাহীন সর্দারকে। কিংকর শক্ত দড়ি এনে সর্দারের হাত-পা বেঁধে ফেলে। বলে, 'বড়ো সাংঘাতিক লোক। বাঁধা না থাকলে জ্ঞান ফিরে আসার পরই গণ্ডগোল পাকাবে।'

রক্তাম্বর এবং দাড়িগোঁফে সর্দারকে বাঁধা অবস্থাতেও ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

দ্বিতীয় লোকটি আসলে গোবিন্দ। সে এসে রামুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার এলেম আছে। আমার যা বিদ্যে সব তোমাকে শিখিয়ে দেব।'

রামু মুখ তুলে বলে, 'তুমি একা কেন গোবিন্দদা? গবাদা আসেনি?'

মৃদু একটু হেসে গোবিন্দ বলে, 'গবাদাও এসেছে। একটু তফাতে আছে। পাগল মানুষ তো। এসে পড়বে কিছুক্ষণ বাদে।'

কিংকর সর্দারকে বাঁধার পর মুখের ওপর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে তার নকল দাড়িগোঁফ টেনে খুলছিল। খুলতে খুলতে বলল, 'এ লোকটাও চেনা লোক। কিন্তু কিছু করার নেই। ধরিয়ে দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এ সর্দার ছিল।'

রামু জিজ্ঞেস করে, 'কে লোকটা কিংকরদা?'

'নিজেই দেখো।'

রামু টর্চের আলোয় দাড়ি-গোঁফহীন সর্দারের মুখের দিকে চেয়ে হাঁ হয়ে যায়। এ যে আন্দামান আর নিকোবরের বাবা, দারোগা কুন্দকুসুম।

রামু কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'ইনিই সর্দার?'

কিংকর মাথা নাড়ে, 'ইনিই।'

৩৪

কুন্দকুসুম যখন চোখ মেলে তাকাল, তখনও সকলের অবাক ভাবটা যায়নি, যাকে বলা যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা।

হাত-পা-বাঁধা কুন্দকুসুম কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। চারদিকে চেয়ে নিজের অবস্থাটা একটু বুঝে নিল কয়েক সেকেন্ডে। কিংকরের হাতে একটা মশাল জ্বলছে। তার মস্ত

আলোয় সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কুন্দকুসুম রামুর দিকে চেয়ে মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, 'তুমি উদ্ধববাবুর ছেলে রামু? আন্দামান আর নিকোবরের বন্ধু?'

রামু এত ঘাবড়ে গেছে যে, গলায় শব্দ এল না। শুধু মাথা নাড়ল।

কুন্দকুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমার টিপ খুব ভালো। আজ তোমার জন্যই সর্দার প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি! শেষ অবধি অবশ্য পালাতে পেরেছে। কিন্তু বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারবে না।'

এ-কথা শুনে রামুর মাথা একদম গুলিয়ে গেল। বলে কী লোকটা? তাহলে কি কুন্দকুসুম সর্দার নয়?

কুন্দকুসুম চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে রামুকে জিজ্ঞেস করে, 'এরা সব কারা বলো তো! আর আমাকে এমনভাবে বেঁধেছেই বা কে? কার এত সাহস?'

গোবিন্দ একটু হেসে বলল, 'সেলাম দারোগাবাবু। কিছু মনে করবেন না, নিজেদের জান বাঁচাতে আপনাকে একটু বাঁধতে হয়েছে।'

কুন্দকুসুম একটা হুংকার দিয়ে বলে, 'খুলে দে। তারপর দেখাই তোর ঘাড়ে কটা মাথা!'

'মাথা একটাই, তবে সেটা এত সস্তা নয়। আপনার তো অনেকগুলো মাথা আর মুখ। কখনো দারোগা, কখনো সর্দার। আপনার একটা মাথা গেলেও আর একটা থাকবে।'

কুন্দকুসুম একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলে, 'দারোগাদের মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধরতেই হয়, তাতে আশ্চর্যের কী? আমি সর্দার এ-কথা তোকে কে বলল রে মর্কট?'

'অত চিল্লাবেন না দারোগাবাবু। এখন আপনি একটু অসুবিধের মধ্যেই আছেন। আমরা ছাপোষা লোক সব, দারোগাবাবুকেও ভয় খাই, ডাকাতের সর্দারকেও ভয় খাই। কিন্তু আপনার স্যাঙাত সাতনা আপনার গুলি খেয়ে ভারি রেগে গেছে। জানেন তো বাঘ জখম হলে বড়ো বিপজ্জনক। সে এখন আপনাকে গুরু বলেও মানছে না, দারোগা বলেও মানছে না। আপনার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সে এল বলে।'

কুন্দকুসুমকে একটু অস্বস্তি বোধ করতে দেখা যায়। গলা এক পর্দা নামিয়ে বলে, 'তোমরা বিশ্বাস করো, এই ডাকাতের দলটাকে অ্যারেস্ট করার জন্য গত তিন মাস ধরে চেষ্টা করছিলাম। আজই প্রথম এদের ডেরার পাকা সন্ধান পাই। আমার ফোর্স এই জঙ্গলটা ঘিরে আছে এখনও। আমি কাপালিকের ছদ্মবেশে-'

এতক্ষণ কিংকর একটাও কথা বলেনি। এবারে সে হঠাৎ হোঃ-হোঃ করে হেসে ওঠে। কুন্দকুসুম কটমট করে তার দিকে চায়।

কিংকর হাসি থামিয়ে বলে, 'আমারও সেটা সন্দেহ হয়েছিল দারোগাবাবু, আপনি বোধ হয় সর্দার নন। আসল সর্দার বোধ হয় সত্যিই পালিয়েছে। আপনাকে আমরা ছেড়েও দিতে চাই। তবে তার আগে আমাদের কয়েকটা কথা আছে।'

কুন্দকুসুম গম্ভীর হয়ে বলে, 'বলে ফেলো।'

কিংকর মাথা নেড়ে বলে, 'আমার তেমন সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাস নেই। কথা বলবে গবাদা। আমি তাকে ডেকে আনছি। এই বলে কিংকর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল চকিত পায়ে।

কয়েক মিনিট বাদে একটু দূরে গবার গলা পাওয়া গেল। সে গান গাইছে, 'বলো রে মন কালী কালী। আমার বুকটা করে ধুকুরপুকুর, পেটটা লাগে খালি খালি। অধিক কী আর কবো রে ভাই, মনেতে মোর আনন্দ নাই। কত নাচনকোঁদন দেখাইলাম রে, তবু দেয় না যে কেউ হাতে তালি।'

সামনে এসেই গবা এক হাত জিব কেটে নিজের কান ধরে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, কী পাষণ্ড রে তোরা! বড়োবাবুকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছিস! নরকে যাবি যে রে! খুলে দে! ওরে খুলে দে!'

গবা নিজেই নীচু হয়ে তাড়াতাড়ি কুন্দকুসুমের বাঁধন খুলতে লেগে যায়।

রামু গবাকে দেখেও নড়ে না। তার মনের মধ্যে টিকটিক করে কী যেন একটা হতে থাকে। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শুধু।

গবা কুন্দকুসুমের হাতের বাঁধন খুলে ধরে ধরে তাকে তুলে বসায়। তারপর সামনে ঢিপ করে মাথা ঠুকে বলে, 'বড়োবাবু, অপরাধ নেবেন না। ছেলেমানুষ সব, না বুঝে করে ফেলেছে।'

কুন্দকুসুম গম্ভীর গলায় বলে, 'হুঁ।'

গবা নিরীহ গলায় বলে, 'মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় আজ্ঞে।'

কুন্দকুসুম বলে, 'তা বটে।'

গবা হাতজোড় করে বলে, 'তা সেই ভুলের কথাই বলছিলুম আর কি। ভুল কি দারোগা-পুলিশেরও হয় না? এই আমাদের গোবিন্দ মাস্টারের কথাই ধরুন। খুন-টুন করার ছেলেই নয়। তবে ফেঁসে গেছে!'

'তাই নাকি?'

'একেবারে নির্যস সত্যি কথা।' বলতে বলতে গবা কুন্দকুসুমের পায়ের বাঁধনটা খুলবার চেষ্টা করতে করতে বলে, 'ঃএ, এই গিঁটটা বড্ড এঁটে বসেছে দেখছি। ওদিকে আবার

সাতনাকে দেখে এলুম একটা খাঁড়ায় ধার দিচ্ছে। নাঃ, বড্ড বিপদ দেখছি। পায়ের বাঁধনটা তাড়াতাড়ি না খুললেই নয় . . .'

কুন্দকুসুম একটা ধমক দিয়ে বলে, 'ইয়ার্কি রাখো। এটা ইয়ার্কির সময় নয়। কী চাও সেটা স্পষ্ট করে বলো।'

গবা মাথা চুলকে বলে, 'আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, গরিবের মা-বাপও বটে। আপনার কাছে আবদার করে চাইব তাতে আর লজ্জা কী! বলছিলাম, গোবিন্দকে খালাসের একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে আপনাকে।'

কুন্দকুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'দেখা যাবে।'

'ভরসা দিচ্ছেন তো?'

কুন্দকুসুম একটু বিষাক্ত হেসে বলে, 'হাতি কাদায় পড়েছে বাপু, ভরসা না দিয়ে যে আমার উপায় নেই সে তুমি ভালোই জানো।'

ভারি লজ্জার ভান করে গবা বলে, 'কী যে বলেন বড়োবাবু! তা দিলেনই যদি, তবে আরও একটু দিন।'

'আবার কী?'

'আজ্ঞে ওই গুপ্তধনের ব্যাপারটা। ওটা সরকারের হক পাওনা।'

কুন্দকুসুমের চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে ওঠে।

চাপা গলায় গবা বলে, 'প্রাণের দাম যে ওর চেয়ে একটু বেশি বড়োবাবু। কিংকর বা সাতনা যেমন লোক, থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাছারির তোয়াক্কা করবে না। জানে তাতে লাভ নেই। কোন ঝানু উকিল মামলা ঘুরিয়ে আপনাকে খালাস দিয়ে দেবে। তাই ওরা চায় বল্লমে এফোঁড় ওফোঁড় করে মেরে দিতে। আমি অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি।'

কুন্দকুসুম নিভে যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

গবা আবার মাথা চুলকে বলে, 'আর একটা কথা।'

'আবার কী?'

'এতই যদি দিলেন তবে আর একটু বা বাকি থাকে কেন? বলছিলাম, এ-জায়গায় আপনার অনেক দিন চাকুরি হয়ে গেল। আমরা পাঁচজনে দেখছি, এখানকার জল-হাওয়া আপনার তেমন সহ্য হচ্ছে না। শুকিয়ে একেবারে অর্ধেক হয়ে গেছেন। তাই বলছিলুম আজ্ঞে, একটা বেশ ভালো স্বাস্থ্যকর জায়গায় বদলি নিয়ে চলে যান না বড়োবাবু।'

কুন্দকুসুম থমথমে মুখ করে বলে, 'বুঝেছি।'

'আজ্ঞে আপনি বুঝবেন না তো কে বুঝবে! এমন পাকা মাথা দেশে কটা আছে?'

কুন্দকুসুম বিরক্তির গলায় বলে, 'এবার পায়ের গিঁটটা খুলতে পার কি না।'

গবা জিব কেটে বলে, 'ওই দেখো, কথায় কথায় ভুলেই যাচ্ছিলাম, ইয়ে বড়োবাবু, আর একটা কথা।'

'আরও কথা?'

'মানে সাতনার কাছে কয়েকটা চিঠি আছে। সর্দারের নিজের হাতের লেখা। কোথায় কোন বাড়িতে ডাকাতি করতে হবে, কাকে খুন করতে হবে, এই সব বৃত্তান্ত, সর্দারের হাতের লেখা সেই সব চিঠি সাতনা আবার পুলিশের কাছে পাঠাতে চায়। আমি বলি, তার কি কোনো দরকার আছে বড়োবাবু?'

কুন্দকুসুম বিবর্ণ মুখে বলে, 'না। তার দরকার নেই।'

গবা সঙ্গেসঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। দরকার কী? কেঁচো খুঁড়তে আবার সাপ বেরিয়ে পড়বে। তার চেয়ে চিঠি কটা বরং থাক। পরে কাজে লাগবে।'

কুন্দকুসুম ইঙ্গিত বোঝে। একটু চাপা স্বরে বলে, 'তোমরা খুব ঘড়েল।'

'ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন! আপনি থাকতে আমরা! হেঃ হেঃ . . .'

গবা পায়ের বাঁধনটা খুলে দিলে কুন্দকুসুম উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু অত বড়ো মানুষটা যেন নুয়ে পড়েছে, বয়সটাও যেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেড়ে গেছে।

কুন্দকুসুম ধীরে ধীরে গিয়ে রণপা দুটো কুড়িয়ে নিল। কারও দিকে একবারও না তাকিয়ে রণপায়ে চড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে জঙ্গলের অন্ধকার আর রহস্যময়তায় মিলিয়ে গেল।

৩৫

ঘটনার মাসখানেক পর এক গাঁয়ের রাস্তায় তিন জন হাঁটছিল। গবা পাগলা, সাতনা আর রামু।

একটা পুকুরধার পেরিয়ে কয়েকটা তালগাছের জড়াজড়ি। তারপর একটা বাঁক দেখা যাচ্ছিল। গবা বলল, 'ওই বাঁকটা ঘুরলেই যুধিষ্ঠিরের সেই পিসি না মাসির বাড়ি। এসে গেছি হে।'

সাতনার বুকে এখনও ব্যান্ডেজ। আঘাত মারাত্মক না হলেও সর্দারের দুটো গুলিই তার পাঁজরে ক্ষত করে দিয়ে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর মেয়েকে দেখতে পাবে

আনন্দে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কথাটা মনে রেখো গবা, মেয়ের কাছে বাপ বলে আমার পরিচয় দিয়ো না।'

'জানি। বলব দূর সম্পর্কের আত্মীয়।'

সাতনা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তারও দরকার নেই। মেয়ে খুব সম্ভব আমাকে চিনতে পারবে। আবছা হলেও আমার কথা তার মনে আছে। এ-চেহারা তো ভোলার নয়। তার চেয়ে এক কাজ করি এসো। ওই বাঁকের মুখে ঝুপসি আম গাছটার ছায়ায় বসে থাকি। একবার না একবার সে পুকুরে কিংবা বাগানে বেরোবেই। তখন একটু চোখের দেখা দেখে নেব।'

এ-কথার ওপর গবা কোনো কথা বলতে পারল না। রামুর চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। সে ফিরে আসার পর তার বাবা যে আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে-কথাটা এখন মনে পড়ল তার। বাবাকে আগে তার খুব রাগী আর নির্দয় বলে মনে হত। এখন জানে, বাবা তাকে কত ভালোবাসে। সাতনার জন্য তাই তার বড়ো কষ্ট হচ্ছিল।

গাছতলায় বসে সাতনা অপলক চোখে কিছুক্ষণ সামনের বাগানঘেরা একতলা পাকা বাড়িটার দিকে চেয়ে রইল। কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। সাতনা গবার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি যে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে না, আমি যে কোনো শাস্তি পেলুম না, এটা কি ঠিক হল?'

গবা মৃদু হেসে বলল, 'শাস্তি কাকে বলো তুমি? কত চোর-ছ্যাঁচোড় খুনে-জালিয়াতকে তো পুলিশ গারদে ভরে। জেল খেটে কি আর তাদের শুদ্ধি হয়। বাপু হে, আমি বুঝি অনুতাপের আগুন না জ্বললে মানুষের পাপ পোড়ে না। অনুতাপ কাকে বলে জানো? কোনো কাজ করে বিচার দ্বারা তার ভালোমন্দ অনুভব করে যে তাপের দরুণ মন্দে বিরতি আসে তাই হল অনুতাপ। সেই অনুশোচনায় নিজের মেয়েটার সামনে গিয়ে পর্যন্ত তুমি দাঁড়াতে পারছ না। এর চেয়ে বেশি সাজা তোমাকে আর কে দেবে?'

সাতনা ধুতির খুঁটে চোখের জল মুছল।

ঠিক এ-সময়ে একট দিঘল চেহারার মেয়ে বেরিয়ে এল। সদ্য স্নান করে এসেছে বুঝি। এক রাশ চুল এলো হয়ে আছে পিঠের দিকে। ভারি সুন্দর মুখখানি। একটা ভেজা কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল বাইরের তারে।

গবা একটু ঠেলা দিয়ে সাতনাকে বলল, 'দেখো হে, দেখো। দানবের মেয়ে কেমন পদ্মফুলটির মতো দেখতে হয়েছে।'

সাতনা জবাব দিল না। সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইল মেয়ের দিকে। চোখের পলক পড়ে না, শ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে রোদে একটু পায়চারি করল মেয়েটি। তারপর ভিতর থেকে কেউ বুঝি ডাকল। মেয়েটি সাড়া দিল, 'যাই।'

তারপর চলে গেল।

গবা উঠে পড়ল। বলল, 'মেয়ের সামনে যদি না-ই যেতে পার তবে আর মায়া বাড়িয়ো না। দশটা গাঁয়ের লোক তোমাকে চেনে। ধরা পড়লে বিপদ আছে। ওঠো, ওঠো।'

সাতনার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল অঝোরে। উঠে আস্তে আস্তে ফেরার পথ ধরে সে বলল, 'যত খারাপ কাজ করেছি তার দশগুণ ভালো কাজ যদি বাকি জীবনটায় করি, তাহলে মেয়ের সামনে একদিন দাঁড়ানোর সাহস হবে না গবা?'

'হবে। খুব হবে। ইচ্ছেটাই আসল, অনুতাপটাই আসল।'

সাতনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে, 'তাহলে এখান থেকে আমায় বিদায় দাও ভাই। পৃথিবী জায়গাটা বিশাল, কাজেরও অন্ত নেই। দেরি করে কী হবে। এক্ষুনি শুরু করে দিই গিয়ে।'

গবা মাথা নাড়ল, 'এসো তবে।'

সাতনা একটু ভেবে বলল, 'আর একটা কথা। মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ওর বিয়ে হোক। তুমি ব্যবস্থা করবে?'

গবা একটু হেসে বলল, 'করব। ভেবো না।'

'তাহলে যাই।'

চোখের পলকে লম্বা লম্বা পা ফেলে সাতনা বাঁ-পাশের মাঠটা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামু গবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল ভারী মনে।

পুলিশ নতুন করে রিপোর্ট দেওয়ায় গোবিন্দ মাস্টারের মামলা আবার আদালতে উঠেছে। গোবিন্দর পক্ষে সওয়ালে নেমেছেন মস্ত মস্ত ডাকসাইটে সব উকিল। সামন্তমশাই তাদের মোটা টাকা দিচ্ছেন। গোবিন্দ গিয়ে শহরে ধরা দেওয়ার পর ফের জামিনে খালাস পেয়ে সার্কাসে তার খেলা দেখাচ্ছে। মামলার যা গতিক তাতে সে খালাস পাবেই।

কুন্দকুসুম বদলি হয়নি। হঠাৎ চাকরি ছেড়ে সপরিবারে দেশের বাড়িতে চলে গেছে। সেখানে নাকি চাষবাস নিয়ে থাকবে। নতুন যে দারোগা এসেছে, তার নাম চন্দ্রাতপ খাঁড়া। ভারি ভালো লোক। প্রায়ই উদ্ধববাবুর বাড়িতে এসে রামুকে আদর করেন আর কাকাতুয়াকে ছোলা খাওয়ান।

উদ্ধববাবুর হঠাৎ জ্ঞানচক্ষু খুলেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, রাঘব ঘোষ তাঁর চেয়ে ভালো গাইয়ে। তাই আজকাল সন্ধের পর রাঘবের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেন প্রায়ই। চোখ

বুজে গান শোনেন আর তারিফ করেন, 'ওয়াঃ ওয়াঃ, কেয়াবাত।'

রাঘব ব্যথিত স্বরে বলে, 'কেয়াবাতটাও ঠিক জায়গামতো বলতে পারছেন না উদ্ধববাবু! বেজায়গায় তারিফ করলে সুর কেটে যায়।'

উদ্ধববাবু ভারি লজ্জা পান।

নয়নকাজলের সঙ্গে এখন আর কাকাতুয়ার আড়াআড়ি নেই। সরকারি লোকেরা গুপ্তধনের প্রায় দু-কলসি মোহর উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। কাকাতুয়াকে তাই এখন হরিনাম শেখানো হচ্ছে। তবে পাখিটার স্মৃতিশক্তি বড়োই প্রবল। ভোর হতে-না-হতেই সে ডাকতে থাকে, 'রামু ওঠো। মুখ ধোও। পড়তে বসো।'

রামুর মনে বহুদিন ধরেই একটা খটকা লেগে আছে। সে একদিন গবাকে ধরে পড়ল, 'সেই কিংকর লোকটা সেই রাত্রে যে হাওয়া হয়ে গেল তারপর আর তার দেখা পেলাম না কেন বলো তো! কোথায় গেল সে?'

গবা এক গাল হেসে বলে, 'সেই কথাটা কিন্তু খুব গুহ্য কথা। কেউ না জানতে পারে!'

'কেউ জানবে না।'

'তবে বলি। সেই যে তোমাকে আলফা সেনটরের কথা বলেছিলুম, মনে আছে?'

'আছে। আলফা সেনটর হল সৌরলোকের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে চার আলোকবর্ষ দূরে।'

'বাঃ, ঠিক বলেছ। সেখান থেকে একদল লোক এসে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে যায়, জানো তো!'

'জানি। কিন্তু সে তো গুল।'

'তাহলে বলব না।'

'আচ্ছা গুল নয়। বলো।'

'আলফা সেনটরের একটা গ্রহের নাম হচ্ছে নয়নতারা। কিংকর হল আসলে সেই গ্রহের লোক। ডাকাতদের সঙ্গে যখন আমরা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলুম না, তখন আমি টেলিপ্যাথিতে নয়নতারায় খবর পাঠাই। খবর পেয়ে কিংকর একদিন একটা মহাকাশযানে চেপে চলে এল। তারপর সব ঠিকঠাক করে দিয়ে সামলে-সুমলে দিয়ে ঘটনার সেই রাত্রে আবার নয়নতারায় ফিরে গেছে।'

'আর তুমি কে গবাদা?'

'আমি? ও বাবা, ও আবার কেমনধারা কথা! আমি হচ্ছি আমি, গবগবাগব পাগলা খুড়ো, উলিঝুলি ফোকলাটেকো নাংলাবুড়ো। ঝুলদাড়ি আর ঝোলা গোঁফে গুমসো ছিরি, নালে-ঝোলে চোখের জলে জড়াজড়ি।'

'তুমি কিন্তু মোটেই বুড়ো নও। বুড়োদের চামড়া এত টান থাকে না।'

'থাকে থাকে। এ কি তোমাদের এই নোংরা জায়গার আধমরা বুড়ো নাকি! এসব মেড ইন অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড।'

'তার মানে?'

'কথাটা কিন্তু খুব গুহ্য। গোপন রেখো।'

'রাখব। কিন্তু ফের গুল দিলে।'

'আহা, আগে শোনোই না। কাউকে বলো না। আমিও আসলে ওই নয়নতারার লোক। সেখানে জল-হাওয়ার এমন গুণ যে, দেড়শো দুশো বছর বয়সে মানুষের যৌবন আসে।'

'ফের গুল?'

'গুল নয় গো। শুনলে প্রত্যয় যাবে না, সেখানে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের লোকেরা হামা দেয়। ত্রিশ-চল্লিশে গিয়ে হাঁটতে শেখে। আধো-আধো বোল ফোটে তখন। সত্তর বছর বয়সে আমাদের হাতেখড়ি। পঁচাত্তর বছর বয়সে ইস্কুলের পাঠ শুরু। সেখানে গেলে দেখবে আশি-নব্বুই বছরের লোকেরা ঢিল মেরে আম পাড়ছে, ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, ক্রিকেট খেলছে।'

'সেখানে কি কিংকরদার গাঁয়েই তোমার বাড়ি?'

'হ্যাঁ তা বলতে পার একরকম। পাশাপাশি গাঁ। ওর গাঁয়ের নাম বাঘমারি, আমার গাঁ হল কুমিরগড়। দু-গাঁয়ের মধ্যে দূরত্ব মাত্র শ-পাঁচেক মাইল, একই থানা আমাদের।'

'বলো কী! পাঁচশো মাইল দূরের গাঁ কি পাশের গাঁ হল নাকি?'

গবা খুব হাসে। বলে, 'তোমাদের এখানকার মতো নয়। আমাদের গ্রহটাও যে বিশাল। আমাদের একটা জেলা তোমাদের গোটা ভারতবর্ষের সমান। চলো একবার তোমাদের নিয়ে যাব। জামবাটি ভরতি সরদুধ আর সবরিকলা আর নতুন গুড় দিয়ে মেখে চিঁড়ের এমন ফলার খাওয়াব না! আর সেই জামবাটির সাইজ কী! ঠিক তোমার ওই পড়ার ঘরখানার মতো . . .'

'গুল! গুল!'

'আহা, শোনোই না . . .'

পরদিনই গবা আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নয়নতারাতেই ফিরে গেল কি না কে জানে!